শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে

শ্রীউমাশংকর সরকারে

PRESENTED

LIBRARY
No. 31255
BANARAS

শ্রীচরণ-সম্বল—

শ্রীশুভময় দত্ত, এম্‌ এ., বি. এল.

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ও এডভোকেট (নোয়াখালী)

কর্তৃক নিবেদিত

11/256

৯১/২৫৯

শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব স্মরণে—

১১।২৫১

শ্রীচরণ-সম্বল—

শ্রীশুভময় দত্ত, এম্. এ., বি. এল.

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ও এডভোকেট (নোয়াখালী)

কর্তৃক নিবেদিত

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীশুভময় দত্ত
১/৬০, গর্চ্চা ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা-১৯
ফোন: ৪৬—৪৭৫৪

মুদ্রাকর—
শ্রীনীরদ চৌধুরী
প্রকাশিকা লিঃ, (নববিধান প্রেস),
কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৪—৪৭৭৫

বাইণ্ডার—
শ্রীদেবেন্দ্র লাল বসাক
সেঞ্চুরী বাইণ্ডিং কোং
৪৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান—
১। প্রকাশক ১/৬০ গর্চ্চা ফাষ্ট লেন
কলিকাতা-১৯
২। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর
কলিকাতা-৩২
৩। প্রকাশিকা লিঃ, (নববিধান প্রেস)
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

১১/২৫১

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের মানবলীলা সম্বরণের পূর্ব্বে কখন কল্পনাও করি নাই যে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সময়ে কিছু লিপিবদ্ধ করিব। এই কারণেই যদিও প্রায় ২৫ বৎসর মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছি, কখনও তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া রাখি নাই। তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পর হইতে কোন কোন ভক্ত, বিশেষতঃ উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি অর্চ্চনা কল্পে কিছু লিখিবার জন্য বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই কার্য্যের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত জানিয়া, বিশেষতঃ কোন প্রকারের ভুল ভ্রান্তির আশঙ্কায়, ঐ কার্য্য হইতে বিরত ছিলাম। ক্রমশঃ তাঁহার সস্নেহ তাগিদে ঐ বিষয়ে লেখার কিছু কিছু ইচ্ছা হইতে লাগিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই এমন কাহারো কাহারো তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু বিকৃত বিবরণ পাঠ করিয়া এবং শুনিয়া যথাসাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, আমাকে তিনি যে পরিমাণে শক্তি দেন তদনুযায়ী, সঠিকভাবে লিখিতে বৎসরেক পূর্ব্বে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া খুব আস্তে আস্তে লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব সমাপ্তির পূর্ব্বেই তাহা ছাপাইয়া বাহির করিবার জন্য আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ কোন কোন বন্ধু বিশেষভাবে উৎসাহিত করায় গত কয়েকমাস যাবৎ খুব তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করিয়া ছাপাইবার জন্য ব্রতী হইয়াছি। তদ্দরুণ অনেক ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করিয়া ঐ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমি ঐ সকল সানন্দে সংশোধন করিব।

মহাত্মা গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, পাহাড়তলী কৈবল্যধামের সম্পাদক রায়সাহেব ডাক্তার অনাথবন্ধু সেন,

ডেভিডহেয়ার টীচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান লোকেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অবসর প্রাপ্ত ইন্‌কামট্যাক্স কমিশনার শ্রীমণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার লিখিত এই গ্রন্থের অনেকাংশ পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পরামর্শ দিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আরও অন্যান্য যাঁহারা আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতিই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করায় সর্ব্বসাধারণের কি উপকার হইবে তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি অর্চ্চনা করিতে গিয়া বৎসরেক যাবৎ বহু পুরাতন, পবিত্র ও অতিমধুর স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগ্রত হওয়ায় যে বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

জীবের দুঃখের ও বন্ধনের কারণ এবং ঐ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার ও ঐহিক এবং পারত্রিক শান্তির জন্য যে অমৃতময়ী উপদেশ শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থের শেষ ভাগে তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও সত্যের অনুরোধে আমি অকপটে প্রকাশ করিতে বাধ্য যে, যে কোন দেশের কি, জাতির, কি সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুর আত্মোন্নতির ও পরিণামে গতাগতি শূন্য অবিচ্ছিন্ন আনন্দলাভের সহজতম, প্রকৃষ্টতম এবং প্রত্যক্ষতম পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ একনিষ্ঠভাবে তাহা পালন করিতে অভ্যাস করিয়া উপকৃত হইলে, প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ আমার বন্ধন মুক্তির পথে সহায়ক হইবে মনে করিয়াই তাঁহার উপদেশাবলী প্রকাশ করিয়াছি।

পাঠক পাঠিকাগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে কোন বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ বারংবার পড়িয়া যাহাতে শান্তি পাইতে পারেন এই

PRESENTED
( )

উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু ভেদে পৃথক করিয়া বেদবাণী প্রত্যেক খণ্ডের দুই একখানা সহজ বোধ্য পত্র উদ্ধৃত করিয়া বাকী পত্রগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছি, যেন ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ঐগুলিও পড়িয়া উপকৃত হইতে পারেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যাঁহাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গপ্রাপ্তির সুযোগ হয় নাই তাঁহারা ঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তের নিকট ব্যাপকভাবে লিখিত পত্রগুলি পড়িয়া সার উদ্ধার করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং ক্রমান্বয়ে পত্রগুলি পড়িয়া তাহার মর্ম্ম বিশেষ কিছু বুঝা যায় না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বস্তুতপক্ষে এই পত্রাংশগুলি একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই সত্য প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার অশেষ কৃপায় এবং তাঁহার বাক্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস না থাকিলে এই সত্য উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। তাঁহার পত্রগুলি এমনই ব্যাপকভাবে বিবিধ বিষয়ের সমস্যা নিরাকরণ করিয়াছে যে, তাহার কোন শ্রেণী বিভাগ করাও প্রায় অসম্ভব। তত্রাচ আমার সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এই দুঃসাহসিক চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত জীবনই প্রহেলিকাময় ও প্রচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্ত নানাস্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া অতি সংক্ষেপে তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত করা হইয়াছে। তাঁহার রাতুল চরণে এই প্রার্থনা যে, যদি অনবধানতা বশতঃ গ্রন্থ প্রণয়নে কোন ভুল ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা যেন তিনি তাঁহার চিরন্তন স্বভাবানুযায়ী মার্জনা করেন।

পুণ্য জন্ম শতবার্ষিকী দিবস
২৪শে মাঘ, ১৩৬৬
৭.২.৬০ ইং

ইতি—
গ্রন্থকার
শ্রীশুভময় দত্ত

সূচীপত্র

বিষয়—	পৃষ্ঠা
১। স্মৃতি অর্চ্চনা—	১
২। চারিটি আশ্রম—	১৬৮

দ্বিতীয় ভাগ

১। সংক্ষিপ্ত জীবনী—	১
২। বেদবাণী—	৬১

LIBRARY
No. 77126 S

LIBRARY
No.......11|256
... Ashram
PRESENTED

পরম আরাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেবের

স্মৃতি অর্চ্চনা

যতদূর মনে হয়, ১৩৩১ সনের কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা সরকার পক্ষে পরিচালনার জন্য ফেণীতে গিয়াছিলাম এবং অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক প্রবীণ পুলিশ ইনস্পেক্টরের বাসায় অবস্থান করিতেছিলাম। তৎপূর্ব্বে ফেণীতে মোকদ্দমা উপলক্ষে গেলে কলিকাতায় কলেজে পড়ার সময়ের বন্ধু এবং এই সময় ফেণী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমণীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিতাম। ঐবারও বিকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া মণীন্দ্র বাবুর বাসায় গেলে জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার এক মাতুল সাংঘাতিক রোগে ভুগিয়া তখন প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারই নিকট তাঁহার ভ্রাতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতি বিষণ্ণ বদনে বসিয়াছিলেন। উক্ত কৈলাস বাবু নানা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পরিশেষে নোয়াখালী সহরের স্বদেশী যুগে স্থাপিত "জাতীয় উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের" শিক্ষকতা করিয়া কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পূত চরিত্রের জন্য আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখিতেন। আমরা উভয়ে আলাপ করিতেছি এমন সময় ফেণী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নীলকমল চক্রবর্ত্তী

মহাশয় তথায় আসিয়া কৈলাস বাবুকে খুব চুপি চুপি কিছু বলিলেন। আমি তাঁহাদের কথা কিছু বুঝিতে না পারিলেও তাঁহাদের ভাবভঙ্গী এবং আকার ইঙ্গিতে আমার সন্দেহ হইল যে, কোন মহাত্মা সাধু সন্ন্যাসী বোধ হয় তথায় আসিয়াছেন এবং নীলকমল বাবু সম্ভবতঃ কৈলাস বাবুকে সেই সংবাদই দিয়া গেলেন। ইহার কারণ এই যে, আমি কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে দেখিয়াছিলাম, সাধু সন্ন্যাসীরা কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের ভক্তগণ অতি চুপি চুপি তাঁহাদের পছন্দমত লোকদের সংবাদ দিতেন। সর্ব্বসাধারণকে এই সংবাদ দিতেন না। আমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নীলকমল বাবু কৈলাস বাবুকে কি বলিয়া গেলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে যতদূর মনে পড়ে, কৈলাস বাবু বলিলেন—'খুব বড় একজন মহাপুরুষ এখানে আসিয়াছেন। রাম ভাইয়ের নাম শুনিয়াছ? তিনি এখন নীলকমল বাবুর বাসায় আছেন বলিয়া সংবাদ দিয়া গেলেন।" এই কথা শুনিয়া আমার তাঁহার নিকট যাওয়ার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। কারণ আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের মুখে এই মহাপুরুষের প্রথম জীবনের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম এবং পরে নাগপুর কংগ্রেসে যাওয়ার পথে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও আত্মীয় ৺সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, যিনি শেষ বয়সে বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার নিকটও কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। আমি কৈলাস বাবুকে বলিলাম, "আপনি তাঁহার নিকট যাইবেন কি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এখনই যাইব।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি সঙ্গে যাইতে পারি কি?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাইতে পার।" অতঃপর আমরা উভয়ে নীলকমল বাবুর বাসার দিকে রওনা হইলাম।

ছেলেবেলা বাবা বলিয়াছিলেন যে, কোন সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিতে গেলে কিছু ফল বা ফুল নিয়া যাইতে হয়। বাজার নিকটে না থাকায় পথের পার্শ্বের কিছু বনফুল আমি কুড়াইয়া লইলাম এবং কৈলাস বাবুও তাহাই করিলেন। তৎপর নীলকমল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইলাম এবং কৈলাস বাবু তাঁহাকে যেভাবে প্রণাম করিলেন, আমিও সেইভাবে প্রণাম করিয়া একপাশে বসিয়া পড়িলাম। বাবা ছেলেবেলা উপদেশ দিয়াছিলেন যে, হরিনামে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং মঙ্গল হয়। আমরা যেন সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিতে গেলে মনে মনে হরিনাম জপ করিতে থাকি। যতদূর মনে পড়ে, আমি একপাশে বসিয়া তাহাই করিতেছিলাম। কৈলাস বাবু আমার পরিচয়ের জন্য, "নোয়াখালীর সরকারী উকিল ও সত্যেন্দ্রের বিশেষ বন্ধু" ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না এবং তাঁহার মুখশ্রী দৃষ্টে আমার মনে হইল যে তিনি ঐ পরিচয়ের কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না।

সত্যেন্দ্র বাবু তখন বার্ম্মাতে সম্ভবতঃ মান্দালয় জেলে আবদ্ধ ছিলেন। কৈলাস বাবু তাঁহার কারা মুক্তির বিষয়ে ঠাকুরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, ঠাকুর বলিলেন, "উহাদের (সরকারের) দুর্বুদ্ধি। অনর্থক তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। শীঘ্রই সত্যেন্দ্র বাবু মুক্তি পাইবেন।" ইহার পর কৈলাস বাবু তাঁহার সাংঘাতিক রোগ-গ্রস্ত ভ্রাতার কথা বলিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কথা বুঝাইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার ভ্রাতাকে পদধূলি দিয়া আসিতে স্বীকৃত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কৈলাস বাবুর সান্ত্বনার জন্য অনেক

কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই, যদিও একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐ সময় অন্য কেহ ঐ ঘরে ছিল বলিয়া মনে পড়ে না। সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ আমরা উভয়ে তথায় থাকিয়া পুনঃ তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া কিছুই বলেন নাই, এবং আমারও কিছু জিজ্ঞাসা করার না থাকায় চুপ করিয়াই বসিয়াছিলাম।

পরদিন ভোরে বেড়াইতে বাহির হইয়া নীলকমল বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ঠাকুর একাই বসিয়া আছেন আপনি যাইতে পারেন।" সেই দিনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ ঐ ঘরে বসিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কিছু জিজ্ঞাস্য না থাকায় এবং তিনিও নিজ হইতে কিছু না বলায়, নীরবে প্রণাম করিয়া অন্নদা বাবুর কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলাম। অন্নদা বাবু ধর্ম্মপরায়ণ এবং নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রাম ভাই, বা রামঠাকুরের নাম শুনিয়াছেন কি?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'হ্যাঁ, তিনি খুব বড় সাধু।' আমি বলিলাম, 'তিনি এখানে নীলকমল বাবুর বাসায় আছেন, আপনি দেখা করিতে যাইবেন কি?' তিনি সাগ্রহে স্বীকৃত হইলেন এবং অফিসের কার্য্য সারিয়া অমরা উভয়ে বাজার হইতে কিছু ফল লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম।

অন্নদা বাবু শাস্ত্র সম্পর্কীয় কিছু আলোচনা করিলেন এবং ঠাকুরও তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি শাস্ত্রালোচনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ

বিধায় সেই আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নাই। কিছুক্ষণ ঐরূপ আলোচনার পর আমি একটু সাহসে ভর করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "গত পূজার বন্ধে কাশী যাইবার পথে কোন বন্ধুর সঙ্গে নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। সেখানে এক স্থানে দেখিলাম যে একজন সাধু পলক শূন্য নয়নে ঠিক একটি প্রস্তর মূর্ত্তির মত নিশ্চল অবস্থায় আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তথায় শুনিতে পাইলাম যে, তিনি দিনের পর দিন নিশ্চল অবস্থায় ঐ ভাবেই বসিয়া আছেন এবং দিন রাত্রের মধ্যে কেহই তাঁহাকে একটুও নড়া চড়া করিতে দেখে নাই। এরূপ অবস্থা কি করিয়া হয়? আমরা তো এক মুহূর্ত্ত ও চোখের পলক শূন্য অবস্থায় নিশ্চলভাবে থাকিতে পারি না"। শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "ইহা যোগের একটি অবস্থা। যখন যোগী দেখিতে পান যে, তাঁহার সম্মুখ দিয়া অনেক দেবদেবী এবং মনোরম দৃশ্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার চক্ষু ও মন এমনই আকৃষ্ট হইয়া থাকে যে, তাঁহার চোখের পলক ফেলিবারও তখন কোন অবকাশ থাকে না।" কথাটা শুনিয়া আমার মন বুঝ পাইল এবং কিছুক্ষণ পর আমরা উভয়ে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেখানে সংবাদ পাইলাম যে, তিনি তৎপর দিন প্রাতে ফেণী টাউন সংলগ্ন গ্রাম সহদেবপুরের কালীসিদ্ধ ক্ষীরোদ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিবেন।

পরদিন প্রাতে উক্ত ক্ষীরোদবাবুর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ক্ষীরোদবাবু তথাকার কালীবাড়ীর প্রকাণ্ড বট-অশ্বত্থ গাছতলায় পায়চারী করিতেছেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম

করিয়া বলিলাম, "আজ আমার এখানকার আফিসের কাজ শেষ হইবে এবং আমি নোয়াখালী যাইব। আপনি একবার সেখানে যাইবেন কি ?" তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, যাইব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার চট্টগ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসিতে হইবে।" ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আগত শ্রীবরদাচরণ রায় নামক জনৈক ভক্তের সঙ্গে ফেণীতে আমার পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতায় ওকালতি করিতেন। কোন একটি মর্ম্মান্তিক পারিবারিক ঘটনাতে অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইয়া শান্তির জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন।

আমি নোয়াখালী আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত বসন্তকুমার বসু মহাশয়কে ঠাকুর শীঘ্রই নোয়াখালী আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনি হয়ত আসিবেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। অর্থাৎ তিনি অশরীরীভাবে আসিয়া চলিয়া যাইবেন।" তাঁহার এই কথা বলার কারণ, তাঁহারা নাকি বহুকাল যাবৎ তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আমার কিন্তু তাঁহাদের এই কথায় পুনঃ এখানে তাঁহার দর্শন পাওয়ার আশা ক্ষুণ্ণ হইল না। আমার যেন মনে হইল, তিনি আমাকে আসিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, আর তিনি আসিবেন না, ইহা হইতেই পারে না ; তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন।

কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম হইতে পুনঃ ফেণীতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নোয়াখালী শহরে বসন্তবাবুদের সংবাদ দিলে, তাঁহারা একখানা ট্যাক্সিতে করিয়া ঠাকুরকে শ্রীখগেন্দ্র কাহিলী মহাশয়ের বাসায় নিয়া আসিলেন। খগেন্দ্রবাবু তখন ভুলুয়া জমিদারের ষ্টেটের একজন নায়েব

PRESENTED

ছিলেন এবং তৎকালীন নোয়াখালী শহরে আমার বাসার অল্প কিছুদূর উত্তরে ভুলুয়া কোয়ার্টারে থাকিতেন।

নোয়াখালীতে আসিয়াই পূর্ব্বোক্ত বরদাবাবু দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং আমরা উভয়ে নোয়াখালী টাউন হলের অল্প কিছু দক্ষিণে নদীর ধারে বেড়াইতে যাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া বরদাবাবু ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তন্মধ্যে এই কথাটী আমার বেশ মনে আছে—"এমন গীতার মহাপুরুষের সঙ্গে থাকিয়াও আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিতেছি না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আচ্ছা আমি অনুরোধ করিলে ঠাকুর আমার বাড়ীতে আসিবেন কি ?" বরদাবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাইবেন।" আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার অনুরোধটা আপনিই করিবেন।" তিনি তাহাতে সাগ্রহে সম্মত হইলে, আমরা উভয়ে সন্ধ্যার সময় যাইয়া খগেন্দ্রবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। বরদাবাবু আমার প্রার্থনা নিবেদন করা মাত্র, ঠাকুর পরদিন প্রাতেই আমার বাসায় যাইবেন বলিয়া সম্মতি দিলেন। বরদাবাবু আমাকে বলিয়া দিলেন যেন আমি খুব সকালে আসি, কারণ ঠাকুর খুব ভোরেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। বরদাবাবুর নিকট জানিলাম যে ঠাকুর প্রায় কিছুই খান না। ইচ্ছা করিলে সামান্য কিছু ফল রাখিতে পারি বলিয়া জানাইলেন। আমি তখনই বাজার হইতে বেদানা আদি ফল কিনিয়া আনিলাম এবং পরদিন প্রাতে ঠাকুর আমার বাসায় আসিবেন বলিয়া বাসায় খবর দিলাম। ঐ সময় বড়দিনের বন্ধ ছিল।

পরদিন প্রত্যূষে খগেন্দ্রবাবুর বাসায় আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র বরদাবাবু বলিলেন যে ঠাকুর অনেক আগেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া

আছেন। এখানে তাঁহারা ভোগের কিছু গ্রহণ করিতে বলিলে ঠাকুর বলিলেন, শুভবাবুর বাসায়ই করিবেন। ঠাকুর একখানা সাদা চাদর গায়ে, খালি পায়ে আমার বাসাভিমুখে রওনা হইলেন। আমি ও বরদাবাবু পিছু পিছু যাইবার সময় বরদাবাবু বলিলেন, 'দেখুন, কেমন তাড়াতাড়ি ঠাকুর এই বৃদ্ধ বয়সে হাঁটিতেছেন। 'আমাদের মত যুবকদের পক্ষেও অত তাড়াতাড়ি অনেক দূর যাওয়া সম্ভব হয় না।' ঠাকুর আমার বাসগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সাধু মহাত্মাদের অভ্যর্থনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমি কি ভাবে তাঁহাকে ঘরে নিব মনে মনে ভাবিতেছি, এমন সময় মনে হইল যে শুনিয়াছি তাঁহাদিগের পদ-প্রক্ষালন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। আমি তাহাই করিয়া আমার বিছানার উপর বসিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম এবং তিনি তথায় আসন করিয়া বসিলেন।

আমার দীক্ষা

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐভাবে উপবেশন করার পর, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সংসারে থাকিয়া লোক কি ভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ বা মুক্তি লাভ করিতে পারে?" এই কথা বলা মাত্র তিনি বারংবার কিছু উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপর বলিলেন, "এই করিবেন"। তাঁহার ভাবে এবং উচ্চারণে আমার মনে হইল যেন তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন। ঠাকুরের তৎকালীন ভক্তদের মুখে শুনিয়া ছিলাম যে, **তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন না**, এবং **তিনি আমাকে দীক্ষা দিবেন** এই আশা করিয়া আমি তাঁহাকে আমার বাড়ীতে আসিতে আহ্বানও করি নাই।

সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলাম "এই কি দীক্ষা?" তিনি উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, এই দীক্ষা।" এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইলাম এবং এই উপলক্ষ্যে যে কিছু গুরু দক্ষিণা দেওয়া সঙ্গত তাহা ভুলিয়া যাওয়াতেই বোধ হয় কয়েক ফোঁটা চোখের জল দক্ষিণা স্বরূপ ঠাকুর গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্ সময় এইরূপ করিব?' তিনি উত্তর দিলেন —'নিস্তব্ধ সময়ে।' কোনও মূর্ত্তি চিন্তা করিব কিনা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমার বিছানার নিকট টাঙ্গানো শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিখানা দেখাইয়া বলিলেন 'এই মূর্ত্তি।' বস্তুতঃ আমি শিশুকাল হইতেই ঐ মূর্ত্তি খুব ভালবাসিতাম।

ঠাকুর অনেক কথা বলিলেন। তাহার প্রায় কিছুই আমার এখন মনে নাই। কিন্তু তখন আমার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহার আদেশানুযায়ী ঐরূপ উচ্চারণ করিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হইবে এবং আমার আর কিছু করার দরকার হইবে না। বোধ হয় তখন 'অনন্যমনা' হওয়ার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন।

তারপর সামান্য কিছু ফল, যাহা তাঁহার ভোগের জন্য আনিয়াছিলাম, তাহা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি ভোগের আসনে উপবেশন করিয়া আমার আশাতিরিক্ত গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করিলেন। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে; আমার পূর্ব্বেই জানা ছিল যে, তিনি ফলাদিও নাম মাত্রই গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আহারের প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় ঠাকুর নিজ হইতে বলিয়া গেলেন যে পড়াশুনা করার কিছু দরকার হয় না; আপনা

হইতেই সব হয়। আমি ঐ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা না করা এবং ঐ সম্বন্ধে আমার তৎকালে কিছু মনে না আসা সত্ত্বেও ঠাকুর নিজ হইতেই ঐ কথা বলায় আমার মনে হইল যে, নানা জাতির ও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার যে একটা আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ভাবে আমার মনে ছিল, সেইদিকে আর যেন অগ্রসর না হই তজ্জন্যই ঠাকুর স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া আমাকে এই উপদেশ দিয়া গেলেন। হয়ত ঐ উপদেশ না পাইলে আমি বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের আওতায় পড়িয়া যে কোনও প্রকারে লোকের নিকট স্বীয় মতের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া তর্কের বেড়াজালে ঘুরিয়া বেড়াইতাম এবং ক্রমশঃ প্রকৃত সত্য ও কাম্য বস্তু হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাইতাম।

ঠাকুর ঘর হইতে বাহির বাটীতে আসিলে পর, নোয়াখালীর তৎকালীন মুন্সেফ সরোজবাবু (ইনি দেওঘরের বালানন্দ স্বামীর শিষ্য) বলিলেন, 'অনেক সময় তো কাটাইয়া দিলেন। অত সময় কি করিলেন,' আমি একটু হতভম্ব হইয়া বলিলাম, 'কৈ বেশী সময় তো ভিতরে ছিলেন না?' তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আমি ত' অনেকক্ষণ আপনার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম'। প্রকৃত পক্ষে আমার মনে হইতেছিল যে ঠাকুর অতি অল্প সময়ই আমার ভিতর বাটীতে ছিলেন। ইহার পর ঠাকুর আমার তৎকালীন বাড়ীর পূর্ব্বদিক সংলগ্ন, পেন্সনপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্টার ৺রাজকুমার বসু মহাশয়ের বাসা বাটীতে গেলেন। আমি স্নান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদোদক তথায় গ্রহণ করিয়া আমার দীক্ষা গ্রহণের অধ্যায় শেষ করিলাম।

যতদূর মনে পড়ে, ঐদিনই রাজকুমারবাবু ঠাকুরের একখানা ফটো ঐ বাসায় তোলেন। সেই ফটোই ফেণী কলেজের প্রফেসার, আমার

LIBRARY
No. ...১১। ৫২৪৭
Shri Sh... ...Ashram

পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী তিন কপি বিলাত হইতে এনলার্জ করাইয়া আনেন এবং তাহার এক কপি আমাকে দেন। আমাকে দেওয়া ঐ ফটোই আমরা প্রত্যহ পূজা করি এবং গত ছাব্বিশ বৎসর যাবৎ ঐ ফটোই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক জন্মোৎসবে পূজিত হইতেছে।

ঐ দিন অপরাহ্নে আবার রাজকুমার বাবুর বাসায় যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাস্য কিছুই না থাকায় তৎকালীন জিলা স্কুলের এসিষ্টেণ্ট হেড্‌মাষ্টার ও আর দুইজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্রাদির জ্ঞান না থাকায় প্রায় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তৎপরদিন অপরাহ্নেও ঐ ভাবে কাটাইয়া ছিলাম।

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যায় খগেন্দ্র বাবুর বাসায় একজন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া ঠাকুরকে তৎপরদিন হরিসভায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে ঠাকুর বলিলেন, "হরির আবার সভা কি?" এই উত্তর পাইয়া উপস্থিত কেহই আর তাঁহাকে ঐ সভায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে সাহস করিলেন না। সম্ভবতঃ ঠাকুর তৎপর দিনই সেবারের মত নোয়াখালী শহর ত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার সময় পূর্বে কথিত বরদা বাবু আমাকে বলিয়া গেলেন যে, আমার প্রয়োজন মত পত্র দিলে ঠাকুর নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি যেন আমাকে অনেকটা আঁকড়াইয়া ধরিল। অবসর সময়ে এবং বেড়াইতে বাহির

হইলে প্রায়ই তাঁহার স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিত এবং আমার হৃদয়ের শ্রীরাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি সরিয়া যেন তাঁহারই মূর্ত্তি সেই স্থানে বসিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার উপদেশানুযায়ী নিস্তব্ধ সময়ে যাহা বারংবার উচ্চারণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা করা মোটেই হইয়া উঠিত না। তাহাতে সময় সময় একটু দুঃখও হইত।

ঠাকুর এখান হইতে যাওয়ার দু'চার দিন পরে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইলে, পূর্ব্বোক্ত এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়। দুই জনে নদীর ধারে যাইয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, "আহা, এমন একটি মহাপুরুষ এ শহর ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু এখানকার লোক প্রায় কেহই তাঁহাকে চিনিল না। তাঁহাকে চিনিতে পারিলে বহুলোক তাঁহার নিকট যাইয়া ধন্য হইত।" আমি বলিলাম, "আপনি কাহার কথা বলিতেছেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "রাজকুমার বাবুর বাসায় আপনাকে ত, তাঁহার নিকট বসা দেখিয়াছি!" আমি বলিলাম, "আপনি তাঁহার মধ্যে কী দেখিযাছেন ?" তিনি উত্তরে বলিলেন," ঐ প্রকার শক্তিশালী মহাপুরুষ লোকালয়ে বড় দেখা যায় না।" তাহার পর শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া, 'অণিমা লঘিমা' আদি নানা বিষয় আলোচনা করিয়া (যাহা আমার এখন স্মরণ নাই এবং তখনও ভাল বুঝি নাই), শেষে বলিলেন "চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা থাকিলেও ঠাকুর ইচ্ছা করলে তথা হইতে লোকনয়নের অগোচরে যথা ইচ্ছা তথা চলিয়া যাইতে পারেন। আমি প্রথমদিন যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, সেদিন শাস্ত্রালোচনা করিয়া তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া মনে হইল যেন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই এবং ঐ অশ্রদ্ধার ভাব লইয়াই বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন যাইয়া যখন আমার মনের কতগুলি সংশয় নিরাকরণের জন্য প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, তখন তিনি জলের মত করিয়া সমস্ত এমন সরলভাবে বুঝাইলেন, যে আমি একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গেলাম এবং আমার তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞানের অহংকার একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কারণ আমি কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া এমন চমৎকার ব্যাখ্যা ত' কখনও পাই নাই! আমি তখন লজ্জায় অবনত মস্তকে তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি প্রথমদিন আপনাকে একেবারেই ভুল বুঝিয়াছিলাম। তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, 'আপনি ত' কোন অন্যায় করেন নাই! আমি একটি যন্ত্রমাত্র, যে যেভাবে বাজাইবে সে সেইরূপই শব্দ পাইবে।" মাষ্টার বাবুর মুখে ঠাকুর সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিয়া আমি খুবই আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু আমি যে ঠাকুরের পদাশ্রিত হইয়াছি, সেই সম্বন্ধে কিছুই তাঁহাকে জানাই নাই।

আর একদিন বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইলে, তৎকালীন জিলা স্কুলের ড্রিল মাষ্টার চিরকুমার রসিক বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন এবং নানা কারণেই তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমি কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে অতি সংক্ষিপ্ত একটি কথা নিস্তব্ধ সময়ে উচ্চারণ করিতে বলিয়া গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার খুব বেশী সময় গভীর ঘুম হয় বলিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা কিছুই করিতে পারি নাই। কেবল অবসর সময়ে অথবা যখন বেড়াইতে বাহির হই, তখন তাঁহার মূর্ত্তি এবং ঐ কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হয়। রসিক বাবু আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "উহাতেই আপনার

কাজ হয় এবং ইহাই আপনার পক্ষে নিস্তব্ধ সময়।" আমি ঐ কথায় বস্তুতঃই যথেষ্ট শান্তি পাইলাম।

তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পুনঃ মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আমার ব্যবসায়ের নেশা ও তৎসঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সরকারী উকিল নিযুক্ত হওয়ায়, ঐ কাজের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতার দরুণ দীর্ঘ-কালের জন্য অফিস বন্ধের সুযোগ ব্যতীত ঐ আকাঙ্খা পূরণের জো ছিল না। সেই জন্য- আমি পূজার মাসাধিক কাল ছুটির প্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্রমে ঐ বন্ধ নিকটে আসিতে থাকিলে, আমি নানাস্থানে তাঁহার ঠিকানার খোঁজ নিতে লাগিলাম। কিন্তু কেহই কোন খোঁজ খবর দিতে পারলেন না। উপরন্তু কেহ কেহ একটু নৈরাশ্য উৎপাদন করিয়া বলিলেন, 'তিনি কোন্ দূরদেশে আছেন কে বলিবে!'। আমি কিন্তু তাহাতে একটুও হতাশ হইলাম না। বরং মনে মনে স্থির করিলাম পাহাড় পর্ব্বত যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, আমি খোঁজ পাইলে সেখানেই যাইব। কিন্তু ঠিকানার অভাবে নিজে কোন-ও পত্র দিতে পারিলাম না।

ওকালতি ব্যবসা আরম্ভের দুই তিন বৎসর পর হইতেই শারদীয়া পূজার বন্ধে নানাস্থানে বেড়াইতে যাওয়ার একটা অভ্যাস আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এ বৎসর তাহা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন খোঁজ না পাওয়ায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ঐ বন্ধ আরম্ভ হওয়ার দুই তিন দিন পূর্ব্বে অগত্যা শিলং যাওয়াই স্থির করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বোধ হয় আমার প্রাণের আকুল আকাঙ্খা বহুদূর হইতেই অনুভব করিতে ছিলেন এবং প্রায়

PRESENTED

শেষ মুহূর্ত্তে অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার মনোবাসনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন তৎকালীন নোয়াখালী ফৌজদারী কোর্টের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, আমি যদি ঠাকুরকে এবং তাঁহার ভক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে আগামী কালীপূজার দিন, কি তৎপূর্ব্বে নোয়াখালীতে নিয়া আসিব বলিয়া কথা দিই, তাহা হইলে তিনি আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধান দিতে পারিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, ঐ দুইজনকে একসঙ্গে না পাওয়ায় তাঁহার স্ত্রীর মন্ত্র লওয়া হইতেছে না। প্রভাত বাবু তাঁহাদের কুল-গুরুবংশের সন্তান। তাঁহার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে প্রভাত বাবুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভাত বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিংবা অন্য কাহারও নিকট হইতেই তাঁহাকে মন্ত্র লইতে পরামর্শ দেন। তাঁহার স্ত্রী কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রভাত বাবু ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে প্রভাত বাবু এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ঠাকুর যদি সম্মুখে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেই তিনি মন্ত্র দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়কে একসঙ্গে পাওয়াও যায় না এবং সেইজন্য তাঁহার স্ত্রীর আকাঙ্খিত মন্ত্র লওয়াও হইয়া উঠিতেছে না।

ঠাকুরের সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনায় আমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেও কামিনী বাবুকে বলিলাম, 'এই প্রতিশ্রুতি আমি কি করিয়া দিব? তবে আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি—যে, আপনার কথানুযায়ী কাজ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।' তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে, কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটের কাটা কাপড়ের

দোকান 'সত্যনারায়ণ ভাণ্ডারের' মালিক তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গেলে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও প্রভাত বাবু উভয়েরই ঠিকানা দিতে পারবেন বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন। কামিনী বাবু পরে মতি বাবুর নামে একখানা পত্রও আমার নিকট দিলেন।

আমি আফিস বন্ধ হওয়ামাত্র শিলং যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিয়া পরমানন্দে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতা 'সত্য-নারায়ণ ভাণ্ডারেও গিয়া মতিবাবুকে কামিনীবাবুর পত্রখানা দিলে, তিনি আমাকে সাদর অভ্যর্থনার পর একটি লোক দিয়া নিকটস্থ মদন দত্ত লেনে প্রভাতবাবুর বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। ঐ লোকটি চলিয়া গেলে আমি আমার নামের ছাপান কার্ড দিয়া প্রভাত বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিলাম। প্রভাতবাবু তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। বয়স তখন অল্প হইলেও, সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু শাস্ত্রে তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সাবেকী পণ্ডিতদের মত তিনি সরল ও বাহ্যিক আড়ম্বর শূন্য ছিলেন। তিনি বৈঠকখানার বিছানার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমাকেও তথায় বসিতে বলিলেন। আমার কার্ডখানা পড়িয়া তিনি যেন একটু সন্দেহের চোখে আমার দিকে চাহিলেন। পরে কামিনীবাবুর সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে, তিনি কথা দিলেন যে, ঠাকুরকে যদি আমি নিয়া আসিতে পারি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে নোয়াখালী যাইবেন। এই কথার পর আমি আবার "সত্যনারায়ণের ভাণ্ডারে" গিয়া মতিবাবুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালীন ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। ঠিকানাটি ছিল—C/o R. K. Mozumder, Contractor, Muzaffarpur, Behar.

উপরোক্ত ঠিকানায় তৎকালে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত Mr. R.K. Mozumdar কে আমি পাটনা ও গয়া হইয়া মহাষ্টমী পূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে দ্বিপ্রহরে মুজাঃফরপুর পৌছিব জানাইয়া পত্র দিলাম। পাটনায় নোয়াখালীর শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন মহাশয়ের বাসা হইতে একজন লোক লইয়া গয়ায় পিতৃমাতৃ পিণ্ড দান করিয়া পুনঃ তাঁহার সাদরআতিথ্য গ্রহণান্তে অষ্টমী পূজার দিন প্রাতে প্রথমতঃ ষ্টিমারে এবং পরে টেনে করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরে মুজাঃফরপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। তথায় একজন বাঙ্গালীও চোখে না পড়ায় কি ভাবে আর, কে, মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী খোঁজ করিব চিন্তা করিতেছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সরাসরি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি শুভময় বাবু?" আমি সম্মতি জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি Mr. R K. Mozumder?" তিান স্বীকৃতি জানাইয়া বাললেন, "তাড়াতাড়ি আসুন, ঠাকুর আপনার জন্য বসিয়া আছেন।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি একখানা টাঙ্গায় চড়িয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। পথেই বোধ হয় জানিলাম যে আমার কয়েক মিনিটে বিশেষ পরিচিত ঐ বন্ধুর নাম শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার। টাঙ্গাতে বসিয়া তাঁহাকে বলিলাম, গাড়ী ষ্টেশনে আসার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি ভাবিতেছিলাম যে তাঁহাকে এবং অত বড় শহরে তাঁহার বাড়ী কি করিয়া চিনিব। ঠিক এমন সময়ই অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি আমার গাড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, ষ্টেশনের দিকে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে তিনি ঠাকুরকে আমার চেহারা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর কোন বর্ণনা না

দিয়া বলিয়া দিলেন 'ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন।'

রোহিণীবাবুর বাসার বহির্বাটীতে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ভিতরে গিয়া দেখি যে, ভিতর বাড়ীর দালানের বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন, সম্মুখে অনেকগুলি ফুল, বেলপাতা ও চন্দনাদি রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ঠাকুর এমন স্নিগ্ধ, মধুর, অবর্ণনীয়, স্নেহমাখা হাসিতে সাদর আহ্বান ও আশীর্ব্বাদ জানাইলেন যে, তাহা বোধ হয় কখনও ভুলিতে পারিব না। তৎপর পূজাদিতে অনভিজ্ঞ আমি, আমার বন্ধু রোহিণীবাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অক্ষয়বাবু যে ভাবে তাঁহার শ্রীচরণে ফুল আদি অর্পণ করিলেন, সেই ভাবেই অর্পণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সে দিন মহাষ্টমী পূজার দিন ছিল। প্রসাদ গ্রহণান্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বহির্বাটির ঘরে যাইয়া বসিলাম। ঐ ঘরখানা ছোট; এক পাশে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের তক্তপোষ। তাহার সামনেই আর একখানা বিছানা হইতে পারে এইরূপ স্থান মাত্র ছিল। ঠাকুর আমাকে ভিতর বাটিতে যাইয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে গৃহস্বামীরা আমার আপন জন-ই; সুতরাং লজ্জার কোন কারণ নাই। চোরের উপদ্রব-হেতু আমার ট্রাঙ্ক আদি ভিতর বাড়ীতে রাখাই ভাল ইত্যাদি। আমার কিন্তু তাহাতে মন বুঝ পাইল না, কারণ আমি তাঁহার সঙ্গে থাকার জন্যই অতদূরে চলিয়া আসিয়াছি। ঠাকুরের সান্নিধ্যে চোরের ভীতি আমাকে সামান্য মাত্রও স্পর্শ করিল না। আমি ঐ ঘরেই থাকিতে চাহিলাম ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাহাতে রাজী হইলেন। আমার বন্ধুগণ ঐ ঘরেই আমার বিছানা পাতিয়া দিলে আমি ও শ্রীশ্রীঠাকুর

তথায় বিশ্রাম করিলাম এবং রাত্রে সেই ঘরেই আমরা দুইজন শয়ন করিলাম।

ভোরে জাগিয়া উঠিয়া দেখি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বিছানার মশারি তুলিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি ভিতর বাড়ীতে যাইয়া হাতমুখ ধুইয়া চিরাভ্যস্ত প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া জানিলাম যে, আমার বাহির হইয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুরও বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং প্রত্যহই তিনি ঐভাবেই বাহির হইয়া যাইতেন। রোহিণীবাবু ও অক্ষয়বাবুকে ঠাকুর কোথায় যান এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু জানেন না। তবে এইটুকু বলিতে পারেন যে, তথাকার কোন ভদ্রলোকের বাসায় তিনি যান না। সম্ভবতঃ তিনি কোন সুদূর প্রান্তরে চলিয়া যান এবং সময় সময় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পায়ে চন্দন ও সিন্দুরের চিহ্ন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহাতে কেহ তাঁহাকে পূজা করিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমি বলিলাম, 'আচ্ছা আমি তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে পারি কি ?' তাঁহারা হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'চেষ্টা করিয়া দেখুন। কিছুদূর যাইয়া হঠাৎ দেখিবেন যে তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'আমি পিছনে পিছনে গেলে যদি তিনি আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলেন ?' তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে, সেইরূপ কোন আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে বেশীদূর যাইতেই পারিব না বলিয়াও মত প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু ঐভাবে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গতবোধ করিলাম না। তাই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি আপনার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতে পারি কি ?' তিনি বলিলেন, 'না, তা যাওয়া যায় না।' আমি

তাহাতে কোন জিদ্ করিলাম না। বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে; শ্রীশ্রীঠাকুরের অশরীরী ভক্তগণ তাঁহাকে খুব সম্ভবতঃ নিভৃত সুদূর প্রান্তরে পূজা করেন এবং সময় সময় হয়ত তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গেও ঐরূপ স্থানে তিনি দেখা করেন। ঐ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়েরও কিছু ঠিক ছিল না। একদিন প্রায় অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত ঠাকুর ফিরিয়া না আসায় আমরা আহার করিতে বসিলাম। এমন সময়ে তিনি হঠাৎ আসিয়া বলিলেন—"আপনারা খাইয়াছেন?" আমরা একটু সলজ্জভাবে বলিলাম, "হ্যাঁ খাইতেছি"। তিনি তাহাতে বলিলেন "আরও আগে খাইলেই হইত।"

তের দিন ঐ ভাবে একই কামরায় অবস্থানকালে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। ঠাকুর আমাকে, কি কাহাকে-ও কখনও কোনও আদেশ দিতেন না। আমরা দুইজন যে ঘরে থাকিতাম সেই স্থান হইতে কয়েক হাত দূরে বাড়ীর গেইট প্রায় সকল সময় বন্ধ থাকিত। বাহির হইতে কেহ দরজায় শব্দ করিলে তাহা খুলিয়া দেওয়া হইত। প্রথম দুই একবার লক্ষ্য করিলাম যে ঐ গেইটে শব্দ হওয়া মাত্র ঠাকুর কিছু না বলিয়া নিজেই গেইট খুলিয়া দিতেন। তৎপর আমিই ঐ কাজ করিতে সংকল্প করিলেও আমার বিছানা হইতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর দুই একবার তাহা করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ লজ্জিত হইয়া পরে আমি বিছানায় শোয়া থাকিলেও লাফাইয়া উঠিয়া গেইট খুলিয়া ফেলিতাম। ঐ কয়েকদিনের মধ্যে ঠাকুর আমাকে কোন উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না এবং আমি মনে মনে ও কোন উপদেশ প্রার্থী হই নাই। তাঁহার কাছে থাকার পরম সৌভাগ্যই যেন আমার ঐ সকল

LIBRARY

বাসনাকে লুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন আমাদের থাকার ঘরের পাশের একটি সতেজ লাউ কি কুমড়ার ডগার দিকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'খুব ত লাফাইয়া চ'লছ, শেষে ত কাইটা নিব।' অপ্রত্যক্ষে হয়ত ঐ ভাবে কিছু উপদেশ পাইয়াছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে, কি স্পষ্টতঃ কোন উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এতদ্ব্যতীত কাহারও সঙ্গে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা-ও তিনি কখনও বলেন নাই।

আমার তথায় অবস্থানের দুই একদিন পরেই ঠাকুর একদিন রোহিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি রান্না হইয়াছে?" রোহনীবাবু কি কি রান্না হইয়াছে ঠাকুরকে জানাইলে, তিনি বলিলেন "মাংস রান্না হয় নাই, শুভবাবু খাইবেন কি?" এই কথার পর তাঁহারা প্রত্যহই মাংস রান্নার ব্যবস্থা করিলেন, যদিও তৎপূর্ব্বে যাহা রান্না হইত তাহাই আমার অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত এবং দিদদের সযত্নের রান্না আমার খুবই ভাল লাগত। ইহা সত্য যে, আমি তৎকালে মাংস ভালবাসিতাম, কিন্তু তাঁহাদের রান্নার বৈশিষ্ট্যে আমার মাংস খাওয়ার কথা সম্ভবতঃ মনে ও উদয় হয় নাই। যাহা হউক কয়েকদিন উপর্য্যুপরি মাংস খাওয়ায় আমার গায়ে পাঁচড়ার ন্যায় ছোট ছোট গুটী উঠিতে লাগল। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ গুটী দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি মাংস রান্নার কথা বলায় আমার প্রত্যহ মাংস খাইয়া এই অবস্থা হইয়াছে।" তাহা দেখিয়া একটু মৃদু হাসিয়া তিনি কতকগুলি পাতা সংগ্রহ করিলেন এবং নিজেই তাহা নিংড়াইয়া আমাকে খাইতে দিলেন। তাহা খাওয়ার পর ঐ গুটী গুলি আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল এবং কোন উপদ্রব আর রহিল না।

আম তথায় যাওয়ার ছয়, সাতদিন পর হুগলী জেলার রামদাস বাবু নামক একজন ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিলেন। তিনি তখন বিহার প্রদেশের বালী জেলায় থাকয়া ঘিএর ব্যবসা করিতেন এবং তাঁহার পরিবার-বর্গ কাশীতে ছিল। রোাহনী বাবুর নিকট শুানলাম যে তিনি স্বামী ভোলানন্দগিরি মহারাজজীর শিষ্য, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সম্পন্ন। কারণ তিনি নাক ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়া অভূতপূর্ব্ব শান্ত পাইয়াছেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা যে ঠাকুর একবার তাঁহার বাড়ীতে পদার্পন করেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে এ যাবৎ রাজী হন নাই। রামদাসবাবু যেদিন এখানে উপাস্থত হইলেন, সে দিন প্রাতেই ঠাকুর জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক সুরে বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ভাগ্যে নাই, ঠাকুর কি করিয়া যাইবেন। তা' না হইলে এইরূপ হইবে কেন?"। রোহিনীবাবু আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে, "ঠাকুরের তাঁহার বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, তাই এই জ্বর হইয়াছে। রামদাসবাবু চালয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্বর সারিয়া যাইবে। আরও দুই একবার রামদাসবাবু এইরূপ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথে ফিারয়া গিয়াছেন।" রামদাসবাবুর রঙ্ ফরসা, সুন্দর চেহারা, তিান অতি মিষ্টভাষী ও গম্ভীর স্বভাবের লোক। তাঁহার বিষণ্ণ বদন ও ভাব দোখয়া এবং উপরোক্ত কথা শুানয়া আমার মনে বড়ই দুঃখ হইল। কয়েক দিন শ্রীশ্রীঠাকুর সহ একই ঘরে প্রায় সময় থাকায় তাঁহার সাহত আলাপ ব্যবহারে একটু সাহস ও বাড়িয়াছিল। রামদাস বাবুর ঐ অবস্থা দোখয়া আমি ঠাকুরকে বলিলাম, "রামদাসবাবুর মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। একবার তাঁহার

বাড়ীতে যাইবেন কি ?" ঠাকুর এই কথার উত্তরে বলিলেন, "হ্যাঁ, যাইব।" ইহাতে রামদাসবাবু উৎসাহিত হইয়া কবে, কোন গাড়ীতে কোন সময়ে বালী ষ্টেশনে ঠাকুর উপস্থিত হইবেন ইত্যাদি কথা ভালরূপে জানিয়া লইয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঠাকুর প্রকৃত পক্ষে যাইবেন কিনা, ঐ সন্দেহ রোহিনীবাবুদের রহিয়াই গেল। বস্তুত পক্ষে ঠাকুর পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট তারিখে আমাকে সঙ্গে করিয়া ট্রেনে বালী রওনা হইলেন। পথে কোন কোন ষ্টেশনে ভাল মালাই আদি পাওয়া যায় বলায়, আমি কিছু কিছু কিনলাম এবং তাঁহাকে স্পর্শ করাইয়া পরম আনন্দে আহার করিলাম। কিন্তু তিনি স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করিলেন না।

সন্ধ্যার সময়ে বালী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম রামদাসবাবু আমাদের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া টাঙ্গা করিয়া তাঁহার বালীর বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটি ছোট একখানা দোতলা পাকাবাড়ী। নীচের তলায় কতগুলি ঘি এর টীন ছিল। উপরে মাত্র একখানা কোঠা ও তাহার দুই পার্শ্বে বারান্দা। ঐ কোঠায় একখানা তক্তপোষে শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা হইলে, আমি তাঁহার পার্শ্বে মেজেতে আমার বিছানা পাতিলাম। রামদাসবাবু খুব সম্ভবতঃ পিছনের বারান্দায় শুইয়াছিলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া আমরা তিনজনই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া বেড়াইতে ছিলাম। ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বে খুব বড় বড় গাছ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "এই সকল গাছের তলায় বিশ্রাম করিতে খুবই ভাল লাগে।" আমি বলিলাম, "এই স্থান দিয়া কখনও আপনি গিয়াছেন কি ?" ঠাকুর উত্তর করিলেন যে, তিনি ঐ জায়গায় আর কখনও আসেন নাই। তারপর

গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। রামদাসবাবু উপরের তলায় পেছনের বারান্দায় রান্নাদি করার পর আমরা স্নান আহার সম্পন্ন করিয়া দ্বিপ্রহরে শয়ন করিলাম। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে ঠাকুর কখনও স্নান করিতেন না; এবং অন্ন গ্রহণ করিতেও তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। সামান্য একটু ঘি এর সঙ্গে একটু কলা চট্‌কাইয়া, বা সামান্য একটু লুচি, তরকারীই তাঁহার আহারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

দ্বিপ্রহরে তাঁহার বিছানার উপর এক খানা পাতলা সাদা চাদর গায়ে দিয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন, এমন সময় আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে জাগিয়া দেখি ঠাকুর তাঁহার বিছানায় নাই। আমি প্রথমতঃ মনে করিলাম, হয়ত কোন প্রয়োজনে তিনি নীচে গিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে ও যখন তিনি আসিলেন না, তখন উভয় বারান্দায় যাইয়া এদিক্ ওদিক তাকাইয়াও তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া আবার আসিয়া শয়ন করিলাম। মনে হইতে লাগিল মুজাঃফর পুরে ১৩ দিন থাকা কালে এক ভোর সময় ছাড়া তাঁহাকে বাথরুমে যাইতে, কি মল মূত্রাদি ত্যাগ করার জন্য কোথাও যাইতে দেখি নাই। তাহা হইলে এখন তিনি কোথায় গেলেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার জাগিয়া দেখিলাম, আমি প্রথম ঘুমাইবার সময় তাঁহাকে যে ভাবে বসা দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবেই তিনি বসিয়া আছেন। আমার জানিতে কৌতূহল হইল ঠাকুর কোথায় গিয়াছিলেন। কারণ প্রাতে বেড়াইবার সময় আমাদের সঙ্গে বহুলোকের দেখা হইলেও তাহার মধ্যে একজন বাঙ্গালীরও দেখা পাই নাই। তাহা ছাড়া, ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন যে, ঐ জায়গায় তিনি আর কখনও

আসেন নাই। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তথায় কাহারও বাড়ীতে যান নাই। মুজাঃফরপুরে বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর অশরীরীভাবে বৃন্দাবন আদি নানা স্থানে বেড়াইয়া আসেন। তবে আজও কি ঠাকুর কিছুকালের জন্য ঐরূপ কোন স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন? মনে মনে ঐরূপ অনেক চিন্তাই করিলাম, কিন্তু ঠাকুরকে ঐ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। রামদাসবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি উপর তালা হইতে নীচে নামার সিঁড়ির নিকটেই একস্থানে দ্বিপ্রহরে শুইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে কোনও সময় নীচে নামিতে দেখেন নাই। আমার মনে নানা জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। শুনিয়া ছিলাম সাধু মহাত্মাদের মধ্যে কেহ কেহ দেহ এক স্থানে রাখিয়া বহুদূরে নানা স্থানে ঘুরিয়া আসিয়া পুনঃ দেহে প্রবেশ করেন। কিন্তু দেহ ও কাপড়, চাদর আদি সহ আকাশ পথে যাওয়ার কথা কখনও শুনি নাই।

তারপর দিন প্রাতে রামদাসবাবু সহ আমাদের তাঁহার কাশীর বাসা বাড়ীতে যাওয়ার কথা। ভোরে উঠিয়াই রামদাস বাবু রান্নার জোগাড় করিলেন। আমি ও স্নানাদি সমাপন করিয়া, তাঁহার রান্না করার সময়, কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের থাকার ঘরে আসিয়া দেখি ঠাকুর সেখানে নাই। এদিক ওদিক ঘুরিয়া কোথাও তাঁহাকে না দেখিয়া আবার রামদাসবাবুর নিকট গিয়া বসিলাম এবং ঠাকুর কোথায় গেলেন এবং কেনই বা দেরী করিতেছেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ কোথায় ও যাইতে হইলে, ট্রেন ছাড়ার সময়ের অনেক পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পৌছান'র অভ্যাস সম্বন্ধে জানা ছিল বলিয়াই, সেদিন তাহার যেন ব্যাতক্রম হইতেছে

বোধ করিয়া আমরা উভয়ে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে ছিলাম। আমার পূর্ব্বদিন দ্বিপ্রহরের অভিজ্ঞতা প্রসূত কৌতূহল হেতু ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠেন কিনা দেখার জন্য আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদের উভয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আপনারা খান নাই? আমরা বলিলাম, "রান্না হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি না আসায় আমরা খাইতে বসি নাই"। ঠাকুর তখন হাত, পা না ধুইয়াই বসিয়া পড়িলেন এবং আমরা উভয়ে একটু প্রসাদ লইয়া তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিলাম এবং জিনিষপত্র টাঙ্গাতে উঠাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখনও ট্রেন আসার ১০।১২ মিনট গৌণ ছিল। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা কাশীতে আসিয়া পৌঁছিলাম এবং ষ্টেশন হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে রামদাস বাবুর তথাকার বাসার দিকে রওনা হইলাম। গাড়ী একটু অগ্রসর হইতেই আমার মনে হইল, ঠাকুর যেন অশরীরী কাহাকেও মাথা একটু নোয়াইয়া নমস্কার কি প্রতিনমস্কার করিলেন। ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে যে কৌতূহল প্রায় দুই দিন অতি কষ্টে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা নিরাকরণের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা, মানুষ কি নিজ শরীর এবং পরিহিত বস্ত্রাদি সহ শূন্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে পারে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "হাঁা, যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ যাইতে পারে, মানুষ ঐ সকল নিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে পারে এবং একই সময়ে বহুস্থানে উপস্থিত হইতে পারে"। আমি তখন বলিলাম, "আপনি কাল বিকালে কোথায় গিয়াছিলেন"? ঠাকুর একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'হাঁা,

কাল দ্বিপ্রহরে একটু বেড়াইতে গিয়াছিলাম।' আমি আবার বলিলাম, "আজ প্রাতে কোথায় গিয়াছিলেন?' তখনও ঐ ভাবেই বলিলেন, "আজ প্রাতেও একটু বেড়াইতে গিয়াছিলাম।' ইহার পর আর প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হইল না, বা তিনি শক্তি দিলেন না, এবং ঐ সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে হরিশচন্দ্র ঘাটের নিকটস্থ আউধগর্ব্বি মহল্লায় রামদাস বাবুর পারবারবর্গ যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় ঐ রাত্রি ও তৎপর দিনও কয়েকঘণ্টা অবস্থান করিয়া আমরা বাঙ্গালী টোলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত অধর ঘোষ মহাশয়ের বাসায় গেলাম। ঐ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া একজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে গঙ্গার তীরে মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধ, তর্পণ সম্পন্ন করিলাম।

অধরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে কতদিন কাশীতে থাকবেন, এবং তৎপর কোথায় যাইবেন জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর মৃদু হাসিয়া আমাকে দেখাইয়া বাললেন, 'ইনিই এবার আমার রেলওয়ে গাইড্। যেখানে নিয়া যান, সেইখানেই যাইব।' আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলাম যে, ঠাকুরকে নিয়া এলাহাবাদ ও তারপরে বৃন্দাবনে যাইব। সম্ভবতঃ পরের দিনই এলাহাবাদ (প্রয়াগ) তীর্থাভিমুখে রওনা হইলাম। প্রয়াগের পথে একজন সাধু সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইল। পূর্ব্ব বৎসরের পূজার বন্ধের মাসেক পূর্ব্বে আমার পরম পূজনীয় দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত তিন মাসের ছুটি নিয়া আমাদের উভয়ের পরিবারের সকলকে নিয়া কাশীতে হাওয়া পারবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন। পূজা উপলক্ষে অপিস বন্ধ হওয়ার পর আমিও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম। আমরা ঐ সময় মানমন্দির মহল্লায় ছিলাম এবং

কাশীতে সাধু মহাত্মাদের দর্শনেচ্ছায় নানা স্থানে খোঁজ লইতে ছিলাম। শ্রীদুর্গাকান্ত রায় নামক একজন সাব্‌জজের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হইলে এবং তাঁহার নিকট ঐ বিষয় জানিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন, "আমার গুরু আউধ গর্ব্বিতে আছেন। তিনি খুব বড় সাধু এবং নানারূপ ঐশ্বর্য্য ও শক্তি তাঁহার আছে। তিনি সূর্য্যের রশ্মির সাহায্যে কাঠকে ইচ্ছানুযায়ী সোনা, রূপা ইত্যাদিতে পরিণত করিতে পারেন এবং আজই কয়েকজন আমেরিকাবাসী ভদ্রলোক এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া স্বচক্ষে দেখার জন্য তাঁহার নিকট যাইবেন। আপনারাও ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারেন।" স্বভাবতঃই আমরা তাহা দেখার জন্য উৎসুক হইলাম ও সাধু দর্শন উপলক্ষে আমরা ফল বা টাকা কি দিব, বন্ধুভাবে তাঁহার উপদেশ চাহিলাম। দুর্গাকান্ত বাবু বলিলেন যে, তাঁহার শিষ্য না হইলে, অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র না নিলে তিনি টাকা বা ফলাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি ইহাও বলিলেন, "তিনি মহাপুরুষ; আপনারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।"—ইত্যাদি। তিনি আমাদিগকে স্বামীজীর বাসস্থানের ঠিকানা আদি লিখিয়া দিলেন এবং স্নান করিয়া অতি সত্বর তথায় যাইতে বলিলেন। ঐ স্থান আমাদের তৎকালীন বাসস্থান হইতে অনেক দূরে ছিল বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শুনিলাম যে আমেরিকানেরা অল্প কিছু সময় পূর্ব্বে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন এবং সূর্য্য কিছুটা মেঘাবৃত থাকায় সেদিন পূর্ব্বকথিত রূপে কাষ্ঠখণ্ডকে কোন ধাতুতে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। ঐ সম্পর্কে ইহাও জানিলাম যে, হিমালয়ে ঐ বিষয়ের শিক্ষাকেন্দ্র আছে এবং স্বামীজী

ঐরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র কাশীতে স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়া সুবৃহৎ স্থান নিয়া শিষ্যদের সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলোচনাও করিতেছেন। যাহা হউক, আমরা স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে এক কামরায় উপবেশন করিলাম। শিষ্যদের মধ্যে পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সবজজ-আদি ছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার নিকটস্থ একটি ছোট ছেলের হাত হইতে একটি ছোট খেলার বল লইয়া তাহাকে ফেরৎ দেওয়া মাত্র ফুলের সুগন্ধে সমস্ত ঘর ভরপূর হইয়া গেল। একটু পরেই আবার তিনি ঐ বলটি নিজ হাতে নিয়া ফেরৎ দিলে অন্য ফুলের, সম্ভবতঃ হাসনাহানার গন্ধে আমাদিগকে মাতোয়ারা করিল। কিছুক্ষণ পর স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। দুর্গাকান্ত বাবুর হাবভাবে মনে হইল, তাঁহার ইচ্ছা আমরা তাঁহার গুরুদেব হইতে দীক্ষা গ্রহণ করি। তিনি আমাদিগকে আর একদিন আসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা যদিও কোন মহাত্মা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছুক ছিলাম, এস্থানে আমাদের মন আকৃষ্ট হইলনা এবং ঐ বাড়ীতে আর যাওয়াও হয় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতকথা না বলিয়া নিবেদন করিলাম যে, পূর্ব্ব বৎসর পূজার বন্ধে কাশীতে শুনিয়া ছিলাম, কাশী ক্যাণ্টনমেণ্ট মহল্লায় একজন সাধু খুব বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়া একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করিবেন। সেখানে থাকিয়া শিক্ষার্থী গণ ১২ বৎসর কেবল অধ্যয়ন করিবেন এবং ঐ কম্পাউণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র কোথায়ও ঐ সময়ের মধ্যে যাইতে পারিবেন না। যখন ইচ্ছানুযায়ী সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে যে কোন ধাতু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তাঁহারা যথা ইচ্ছা চলিয়া

যাইতে পারিবেন। হিমালয়ে না কি ঐ রূপ শিক্ষায়তন বিদ্যমান আছে।" ঠাকুর মনোযোগের সহিত ঐ কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "তিনি যদি ইচ্ছামত সোনা রূপাদি প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহা হইলে শিষ্যদের নিকট হইতে টাকা নেন কেন?" এই উত্তরের পর ঐ সম্বন্ধে আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য রহিল না এবং তিনি ও আর কিছু বলিলেন না।

কাশী হইতে প্রায় সন্ধ্যায় এলাহাবাদ পৌঁছিয়া এক ধর্মশালায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তথায় একটি ছোট কামরা আমাদের উভয়ের থাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। উহাতে দুই খানা বিছানা পাশাপাশি পড়ার স্থান ছিল না, কিন্তু এক খানার নিম্নভাগে আর একখানা বিছানার স্থান ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ের তলায় আমি বিছানার স্থান পাইব বলিয়া আমার তাহাতে মনে মনে আনন্দই হইল। একখানা বিছানা ঠাকুরের জন্য করিয়া আর একখানা করিতেছি, এমন সময় ঠাকুর বলিলেন, "না, এই বিছানায়-ই শুইবেন।" আমি বলিলাম "নীচের দিকে বেশ জায়গা আছে।" ঠাকুর তত্রাচ বলিলেন, "আমার পাশে এখানেই বেশ স্থান হইবে।" এই কথার পর আর কিছুই বলিতে সাহস পাইলাম না এবং তাঁহার পাশে শোয়ার পর এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল।

তৎপর দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তথায় রাখিয়া তাঁহার অনুমতি নিয়া ত্রিবেণী স্নানান্তে স্বর্গীয় পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করিলাম। যদিও পাণ্ডাদের কিছু দৌরাত্ম্যের বিষয় পূর্ব্বে লোক মুখে শুনিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার অভীপ্সিত কার্য্য করিতে একটুও বেগ পাইতে হয় নাই।

PRESENTED

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ঠাকুর একজন গেরুয়া বসন-ধারী পরিব্রাজকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখাইয়া কিছু দিতে বলিলেন। আমি ঐ পরিব্রাজককে সামান্য কিছু দিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলাম। অনেকদূর ভ্রমণে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমি জল খুঁজিতেছিলাম। পরিব্রাজক মহোদয় সাগ্রহে তাঁহার কাঠের কমণ্ডলু হইতে যথেষ্ট পরিমাণ অতি পরিষ্কার জল আমাকে পান করাইলেন।

ধর্ম্মশালায় শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া মনে পড়ে না। আমাকে একটু প্রসাদ করিয়া দিলে, আমি লুচি মিষ্টি আদিতেই ঐ দিন আহার সমাপন করিলাম।

তথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়া বৃন্দাবন যাওয়া মনস্থ করিয়া ছিলাম এবং তথায় এখনও নাকি কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পান ইত্যাদি অনেক কথাই তাঁহার সহিত আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অন্ততঃ পক্ষে কালী পূজার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও প্রভাত বাবু সহ নোয়াখালী পৌঁছিতে হইবে আমার এই প্রতিশ্রুতি মনে পড়িয়া যাওয়ায়, অতি অনিচ্ছার সহিত বৃন্দাবনে ঐ সময়ে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ঠাকুরকে জানাই-লাম। সেইবার তিনি কখন কোথায় আমরা যাইব, তাহা ঠিক করার ভার অন্ততঃ পক্ষে দৃষ্টতঃ আমার উপরই সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতেই রাজী হইলেন।

কলিকাতা ফিরিবার পথে সম্ভবতঃ রেলগাড়ীতে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলাম, "গতবার আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি ত' তাহার

কিছুই পালন করিতে পারি নাই।” যতদূর মনে পড়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন—“তার জন্য চিন্তা কি? আমিই তো আছি।” বলা বাহুল্য, এই উত্তরে মনে খুবই জোর ও শান্তি পাইলাম। তারপর বলিলাম, “এবার ত কিছু বলিলেন না।” তাহাতে তিনি বলিলেন, “আর কিছুর দরকার হইবে না। জানেন ত' বটগাছের বীজ কত ছোট, কিন্তু তাহা হইতে কত বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যাহা বলিয়াছি তাহা করিলেই সমস্ত পাইবেন, কিছুই অপ্রাপ্ত থাকিবে না।”

কলিকাতায় আসিয়া তৎকালীন 'সত্যনারায়ণ ভাণ্ডারের' মালিক আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিক্সন লেনের বাসায় শ্রীশ্রীঠাকুর সহ উঠিয়াছিলাম। তথায় একদিন, কি দুই দিন তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রভাতবাবু ও ঠাকুর সহ প্রাতে চিটাগাঙ্গ মেলে নোয়াখালী রওনা হইলাম। আমরা তিনজন ছাড়া আর ও কয়েকজন ভদ্রলোক ঐ ইণ্টারক্লাশ গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তৎকালে ইণ্টারক্লাশ গাড়ীতে আজকালকার মত ভিড় হইত না। আমরা বেশ লম্বা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একখানা বিছানা পাতিয়া নিজেরা পাশের বেঞ্চে বসিয়াছিলাম। ঠাকুর ঐ বিছানায় না বসিয়া তাহার একপাশে গিয়া বসিলেন। আমি একটু হাসিয়া ঐ লম্বা পাতা বিছানা দেখাইয়া বলিলাম, “এটা কার জন্য পাতা হইয়াছে।” ঠাকুর বলিলেন, “আপনারা গিয়া বসুন।” তাহাতে আমরা আরও হাসিয়া উঠিলে তিনি আস্তে আস্তে ঐ বিছানায় গিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ঐ ইণ্টারক্লাশের বাথরুমে যাইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া পুনঃ বিছানায় গিয়া বসিলে, প্রভাতবাবুর একনিষ্ঠ ভক্তি ও সেবার পরিচয় পাইয়া আমরা উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।

ঠাকুর ঐ সময় খালি পায়েই থাকিতেন এবং তৎকালীন ইণ্টার ক্লাশের বাথরুম আজকালকার বাথরুমের মত পরিষ্কারও থাকিত না। এমন অবস্থায় ঠাকুর বাথরুম হইতে বাহির হইয়া আসা মাত্র প্রভাতবাবু তাঁহার নিজ পরিধানের বস্ত্রের কোঁচা দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণদ্বয় ভালরূপে মুছাইয়া দিয়া ঐ বস্ত্রাংশ নিজ মাথায় মুছিলেন। নিকটস্থ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঐ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি আপনার ছাইলা (ছেলে)?" ঠাকুর "—হ (হ্যাঁ)" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। প্রভাতবাবুর এই প্রগাঢ়, একনিষ্ঠ ভক্তির পরিচয়ে, আমি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, "হায়, ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি ও বিশ্বাস এই তুলনায় একেবারেই কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

ঐ দিন-ই শেষ রাত্রে ট্রেণ নোয়াখালী ষ্টেশনে পৌঁছিলে, কামিনী বাবু প্রভাত বাবুকে তাঁহার বাসা বাটীতে লইয়া গেলেন এবং আমি ঠাকুরকে আমার বাসাবাটীতে আনিয়া আমার ঠাকুর ঘরে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। তৎপরদিন ঠাকুরকে কামিনীবাবুর বাসায় নেওয়ার পর তাঁহারই সম্মুখে প্রভাতবাবু কামিনীবাবুর স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন। বিকাল বেলা ঠাকুর আমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু প্রভাতবাবু কামিনীবাবুর বাসাতেই সেদিন থাকিতে বাধ্য হইলেন।

পরের দিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিলেন যে, প্রভাতবাবু আমোদ প্রিয় লোক; ওখানে থাকা সুবিধা বোধ করিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে আমাদের বাসায় নিয়া আসিলেই ভাল বোধ করিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ কামিনীবাবুর বাসায় গিয়া প্রভাতবাবুকে আনার অভিপ্রায় জানাইলে,

তাঁহারা ঐ দিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার প্রসাদ না নিয়া তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না বলিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

প্রভাতবাবুর অনন্য সাধারণ সরলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে পড়ে, কলিকাতা হইতে নোয়াখালী আসার পথে ট্রেনে ও ষ্টীমারে আমার ও প্রভাতবাবুর মধ্যে আলাপ আলোচনা কালে কথায় কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, "দাদা তোমার নোয়াখালীর ঢেঁকির শাক, বাটা মাছ ও কাউন্যা মাগুর খাওয়াইতে হইবে।" আমি বাসায় আসিয়া আমার মেজদা শ্রীসুখময় দত্ত মহাশয়কে এই কথা জানাইয়াছিলাম। তিনি বাজার হইতে একটি বেশ বড় কাউন্যা মাগুর নিয়া কামিনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহা সমুদ্রের মাছ ও দেশাচার মতে অখাদ্য বলিয়া কিছুতেই তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিলেন না। মেজদা অত্যন্ত নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভাতবাবুও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নীরব রহিলেন। সেদিন বিকাল বেলা আমাদের বাসায় চলিয়া আসার পর হইতে কোন-ও বিধি নিষেধের ঝঞ্ঝাট আমাদিগের কাহাকেও আর ব্যতিব্যস্ত করে নাই। কারণ আমাদের প্রাণের ঠাকুর কখনও আমাদিগকে কোনও বিধি নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করেন নাই। বরং আমাদের যাহাই খাইতে আগ্রহ হইত, তাহা খাওয়াইবার জন্যই ব্যস্ত হইতেন, ইহা অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাহার ও প্রারব্ধ প্রাপ্ত প্রকৃতির অনুশীলনে তিনি বাধা দিতেন না।

প্রারব্ধ ঋণ ভোগ দ্বারাই মুক্ত হয় বলিয়া অনেক সময়ই তাঁহার উপদেশ পাইয়াছি। একমাত্র "নামের" অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত প্রারব্ধ দণ্ড ভোগ না করিয়া দেব, দানব, মানব কেহই নিস্তার

পাইতে পারে না ; অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন, অতীন্দ্রিয়, পরমানন্দ রস আস্বাদনের পথে অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া ঠাকুর বারংবার আমাদিগকে বলিয়াছেন।

সেইবার মাত্র ৪।৫ দিন থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও প্রভাতবাবু নোয়াখালী ত্যাগ করেন। তাঁহাদের চলিয়া যাওয়ার ২।৩ মাস পরে আমার স্ত্রী প্লুরিসী রোগে ভুগিতে আরম্ভ করেন এবং রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই ১৩৩২ সনের ১লা ফাল্গুন তারিখে আমার বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান হিরন্ময় প্রায় জীবন্মৃত অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহার মায়ের অবস্থাও ক্রমশঃই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। সেই সময়ে তাহার নিয়ত চিকিৎসক নোয়াখালীর তৎকালীন সিভিল সার্জ্জন্ ডাক্তার যোড়শী লাল সরকার তাহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে বলেন। কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় তাহাকে ঐ জিলার একজন বিখ্যাত, সুদক্ষ কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইবার জন্য উপদেশ দেন। আমি অনন্যোপায় হইয়া ১৭০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে তৎকালীন শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ভাণ্ডারের মালিক মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সমস্ত কথা বলিয়া চিকিৎসার জন্য যথাবিহিত উপদেশ গ্রহণ করিয়া আমাকে জানাইবার জন্য পত্র দিলাম।

তদুত্তরে মতিবাবু আমাকে জানাইলেন যে, ঠাকুর আমার পত্রের বিষয় জানিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি নিজেই বাত রোগে অত্যন্ত অসুস্থ, সুতরাং তিনি আর এ বিষয়ে কি উপদেশ দিবেন। আমি ঐ উত্তরে মোটেই প্রবোধ পাইলাম না। আমার বারংবার মনে হইতেছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাকে যথাবিহিত উপদেশ দিতে পারেন। কারণ কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি

পূজার বন্ধে তাঁহার সঙ্গে প্রায় এক মাস থাকিয়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, দেহ বা তাহার রোগ ভোগ তাঁহার নিকট কিছুই নহে।

আমি পুনঃ মতিবাবুকে লিখিলাম যে তিনি যেন ঠাকুরকে বলেন যে কোনও রোগের দরুণ ঠাকুর আমাকে উপদেশ দিতে অক্ষম, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমাকে ঐ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ দিতেই হইবে। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টতঃ আমার এই অন্যায় আব্দার কার্য্যকরী হইল। ঠাকুর তদুত্তরে আমার স্ত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইবার অনুমতি দিলেন।

আমি সে সময়ে একটি বড় সরকারী মোকদ্দমায় নিযুক্ত থাকায় আমার মেজদা (জ্যেঠ্‌তুত ভাই) শ্রীযুক্ত সুখময় দত্ত ও আমাদের একটি পুরাতন চাকরকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম। বিশেষভাবে বলিয়া দিলাম যে, প্রথমতঃ স্বনাম ধন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার Younun কে দেখাইয়া এবং কিছু দিন তাঁহার চিকিৎসাধীনে রাখিয়া তৎপর প্রয়োজন বোধ করিলে বড় এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের যেন দেখান হয়।

মেজদা কলিকাতায় পৌঁছিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া চিকিৎসা সম্পর্কে উপদেশ চাহিলে, ঠাকুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে উপদেশ দেন। মেজদা Dr. Younun কে দিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করান আমার বিশেষ ইচ্ছা জানাইলেও, ঠাকুর তাহাতে মত না দেওয়ায় মেজদা একটু সমস্যায় পড়িলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করাইয়া দিলেন। তাঁহার পত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পষ্ট নির্দ্দেশ জানিয়া আমি

আশ্বস্ত হইলাম এবং নিজে না যাওয়ায় ঠাকুর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিয়া কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

যতদূর মনে পড়ে, ঠাকুর তখন হিদারাম ব্যানার্জী লেনে মতিবাবুর ভাড়াটে বাড়ীর নীচের তলায় এক কোঠায় থাকিতেন। তাঁহাকে তথায় যেরূপ অসুস্থ অবস্থায় দেখিলাম, তাহাতে আমার বাক্যস্ফুরণ প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল। ভীষণভাবে বাতাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পা দুখানি হাঁটু অবধি অত্যন্ত ফুলিয়া লালবর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে হাত কি মাথা স্পর্শ করান দূরের কথা, আমার চুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেও তিনি ব্যথা পাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় অতি সন্তর্পণে প্রণাম করা মাত্র ঠাকুর একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কোন চিন্তা করিবেন না, মা ভাল হইয়া যাইবেন। হয় এক, ওরা বলে আর।' তাঁহার এই আশ্বাস বাণীতে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার মনে হইল যে, ঠাকুর যখন বলিয়াছেন আমার স্ত্রী ভাল হইয়া যাইবে, তখন যমের বাবারও সাধ্য নাই যে আমার স্ত্রীকে এবার নিতে পারে, এবং এই কথা আমি তখনই আমার স্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজনকেও বলিয়াছিলাম। আমার ঐরূপ বলার কারণ এই যে, যদিও আমি জানিতাম যে ঠাকুর ভবিষ্যতের সকল কথাই অনায়াসে বলিতে পারিতেন, তত্রাচ তাঁহার আলাপ ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও তাঁহার ঐরূপ কোন শক্তি থাকার পরিচয় দিতেন না। কেহ ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেন কিছুই জানেন না এইরূপ উত্তরই দিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি কোন কথ বলার পূর্ব্বেই যখন নিজ হইতে ঐ কথা বলিয়া ফেলিলেন, তখন

ঐ বিষয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ রহিল না। কয়েকদিন পরেই কিছু ঔষধপত্র নিয়া আমরা নোয়াখালী ফিরিয়া আসিলাম এবং এলোপ্যাথিক ঔষধের ইন্‌জেকশন আদিতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত তালিকানুযায়ী প্রস্তুত ঔষধ মালিশ করায় রোগী ক্রমশ. সুস্থ হইতে লাগিল। কয়েক মাস পরে আমার স্ত্রী আমার দাদার তৎকালীন চট্টগ্রামের বাসায় বেড়াইতে গেলে ঠাকুর বৎসর খানেকের জন্য তাহাকে সেখানেই থাকিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

তদনুযায়ী আমার স্ত্রী চট্টগ্রামে আমার দাদার বাসায় থাকা কালীন এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি শিবচতুর্দ্দশীর বন্ধ উপলক্ষ্যে দাদার বাসায় যাইয়া কয়েক দিন ছিলাম। একদিন প্রাতে দাদা অফিসে যাওয়ার পর আমি একটু বিষণ্ণ মনে ঐ বাসার এক কামরায় বসিয়া আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের অসুখের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ একজন খুব বলিষ্ঠ, উন্নতকায় কৃষ্ণবর্ণের নাগা সাধু সমস্ত শরীর একখানা কম্বলে জড়ান অবস্থায় ঐ কামরায় প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "বাচ্চা তেরী ওয়াস্তে হম্ হিমালয়সে আয়া।" ইহার পর তাঁহার গলার রুদ্রাক্ষের মালা আমার হাতে জড়াইয়া চাপ দিলে ঝর্ ঝর্ করিয়া কয়েক ফোঁটা দুধ ঘরের মেজেতে পড়িল এবং তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি ও তাঁহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে তিনি হিমালয় হইতে আসিয়াছেন, তাহাতে আমার কি? শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাওয়ার পূর্ব্বে যদিও সাধু সন্ন্যাসীর নাম শুনিলেই একটু বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইতাম, তাঁহার সংস্পর্শে আসার পর হইতে যেন সেই ভাবটা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

সাধু সজ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ত ভালই, কিন্তু না হইলেও কোন আক্ষেপ বা অসন্তোষের কোনও ভাব মনে উদয় হইত না।

আমার তদনুরূপ মানসিক অবস্থায় ঐ সাধুর উক্তি বা রুদ্রাক্ষের মালা হইতে দুগ্ধ নিষ্কাশন ব্যাপার আমাকে একটুও বিচলিত করিল না। তিনি আবার আমার হাত দ্বারা রুদ্রাক্ষের মালায় চাপ দিয়া দুধ বাহির করিলেন, কিন্তু তাহাতেও আমার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। অতঃপর তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়া আমাকে বলিলেন, "কুছ দে দেও বাচ্চা"। আমি যৎসামান্য কিছু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেওয়া মাত্র তিনি আমাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া সরাসরি বড় রাস্তায় উঠিয়া জেটীর (Chittagong Jettyর) দিকে গেলেন। আমার দাদা তখন ঐ জেটি অফিসে কাজ করিতেন। বহুদূর পর্য্যন্ত ঐ সাধুকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আর কোনও বাড়ীতে না যাইয়া এবং আর কাহারও সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া দূরে অদৃশ্য হইলেন।

এ, বি, রেলওয়ে কোম্পানীর খনন করা প্রকাণ্ড দিঘীর উত্তর পাড়ে আমার দাদার কোয়ার্টার ছিল। আশে পাশে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ সন্ন্যাসী আর কাহারও বাড়ীতে যান নাই এবং কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও বলিল না। আমিও রাস্তায় যতদূর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি তিনি আর কাহারও নিকট কিছু চাহেন নাই। দাদা অফিস হইতে বাসায় আসিলে, তাঁহাকে ঐ সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবের কথা বলিলাম। তাঁহারাও তাঁহাকে দেখেন নাই বলায়, আমার মনে এক দৃঢ় সংশয় উদয় হইল যে ইনি সাধারণ ভিক্ষুক শ্রেণীর সাধু নহেন। কেবল আমাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি

আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভাষণ বা মর্য্যাদা রক্ষা কিছুই করি নাই। ঐ সময় "বাবাজী" নামক চট্টগ্রামের এক সাধু অনেক সময়ই দাদার বাসায় থাকিতেন এবং তিনি আমাকেও খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে ঐ বিষয় বলায় তিনি আমাকে বলিলেন, "সেই সন্ন্যাসী যে-ই হউক, তোমাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী। তুমি রুদ্রাক্ষের মালা হইতে দুধ বাহির করিতে পার কি?" বাবাজীর এই উত্তরে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না এবং ঐ সন্ন্যাসী কে এবং কেনই বা তিনি আমার নিকট আসিলেন, তাহা জানিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পুনঃ দেখা হওয়ার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কয়েক মাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দাদার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর কথা জানাইলে, তিনি নিজ হইতে সন্ন্যাসীর বর্ণনা করিতে লাগিলেন—যথা—"সন্ন্যাসী কি খুব লম্বা চওড়া, কালবর্ণের এবং মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল?" আমি "হ্যাঁ" বলিতেই ঠাকুর বলিলেন—"ডিটেক্‌টিভ্"। আমি বলিলাম, "এ কেমন ডিটেক্‌টিভ্? তিনি ত' আর কোন বাড়ীতে যান নাই। তবে কি তিনি ধর্ম্ম জগতের ডিটেক্‌টিভ্"? ঠাকুর, "হু" অর্থাৎ "হ্যাঁ" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সে বৎসর পূজার বন্ধে আমি হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম। তথায় **Louis Jubilee Sanitorium** এ প্রায় একমাস থাকিয়া কলিকাতায় গিয়া জানিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ১৪৮নং হ্যারিসন রোডের মেসের দোতলায় আমাদের বর্ত্তমানে পরলোকগত বন্ধু বীরেন রায়ের সঙ্গে আছেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম জানানোতে, তাঁহার মুখশ্রী

দৃষ্টে তিনি খুব খুসি হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিলেন,—"মাকে নিলেন না?" আমি একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম এবং তখনই মনে মনে স্থির করিলাম যে পরের বৎসর স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলকে নিয়া পূজার বন্ধে কোথায়ও বেড়াইতে যাইব।

পরের বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রীতিময় আমার স্ত্রীর সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে তাহার মায়ের সঙ্গে আমার শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া ভীষণ ইরিসিপ্লাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া আমরা সকলেই খুব ভীত হইলাম, এবং সিভিল সার্জ্জন ও অন্যান্য দুই তিন জন ভাল ডাক্তারের হাতে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিলাম। তাঁহারা অপারেশন আদি যথাসাধ্য চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কিছু করিয়া উঠিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। এদিকে এই ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালক ভীষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে "ঠাকুর, ঠাকুর আর পারি না", বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা না হয় না-ই শুনিলে, কিন্তু এই শিশুর আকুল আবেদনও কি শুনিতে পাও না"? ঠাকুর তখন কোথায় ছিলেন, আমরা কেহই জানিতাম না।

এই শহরে দুইটি রোগী কিছুদিন পূর্ব্বে এই ইরিসিপ্লাস রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ডাক্তারগণ আরোগ্যের ভরসা ছাড়িয়া দেওয়ায় আমি একেবারেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। এমন সময় সন্ধ্যায় রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে এখানকার একজন

মুসলমান ফকীর, ইনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত ; কিন্তু ঠাকুর কোথায় আছেন তাহাও জানি না, আপনার সঙ্গেও দেখা হয় নাই।" সমস্ত শুনিয়া তিনি আমাকে একটী বড় ফজ্‌লি আম লইয়া যাইতে উপদেশ দিলেন এবং তিনিও অতি সত্বরই যাইবেন বলিয়া বলিলেন। আমি বাসায় পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফকীর সাহেব আসিয়া শ্রীমানকে ঐ আমই একটু খাইতে দিয়া বলিলেন, কোন চিন্তা করিবেন না, অসুখ সারিয়া যাইবে।" আমি ঐ কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হইলেও বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমানকে চট্টগ্রাম নেওয়া সাব্যস্ত করিলাম এবং দাদাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম। ডাক্তার শ্রীমান ধীরেন রায় সহ রাত্রি ১০ টার গাড়ীতে আমি সপরিবারে চট্টগ্রাম রওনা হইলাম।

রাত্রে ট্রেনে শ্রীমান কোন অস্থিরতা দেখায় নাই এবং ভোরে গাড়ী সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছিলে সে উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমরা তাহাকে উঠাইয়া বসাইলাম। তাহার মুখে ইরিসিপ্লাস হওয়ায় তাহা অতি অস্বাভাবিক ভাবে ফুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে অনেকগুলি অপারেশন করায় তাহা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এক বিরাট অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া প্ল্যাটফরমের কোন কোন লোক হাসিতেছিল। সে তাহা দেখিয়া আমাকে বলিল,—"বাবা আমাকে শোয়াইয়া দিন, ওরা হাসিতেছে।" আমি তখন তাহাকে আবার বিছানায় শোয়াইলাম।

গাড়ী চট্টগ্রাম ষ্টেশনে পৌঁছামাত্র দাদা আমাদিগকে একখানা মোটর গাড়ীতে করিয়া তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত

শ্রীউমাপদ ... সরকার

অনুযায়ী তথাকার ইংরেজ সিভিল সার্জ্জেন ও বিখ্যাত সার্জ্জেন রায় বাহাদুর জ্ঞানচন্দ্র চাটার্জ্জী ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আসিয়া শ্রীমানকে খুব ভাল করিয়া দেখিলেন এবং রোগের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। তাঁহাদের মুখের চেহারায় আমার মনে হইল তাঁহারাও রোগ সাংঘাতিক বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি সিভিল সার্জ্জেনকে একাকী একস্থানে নিয়া সরলভাবে রোগীর অবস্থা জানাইতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "I can't say even now that the case is very hopeful, but the boy got admirable treatment at Noakhali. Let us see what we can do for him". ইহার পর কিছু ঔষধ prescribe করিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমরা একটু হতাশভাবাপন্ন হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ ছেলের অবস্থা ভালোর দিকে যাইতে লাগিল। যদিও তাহার অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া ডাক্তাররা তখনও প্রকাশ করেন নাই, তত্রাচ সরকারী মোকদ্দমার কাজের বিশেষ প্রয়োজন হেতু আমার নোয়াখালী চলিয়া আসিতে হইল, বিশেষতঃ আমার দাদার বাসায় থাকিলে আমার তথায় থাকা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন এবং অবস্থানুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আমার অনুপস্থিতিতেও হইবে, এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

নোয়াখালীর আসার পর আমি কিন্তু ছেলের অসুখের চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসার পরদিন প্রাতে বৈঠকখানায় বসিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ছেলের অসুখের বিষয় ভাবিতেছি এমন সময় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একখানা ছোট পত্র একজন

লোক আমাকে দিয়া গেল। ঐ পত্রখানা পড়িয়া তাহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার নির্দ্দেশ তাহাতে ছিল। যদিও তাহাতে লিখিত বিষয় খুব গোপনীয় ভাবেই তৎকালে রাখিয়াছিলাম, ঐ চিরকুট খানা আমার এতই মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল যে তাহা আজ পর্য্যন্ত সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। তাহা এখন প্রকাশ করিলে কোনও অন্যায় হইবেনা মনে করিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ

My dear brother,

Very anxious for your boy. Please let me know his yesterday's condition. To day is the first day of Sraban and he is out of danger. From the 20th to 29th Ashar his time was critical. Sri Sri Guru saved him. He came to Noakhali and went to Chittagong but His present whereabouts not known. Please tear this slip into pieces.

Yours affectly,
Kamini.
17. 7. 28

উপরোক্ত পত্রের বঙ্গানুবাদ—

ওঁ

প্রিয় ভ্রাতা,

আপনার পুত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। দয়া করিয়া

আমাকে তাহার গতকল্যের অবস্থা সম্বন্ধে জানাইবেন। অদ্য শ্রাবণ মাসের পয়লা তারিখ এবং তাহার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। ২০শে হইতে ২৯শে আষাঢ় তাহার সময় অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। শ্রীশ্রীগুরু তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নোয়াখালী আসিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থিতি জানা নাই। দয়া করিয়া এই চিরকুটখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

আপনার স্নেহের

কামিনী

১৭।৭।২৮

পত্রখানা পড়ামাত্র আমার বুকের উপর হইতে যেন একটা বিরাট বোঝা হঠাৎ নামিয়া গেল এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহা বারবার পড়িয়াও যেন আমার সাধ মিটিতেছিল না। মনে হইতে লাগিল, তবে কি ঠাকুর সশরীরে এখানে পদার্পণ করিয়া ছিলেন, না কামিনীদা এই সকল স্বপ্নে দেখিলেন? স্বপ্নে কি মাসের কত তারিখ হইতে কত তারিখ পর্য্যন্ত যে খুব সাংঘাতিক অবস্থা ছিল, তাহাও বলিয়া দেয়? ইত্যাদি নানা জল্পনা কল্পনায় আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম এবং একবার তখনই কামিনীবাবুর বাসায় যাইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত জানিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তখন অফিসে যাওয়ার প্রায় সময় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিকাল বেলা তাঁহার সঙ্গে দেখা করাই স্থির করিলাম।

আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া একটু বিশ্রামের পরই কামিনীবাবুর বাসায় যাইয়া তাঁহাকে বিস্তারিত ভাবে সকল কথা বলিতে অনুরোধ

করিলাম। তিনি বলিলেন, "ছেলের ২০শা হইতে ২৯শা আষাঢ় পর্য্যন্ত মৃত্যুযোগ ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহা কাটিয়া গিয়াছে। ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" আমি বলিলাম, "ঠাকুর কি বস্তুতঃই বলিয়া গেলেন, না আপনি স্বপ্নে দেখিলেন?" তিনি বলিলেন, "আপনারা চট্টগ্রাম রওনা হইলে ঠাকুর আপনাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছেন, তারপর তিনি কোথায় গিয়াছেন জানিনা। ঠাকুরই আমাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছেন, নচেৎ ঐ ভাবে লেখা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।" তাঁহাকে এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় আমি নিরস্ত হইলাম। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় সেইদিন হইতে ছেলের ঐ রোগে মৃত্যু-ও হইতে পারে এই নিদারুণ যন্ত্রনাদায়ক চিন্তার কবল হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি বলিলেন, "বিন্দুর বুঝি খুব অসুখ হইয়াছিল?" আমি একটু হাসিয়া উত্তর করিলাম, "আপনি-ই তো তাহাকে রক্ষা করিলেন।" এই কথা বলা মাত্র ঠাকুর অন্য কি, কি, কতগুলি কথা বলিয়া ছেলের অসুখের প্রসঙ্গকে একেবারে চাপা দিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। আমি ঐ প্রসঙ্গে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার বা বলিবার কোন সুযোগ না পাইয়া নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম। ঐ প্রকার আর-ও অনেক সময়ই দেখিয়াছি যে কোন কারণে তাঁহার কোন বিভূতি বা ভগবৎ শক্তির অভিব্যক্তি আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া পড়িলে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ তিনি দিতেন না এবং তাঁহার যে

অন্য মানুষ অপেক্ষা কোন-ও বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তি আছে তাহা আমরা যেন না বুঝিতে পারি, তাহার চেষ্টাই তিনি সকল সময়ে করিতেন। তিনি এমন ভাবেই কথা বার্ত্তা বলিতেন ও চলিতেন যে, তাঁহার নিকট আসিয়া সাধারণতঃ প্রায় কোন লোকই তাঁহার লুক্কায়িত, সাধারণ লোকের কল্পনার ও ধারণার অতীত অসীম শক্তির কোন-ও পরিচয় পাইতে বা উপলব্ধি করিতে পারিত না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ অনুযায়ী ১৩৩৫ সনের পূজার বন্ধে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে দেওঘর যাওয়া স্থির করিলাম। একজন বন্ধুর সাহায্যে তথাকার Willams Town এ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের নিকটস্থ "রৈবতক" নামক বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাড়া করিয়া সেবার পূজার বন্ধের প্রায় সবটাই তথায় কাটাইয়াছিলাম। একদিন ঐ বিদ্যাপীঠের বিস্তীর্ণ মাঠে আমরা বিকাল বেলা বেড়াইতেছি। এমন সময় দূর হইতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এইরূপ দুইজন ভদ্রলোককে দেখিয়া মনে হইল, যেন শ্রীশ্রীঠাকুর আর একজন লোক সহ আসিতেছেন। এমন কি ছেলে মেয়েরাও কেহ কেহ বলিয়া উঠিল "ঠাকুর মহাশয় আসিতেছেন।" আমরা তাড়াতাড়ি সেদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম ঠিক ঠাকুরের মত পোষাক পরিহিত অর্থাৎ সাদা চাদর গায়ে দেওয়া অন্য একজন আমাদের নোয়াখালী কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব পেস্কার বাবু সহ আসিতেছেন। পেস্কার বাবু বলিলেন যে আমাকে বাসায় না পাইয়া তিনি ঐখানে আসিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গের লোকটি চট্টগ্রামের বিখ্যাত তারাচরণ সাধু। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং সাগ্রহে ও পরমানন্দে তাঁহাকে আমাদের তৎকালীন বাসাবাটীতে লইয়া আসিলাম। আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

সুধাময় বাবুর নিকট ঐ সাধুজীর বহু গুণাবলী ও মাহাত্ম্যের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। দাদা চট্টগ্রামে থাকাকালীন ধলঘাটে সাধুজীর বাড়ীতেও গিয়াছিলেন এবং তিনি দাদাকে স্নেহের চোখেই দেখিতেন। বিপদ গ্রস্ত বহুলোক তাঁহার শরণ লইয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, ইত্যাদি অনেক কথাই দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত সরল ও দয়ার্দ্র চিত্ত ছিলেন।

আমার ঐ প্রবাস গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ছোট চিত্রপট বসাইয়া আমরা ফুল, জল দিয়া পূজা করিতাম। সাধুজী ঐ আসনের নিকট বসিয়া প্রণাম করিলেন ও "মা, মা" বলিয়া একটি গান করিলেন এবং আসনের নিকট দেওয়া যৎসামান্য প্রসাদও গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অতি মধুর ও নির্ম্মল আলাপ ব্যবহারে আমরা সকলেই প্রভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আরও দুই, তিন দিন তাঁহার তথাকার বাসস্থানে গিয়া আলাপ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তথায় থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ যুক্ত তিনখানা পত্র পাইয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

দেওঘরে অবস্থিতি কালে একদিন বিকাল বেলা নন্দন পাহাড়ের উপর বেড়াইতে গেলে এক ভয়ানক ঝড় উঠিল। তাহাতে খুব জোরে বালির ঝাপ্টা লাগিয়া আমার স্ত্রীর চোখ খুব লাল হইয়া উঠিল এবং তাহাতে ভীষণ যন্ত্রনা হইতে লাগিল। তাহার ঐ অবস্থাতেই আমরা কালকাতায় মতিবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং তথায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শের সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তথায় ৩।৪ দিন চক্ষু চিকিৎসার পর আমরা নোয়াখালীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আশ্রম পরিকল্পনা

১৩৩৫ সনের শেষ ভাগে অথবা ১৩৩৬ সনের প্রথম ভাগে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ফেনী কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে পত্র দ্বারা জানান যে, শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি তাঁহার থাকার জন্য একটি আশ্রম করার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে লিখিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে আমি যতটা বুঝিয়াছি তাহাতে তিনি কোন আশ্রমে থাকিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি সম্ভবতঃ চিরজীবন নানাস্থানে ঘুরিয়াই বেড়াইবেন। প্রমথবাবু পরের পত্রে জানাইলেন ঠাকুর স্পষ্ট ভাবেই ঐ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই পত্রালাপের কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাইয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি নাকি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা প্রমথ দাদাকে বলিয়াছেন ?' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ. একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে, ভালই হয়। এখন বয়স হইয়াছে এক স্থানে বসিয়া পড়িলে মন্দ হয় না।' তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমরা পূর্ণোদ্যমে আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলাম।

ঐ সম্পর্কে পেন্সান প্রাপ্ত ডি, এস্, পি, পরম শ্রদ্ধেয় পরলোকগত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকা হইতে আমাকে জানান যে, ১৬,০০০্ (ষোল হাজার) টাকা হইলে চারিদিক দেওয়ালে ঘেরা কম্পাউণ্ড সহ একটি তৈয়ারী বাড়ী ঢাকায় ক্রয় করা যাইতে পারে। আমি, উত্তরে জানাইলাম তাঁহারা ভাল মনে করিলে উহা খরিদের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। তাঁহার পত্র পাইলেই টাকা পাঠাইয়া

দেওয়া হইবে। কয়েক দিন পরে তিনি আমাকে জানাইলেন যে ঠাকুর ঐ বাড়ী ক্রয় করার মত দেন নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে দম্‌দম্‌ ও অন্যান্য স্থানে ভক্তগণ আশ্রমের স্থান খোঁজ করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু রোহিণী কুমার মজুমদার ও ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় পুরী হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে একজন জার্ম্মাণ কি আমেরিকান ভদ্রলোকের প্রতিষ্ঠিত ইডেন (?) যোগস্থান—ক্রয়ের জন্য গরুর গাড়ীতে করিয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন যে, স্থানটি খুব মনোরম এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তথায় থাকিতে হইলে বন্দুক রাখার প্রয়োজন হইবে; কারণ চারিদিকের লোকগুলি ভাল নহে। ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, যেখানে বন্দুক না রাখিলে থাকা যাইবে না সে স্থানে আশ্রম করার কোন দরকার নাই।

ঐ বৎসর পূজার বন্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুর আমাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন যে তিনি ঐ সময় ঢাকায় থাকিবেন এবং আমিও সপরিবারে পূজার বন্ধে তথায় থাকিতে পারি। বলা বাহুল্য এই পত্র পাইয়া আমি সাগ্রহে ও পরম আনন্দে পূজার বন্ধ তাঁহার সঙ্গে ঢাকায় কাটাইতেই স্থির করিলাম। আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা তৎপূর্ব্বে কয়েক বৎসরই পূজার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে থাকার জন্য বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। সেই বৎসরও ঐ রূপই, অন্ততঃ এক দিনের জন্য, পূজার সময় তথায় থাকার জন্য পত্র দেওয়ায় প্রথম পূজার দিন পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া ঢাকায় যাওয়া স্থির করিলাম। তদনুযায়ী অষ্টমী পূজার দিন শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীবরদাচরণ রায় ঠাকুর

সহ যে বাড়ীতে ছিলেন, তথায় আমি সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হই এবং কলিকাতা হইতে আগত বন্ধু বীরেন রায়কে তথায় দেখি। ঐ বাড়ীটিতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বড় বাড়ী ভাড়া করার জন্য আমাকে আদেশ দেন। এই সময়ে, সকলকে যেন বিশ্বাস না করি, এই সম্বন্ধেও তিনি আমাকে সাবধান করিয়া দিয়া ছিলেন। তথাকার বন্ধুগণের সাহায্যে নারিন্দা মহল্লায় 'ব্রজধাম' নামে একটি ত্রিতল বাড়ী আমরা ভাড়া করি ও দুই একদিন পরে তথায় চলিয়া যাই। ঠাকুর ঐ বাড়ীতে তেতলার একটি কামরায় থাকিতেন। আমার এবং বরদাবাবুর পরিবার এবং ২।৪ দিন পরে আগত প্রমথবাবু ও তাঁহার পরিবার সহ আমরা দোতলায় ছিলাম। নীচের তলায় বন্ধু হরিদাসবাবু, কিশোরী গোস্বামী, বীরেন মজুমদার, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন পাইন, আদি ভক্তগণ সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে কীর্ত্তন করিতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুর সহ তথায় নানাকথা আলোচনা হইত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঠাকুর যে কামরায় থাকিতেন তাহার উপরে একটি ময়ূর অনেক সময় বসিয়া থাকিত এবং ২।১টি বাঁদরও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের নির্দ্দেশেই ছাদের উপর মুড়ি ছিটাইয়া দিলে উহারা আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইত।

ঐ স্থানে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যাহাতে আমরা সকল বিষয়েই শান্তিতে ও আনন্দে থাকিতে পারি, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি সকালে ও মধ্যাহ্নে আমরা কি আহার করিব, তাহারও সময় সময় ব্যবস্থা করিতেন। যাহারা সকালে চা খাইতেন না, তাহাদিগকে এক কাপ করিয়া দুধ দেওয়ার নির্দ্দেশ দিতেন।

শ্রদ্ধেয় প্রমথবাবু প্রথম অবস্থায় একবার বলিয়াছিলেন যে রান্নার জন্য ঠাকুর রাখার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ মেয়েরাই তাহা অনায়াসে করিতে পারেন। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন,—"তাঁহারা তো সকল সময়ই আপনাদের খাওয়াইয়া, তারপর আহার করেন। এখানে কয়েকদিনের জন্য মাত্র বেড়াইতে আসিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদের রান্না করার কোন প্রয়োজন নাই। যথাসম্ভব আনন্দেই তাঁহাদের এ কয়টি দিন কাটাইবার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।" এমন কি তাহাদিগকে নিয়া সিনেমা যাওয়ার জন্য ও একদিন বুড়িগঙ্গায় নৌকার বাইস খেলা অর্থাৎ নৌকা চালন প্রতিযোগিতা দেখাইতেও তিনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মেয়েদের জন্য সকাল বেলায় ঘি, ভাত, মাছ ভাজা ও লঙ্কা ভাজা সহ খাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এক কথায় পূজার বন্ধের শেষ পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্ব প্রকারেই তথায় পরমানন্দে কাটাইয়াছি। তথায় অবস্থানকালে চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের সঙ্গে আসিয়া ২।১ দিন বাস করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ আমরা গাড়ীতে ও পদব্রজে আশ্রমের জন্য জায়গা ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে ঘুরিয়াছি। কিন্তু নানা অজুহাতে ঠাকুর কোন স্থানই আশ্রমের উপযুক্ত বলিয়া সম্মতি দেন নাই। একটি স্থানের মালিক 'ভাল লোক নয়' এই অজুহাতে ও বাদ দিয়াছিলেন, যদিও আমি বলিয়াছিলাম যে আমাদের জায়গার প্রয়োজন সুতরাং মালিক 'ভাল মন্দে' আমাদের কি ক্ষতি হইবে! যাহা হউক, পূজার বন্ধ শেষ হওয়ার অল্প পূর্ব্বে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা যাওয়ার প্রশস্ত বাসরুটের পাশে

যেখানে লক্ষ্মণ সাধু ছিলেন, তাহারই অতি নিকটে মাঠের মধ্যে একটি স্থান ঠাকুর আমাদের সঙ্গে যাইয়া নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলেন। বলিলেন, 'আসে পাশে ব্যবসায়ীদের বাড়ী আছে। ইহারা ভক্তলোক, কীর্ত্তনাদি প্রায়ই করে, সুতরাং এই স্থান ভালই হইবে।' ঢাকা শহরে তাঁহাদের দোকান থাকায় আমরা কথাবার্ত্তা বলিয়া ঐ স্থান ক্রয় করা প্রায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরের নিকট আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন যে, ঐ মাঠের মধ্যে পুকুর কাটিয়া মাটি ফেলিয়া অন্ততঃ বৎসর সাতেক না রাখিলে তথায় দালান হইতে পারিবে না। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন যেখানে দালান করিতে সাত বৎসর লাগিবে, ঐ স্থানে আশ্রম হইতে পারে না। এইভাবে ঢাকায় আশ্রম স্থাপনের আশা আমরা ত্যাগ করিলাম।

উক্ত 'ব্রজধামে' অবস্থান কালে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমনোমোহন পাইন শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তোলেন। সেই ফটোই "শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ" নামে পাহাড়তলী কৈবল্যধামে পূজিত হইতেছে। যতদূর মনে পড়ে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশেই বন্ধু বরদা বাবু ফটো তোলার পূর্ব্বে ঠাকুরের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন।

পূজার বন্ধ শেষ হইয়া আসিলে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া নোয়াখালী রওনা হই। যদিও আমার সঙ্গে একটি সুদক্ষ চাকর থাকায় আর কোন লোক সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন ছিল না, ঠাকুর এক প্রকার জোর করিয়াই ফটোগ্রাফার মনোমোহন বাবুকে আমাদিগকে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মনোমোহন দাদা আমাদিগকে খুব ভাল ভাবেই ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঢাকায় অবস্থান কালের দু'একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

একদিন সন্ধ্যার পর আমরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া আলোচনা কালে ঠাকুর ৺বীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা 'পটলি' কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমিত' এখানে বেশ আনন্দ করিতেছ, কিন্তু তোমার ঠাকুরকে মশারি না ফেলায় মশায় কামড়াইতেছে।" এই কথা বলায় শ্রীমতি পটলি তখনই বাসায় চলিয়া গেল এবং পরদিন শুনিলাম যে বস্তুতঃই ভুলক্রমে পটলি যে ঠাকুর কে পূজা কারত, ঐ ঠাকুরের বিছানার মশারি না ফেলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর ঢাকায় আসিলে প্রায় সময়ই উক্ত বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর তাঁহার বাসায় যাওয়া, এমনকি তাঁহার সহিত বাক্যালাপও বন্ধ করিয়াছিলেন। আমরা ঢাকায় যাইয়া বীরেন বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে দেখা করিয়াছি এবং তিনি যদিও অনেক সময় আমাদের অবস্থান কালে উক্ত ব্রজধামেই থাকিতেন, ঠাকুরের সাহত কখনও তাঁহার বাক্যালাপ হইতে দেখি নাই। তিনি একটু দূরে সরিয়াই বসিয়া থাকিতেন।

ঢাকার ভক্তগণের মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম যে নারায়ণগঞ্জের রবীন্দ্রবাবুর বাসাতে ঠাকুর অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহাদের পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায় নানা কাজই তথায় করিতেন। বিশেষ কোন কারণে ঠাকুর তাঁহাদেরই মঙ্গলের জন্য পরে নারায়ণগঞ্জ গেলেও আর তাঁহাদের বাসায় যাইতেন না এবং তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপও

করিতেন না। আমরা ঢাকায় থাকা কালে উক্ত রবীন্দ্রবাবুর মাতা ঐ 'ব্রজধামে' ঠাকুর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখামাত্র ঢাকার কোন কোন ভক্ত বলিলেন, "আজ দেখা যাক্ ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন!" আমরাও পূর্ব্বে উপরোক্ত বিষয় জানা থাকায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঠাকুর কি করেন, বা বলেন তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রবাবুর মাতা যদিও বহুক্ষণ ঠাকুরের সান্নিধ্যে ছিলেন ঠাকুর কোন কথা না বলায়, তিনি কেবল অশ্রুবিসর্জন করিয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কোন কথাই না বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। লোকপরাম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে, রবীন্দ্রবাবুর মাতা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা না মানিয়া নিজ ইচ্ছামত কোন কাজ করিয়াছিলেন, এইজন্যই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীহেমচন্দ্র সরকার নোয়াখালীতে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর জিলায়। পূজার বন্ধে তাঁহাকে আমার সঙ্গে ঢাকায় না আসিয়া বাড়ীতে যাওয়ার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ঐ সময়ে বাড়ী যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া তিনি শান্তি না পাইয়া ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। হেমবাবুও এইরূপ বিফল মনোরথ হওয়ায় আহারাদি না করিয়া আর একস্থানে চাদর মুড়ি দিয়াই শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রাতে ঠাকুর স্বয়ং হেমবাবুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "আপনি গত রাত্রে ত' বোধ হয় কিছুই খান নাই। স্নানাদি করিয়া কিছু আহারান্তে আমার জন্য কিছু আমলকি যোগাড় করিয়া আনিবেন।" এইভাবে আদেশ আংশিক

অমান্যের জন্য তাঁহাকে কিছু শাস্তিও দিলেন, ও পরে শান্তি দিলেন বলিয়া মনে হয়।

আমি নোয়াখালী ফিরিয়া আসার পর ঐ সনের অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে কলিকাতা হইতে ও পরে কাশী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র পাইয়া জানিলাম যে রাণাঘাটের নিকটস্থ "বীরনগর" গ্রামে আশ্রমের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন কোন ভক্ত বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি ক্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং কাশীতেও কোন কোন ভক্ত ঐ উদ্দেশ্যে বাড়ী সহ দুইটী স্থান পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে ঐ সম্পর্কে কোন পত্র না পাওয়ায় মনে হইল যে ঠাকুর ঐ সকল স্থানও আশ্রমোপযোগী বলিয়া মনে করেন নাই।

ঐ বৎসরেরই শেষভাগে অথবা ১৩৩৭ সনের প্রথমভাগে চট্টগ্রাম হইতে আমার দাদা সুধাময় বাবু জানাইলেন যে, ঠাকুর চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে নানা স্থান ঘুরিয়া পরে পাহাড়তলী ষ্টেশনের সোয়ামাইল উত্তরে রেল লাইনের প্রায় সংলগ্ন একটি ছোট পাহাড়ের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ পাহাড়টী ৺মহেন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ছিল। তিনি ঐ স্থানে কোন সাধুর আশ্রম হওয়ার ইচ্ছা করিয়া একখানা ছোট ঢেউ টিনের ঘর ঐ পাহাড়ের উপর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পর পর কয়েকজন সাধুই তথায় অবস্থান করিয়া কয়েকমাস পরে জ্বরের উপদ্রবে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ পাহাড়ের তিনদিকেই ঘন জঙ্গলে আবৃত বহু ছোট বড় পাহাড় ছিল, তাহাতে সাপ ও বাঘ আদি হিংস্র জন্তুর বসতিও ছিল। লোকের বসতি রেলরাস্তার পশ্চিম ধারে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন ও অনেকটা ভয়-সঙ্কুল

ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তাহা আশ্রমের জন্য নির্দ্দেশ করায়, আমরা সানন্দে ঐ স্থানেই আশ্রম প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বেই উক্ত মহেন্দ্র ঘোষাল মহাশয় পরলোক গমন করায় তাঁহার স্ত্রী ও সুযোগ্য পুত্র, উদারচেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের নিকট আমাদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সাগ্রহে ঐ পাহাড় দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ঐ সময়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীমণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে কলিকাতার পেন্সনপ্রাপ্ত ইন্‌কাম ট্যাক্স কমিশনার) তথায় ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছিলেন এবং ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল। তিনি ঐ পাহাড় আশ্রমের জন্য পাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই আশ্রম-স্থান নির্দ্দেশ করার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায় ও অন্যান্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি বর্ত্তমানে "কৈবল্য শক্তি" নামে পরিচিত বটবৃক্ষ তলে বসিয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে আশ্রম হইবে। ঠাকুরের নির্দ্দেশের বিষয়ে অবগত হইয়া আমিও নোয়াখালী হইতে আসিয়া স্থানটি দেখিয়া গিয়াছি। আশ্রমের পাহাড়ের উপর একখানা চৌচালা ছোট টিনের ঘর ছিল। কিন্তু তাহার কোন দিকেই বেড়া ছিল না। এখন আশ্রমে যে স্থানে পুরুষ ও মেয়েদের থাকিবার জন্য উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাসগৃহ আছে। ঐ স্থানেরই মধ্যস্থলে ঐ টিনের ঘরখানা ছিল। আমরা কয়েকজনে পরামর্শ করিয়া ঐ ঘরখানার চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়াইয়া সম্মুখে একখানা বারান্দার কোঠা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তৎপর ঐ পাহাড়ের উপর অস্থায়ী আবাসগৃহ

আদি নির্ম্মাণ ও টিউবওয়েল বসান হইয়াছিল। ঘন জঙ্গল কাটিয়া ঐ পাহাড়ে উঠিবার জন্য খুব সরু একখানা পথ-ও করা হইয়াছিল।

১৯৩০ ইং সনের ৭ই জুলাই (১৩৩৭ বাং, ২২শে আষাঢ়), পুরী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চিঠিতে এই আদেশ দিয়াছিলেন, "………আপনারা ১০ই শ্রাবণ তারিখে ঐ আশ্রমে চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎসব করিবেন; সেখানে সর্ব্বদা থাকার জন্য একটি লোক রাখিয়া দিবেন। যদি হরিবাবু ওখানে থাকেন তবে তিনি যাহাতে শান্তিতে থাকিতে পারেন সেই বন্দোবস্ত করিবেন। আমি ফাল্গুন মাসের ১৫ই ভিন্ন ঐ আশ্রমে যাইব না। সকল ভক্তবৃন্দকেই এই বিষয়ে জানাইবেন। ঐ তারিখে ঐ আশ্রমে চিত্রপট নিয়া যাইতে কোনরূপ বাধা করিবেন না … … …।"

এই পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে আসাম প্রদেশের 'লিডু' নামক স্থানে কোন কোম্পানীর কর্ম্মচারী শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (উপরোক্ত হরিবাবু) এই আশ্রমের সেবাইত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠার দুই এক দিন পূর্ব্বেই চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুয়ায়ী ১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ বাং আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইল। তৎকালে চট্টগ্রামে খুব অল্প সংখ্যক ভক্তই ছিলেন—যথা শ্রীমনীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুপ্ত শ্রীসুধাময় দত্ত, ৺বিধুভূষণ বসু এবং আরও কেহ কেহ। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপরোক্ত গৃহের সংস্কার এবং আশ্রমের স্থান পরিষ্কার আদি

৩১/২৪৬

সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া ছিল। ঐ সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চিটাগাং আর্ম্মারি রেইড্ (Chittagong Armoury Raid) কিছুদিন পূর্ব্বে ঘটায় তথাকার ভক্তগণ স্বভাবতঃই ঐ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বাদ্যাদি সহকারে কীর্ত্তন করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে সাহস করেন নাই। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন সকল "বিষয়ই ভাল লাগিয়াছিল, এবং যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছিলাম। কিন্তু কোন কীর্ত্তনের ব্যবস্থা না থাকায় আমি মনে বেশ একটু ব্যথাও পাইয়াছিলাম। চট্টগ্রামের গুরুভ্রাতাগণ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সত্ত্বেও মনে একটু ব্যথা রহিয়াই গিয়াছিল। তথায় ঐ দিন খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং আমরা উপস্থিত ৩০।৪০ জন সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে প্রসাদ গ্রহনান্তে-ও অনেকটা প্রসাদ থাকিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেছে এমন সময় পাহাড়ের নীচ হইতে এক কীর্ত্তনের দল খোল করতাল বাদ্যসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথে আমাদের পাহাড়ের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পরমানন্দে অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। ঐ কীর্ত্তনে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট প্রসাদ বিতরণ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, সরল প্রাণে ভগবৎ উদ্দেশে কীর্ত্তনাদি করিতে কোন অবস্থায়, কোন স্থানে ভীতি বা আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। তিনি ইহাও প্রতীতি জন্মাইলেন যে, প্রাণে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তিনিই তাহার বিধি ব্যবস্থা করেন, আমাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমি যখন নোয়াখালী হইতে চট্টগ্রাম রওনা হই, নোয়াখালী রেল ষ্টেশনে আমাদের সহরের 'নবাব সাহেব' নামক একজন মুসলমান ফকির আমার সঙ্গে মিলিত হন এবং আমি গুরুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য যাইতেছি বলায়, তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুর আশ্রমও চট্টগ্রামে এবং তিনিও তথায় যাইবেন। আমরা উভয়ে এক সঙ্গে চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। পাহাড়তলী ষ্টেশনে আসিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিলে, তিনি বলিলেন যে তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন এবং তথা হইতে পরে তাঁহার গুরুর দরগায় যাইবেন। উৎসবের দিন সমস্ত সময়ই তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উঠিলে, তিনি একটু পরে বলিলেন, 'ঠাকুর মহাশয় কৈ (কোথায়) ?' আমি বলিলাম তিনি ঐ দিন আসিবেন না বলিয়া পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন। তাহাতে ফকির সাহেব বলিলেন, 'আপনারা যখন প্রসাদ লইতেছিলেন, তখন ত' তিনি আপনাদের চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ; এখন কোথায় গেলেন ?' তদুত্তরে আমি বলিলাম, 'কৈ, আমরা ত' তাঁহাকে দেখি নাই !' তত্রাচ ফকির সাহেব বলিলেন, 'তিনি ত' উপস্থিত ছিলেন, আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি। এখন কোথায় লুকাইলেন।' ইহার পর আর আমি কিছুই বলিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে আমাদের দেখিবার মত চোখ নাই বলিয়া দেখি নাই, ঠাকুর নিশ্চয়ই আসিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে ফকির সাহেবের এক সময়ে যথেষ্ট 'জহুরা' বা ঐশ্বরিক শক্তি লোকে দেখিয়াছে বলিয়া আমি জানিয়াছিলাম। তিনি অনেক সময় পাগলের মত কথা বলিতেন, অথচ আতরাদি ব্যবহার করিতেন এবং সিগারেটেও

আতর লাগাইয়া ধূমপান করিতেন। পরিচ্ছদ-ও তাঁহার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। এই সকল কারণে নোয়াখালীর লোক একটু বিদ্রূপের ভাবেই তাঁহাকে 'নবাব সাহেব' বলিত। শ্রীশ্রীঠাকুর নোয়াখালীতে আমার বাসায় আসিলে তাঁহার সহিত দুই, একবার ফকির সাহেব দেখাও করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম এবং তিনি-ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখিতেন। ১৩৬৪ বাং সনে তিনি পরলোক গমন করেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন আমার দাদার চট্টগ্রামের বাসাবাড়ীতে 'বাবাজী' নামক যে সাধু অনেক সময় বাস করিতেন, সেই সাধুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজ হাতে একটি নারিকেলের চারা আশ্রমে রোপণ করিয়াছিলেন। এই সাধুজী সম্পর্কে দুই, একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি যদি-ও অপর লোকের সঙ্গে অনেক সময় পাগলের মত কথা বলিতেন, তত্রাচ আমাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারে খুবই স্থিরভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং তাহাতে আধ্যাত্মিক অনেক উপদেশবাণীও থাকিত। তিনি দয়া করিয়া একবার আমাদের নোয়াখালী সহরের বাসাবাটীতে যাইয়াও কয়েকদিন ছিলেন।

আমার নিকট এক সময়ে তিনি দুই শত টাকা চাহিলে আমি তাঁহাকে এক শত টাকার দুইখানা নোট দিয়াছিলাম। তিনি ঐ নোট দুইখানা চট্টগ্রামের একটি ডাক বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ডাক পিয়ন ঐ বাক্স খুলিয়া দুই শত টাকা পাইয়া একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ উপরিতন কর্ম্মচারী তাহার সততার পরীক্ষার জন্য ঐ ভাবে ডাক বাক্সে নোট ফেলিয়া রাখিয়াছেন মনে করিয়া সে নোট দুইখানা পোষ্ট অফিসে জমা করিয়া দেয়। ঐ পিয়নের এই নোট প্রাপ্তির বিষয়

পরস্পর আলোচনা হইতে আমার দাদা সুধাময়বাবু জানিতে পারেন। তিনি যে কোন প্রকারেই হউক, 'বাবাজীকে' আমি দুই শত টাকা দিয়াছি বলিয়া পূর্ব্বেই জানিতে পারায়, 'বাবাজী'-ই নোট দুইখানা ডাক বাক্সে ফেলিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তর দেন, 'টাকা বাক্সে ফেলিয়াছি যেন উহা বাড়িতে থাকে।" বস্তুতঃপক্ষে ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে চট্টগ্রামে এক ডি, এস, পি, (Deputy Superintendent of Police) ঘুষের মামলায় পড়ায় সরকার পক্ষ হইতে তাঁহার বিচারের জন্য তথাকার ডিভিশনাল্ কমিশনার ও জজ Mr. Bever, এই দুই জনকে নিয়া এক ট্রাইবুন্যাল বসে। এই ব্যাপারে লীগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার (Legal Remembrancer) আমাকে সরকার পক্ষের উকীল নিযুক্ত করায় এবং প্রায় এক মাস ঐ মোকদ্দমা পরিচালনা করায়, আমি বেশ কিছু টাকা ফিস্ বাবত পাইয়াছিলাম। উক্ত ডি, এস, পির পক্ষে মিঃ ফজলুল্ হক্ ও বরিশালের বিখ্যাত উকিল খান বাহাদুর হাসেম আলি খাঁ ও চট্টগ্রামেরও কোন কোন ভাল উকীল পরিচালনা করা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল এর বিচারে উক্ত ডি, এস, পি, কার্য্য হইতে বরখাস্ত হওয়ায় একটু যশও অর্জ্জন করিয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। উপরি উক্ত সাধু 'বাবাজী' কয়েক বৎসর পরই নিরুদ্দেশ হইয়া যান।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন রাত্রে আর একটি অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি প্রভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সংখ্যা চট্টগ্রামে খুব কমই ছিল। ঐদিন উৎসবান্তে সন্ধ্যার পর চট্টগ্রাম সহরের ভক্তগণ চলিয়া গেলে আমরা মাত্র ৪।৫ জন বর্ত্তমান ঠাকুর মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের টিনের ঘরে

PRESENTED
PRESENTED

শুইয়াছিলাম। গভীর রাত্রে জাগিয়া ঠাকুর ঘরের সামনে এমন সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন শুনিলাম যে, আমার প্রথমে মনে হইয়াছিল যে হয়ত স্বর্গের কোন গন্ধর্ব্ব বা অপ্সরী কিন্নরী কীর্ত্তন করিতেছে। আস্তে আস্তে ঐ ঘরের দরজা খুলিয়া অতি স্নিগ্ধ অথচ পরিষ্কার চন্দ্রালোকে ৩।৪ জন লোককে ঠাকুর ঘরের সামনে কীর্ত্তন করিতে দেখিতে পাইলাম। আমি ও আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত তাঁহাদের নিকটে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তন শুনিলাম। অপ্রত্যক্ষে আমার চোখের জল আনন্দে গড়াইয়া পড়িতেছিল। ঠাকুর যে কত দয়াল এবং কৃপা করিয়া কি ভাবে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, কেবল তাহাই বার বার মনে হইতেছিল। বস্তুতঃ পক্ষে ঐদিন তৎপূর্ব্বে কীর্ত্তনাদি খুব সামান্যই হইয়াছিল বলিয়া মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। গান শেষ হইলে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রদণ্ডী গ্রামের বর্ত্তমানে স্বর্গতঃ শৈলেন চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সঙ্গীগণই ঐ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাহারও সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। তাঁহারা বলিলেন যে, চট্টগ্রাম শহরে কোন এক স্থানে তাঁহারা লীলা কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন। কীর্ত্তন শেষে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে সেদিন ঠাকুরের আশ্রমে উৎসব হইতেছে। ইহা শুনিয়া তখন রাত্র অধিক হওয়া সত্ত্বেও এবং আর্ম্মারি রেইড (Armoury Raid) এর পর হইতে চট্টগ্রাম শহরে সৈন্যগণের টহল দেওয়ার বিষয় জানিয়াও ঐ কীর্ত্তন আসরের উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিষেধ না মানিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাঁহারা পথে কোন প্রকারের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন নাই। তাঁহাদিগকে

ঘরে আমাদের সঙ্গে শোওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা বর্ত্তমান ঠাকুর মন্দিরের স্থানের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড গাছের তলায় বিমল চন্দ্রালোকে সমস্ত রাত্র যাপন করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই উক্ত শৈলেন চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয় এবং ক্রমে ঘনিষ্টতা এতই বেশী হয় যে তাঁহার এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান ইন্দু ভূষণ চক্রবর্ত্তীর দেখা পাইলে আমার যে আনন্দ হয়, তাহা কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলেও হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্বন্ধে যখন আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিব, তখন এই দুই ভ্রাতার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি ও সেবাপরায়ণতার বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনই উপস্থিত অল্প কয়েকজন ভক্ত আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে আশ্রমের পূজার জন্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাস করার কামরার জন্য এবং কিছু রিজার্ভ ফাণ্ড করার জন্য অবিলম্বে অন্ততঃ পক্ষে ২০,০০০৲ (বিশ) হাজার টাকার প্রয়োজন। তখনই উপস্থিত সকলে প্রায় অর্দ্ধেক চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অন্যান্য নানাস্থানের ঠাকুরের আশ্রিত ভক্তগণ যেন পরবর্ত্তী ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা ঐ আশ্রমের কার্য্যে চাঁদা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, এইরূপ পত্র দেওয়া সাব্যস্ত হয় এবং অবিলম্বে নির্ম্মাণের কার্য্যাদি আরম্ভ করা স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে একখানা কাগজে আঁকিয়া কোথায় ঠাকুর মন্দির হইবে এবং কোথায় স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তগণের পৃথক পৃথক

বাসস্থান হইবে ইত্যাদি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। পরলোকগত শ্রদ্ধের গুরুভ্রাতা বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের উপর নির্ম্মাণের কার্য্যের ভার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের উপর সম্পাদকের কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছিল এবং আমাকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ঐ ৩০শে আশ্বিনের মধ্যেই প্রায় ২৫।২৬ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ঐ তারিখে পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ফেনী কলেজের তৎকালীন প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী ও নোয়াখালী শহরের কোন কোন ভক্ত আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আশাতীত অর্থ সংগ্রহে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম প্রবেশ

যতদূর মনে পড়ে ঐ সনের পূজার বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর ফাল্গুন মাসে আশ্রম প্রবেশ করিবেন বলিয়া আমাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য আশ্রম নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত বন্ধুগণকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঠাকুর মন্দির ও ভক্তগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য আমি বারবার তাগিদ দিতেছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে যদিও ঠাকুর মন্দিরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, টাকার কোন অভাব না থাকা সত্ত্বেও ভক্তগণের বাসস্থান নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হওয়ায়, মনে একটু ব্যথা পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া করিয়া ঐ ফাল্গুন মাসেই দোলোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে নোয়াখালীতে আমার বাসায় পদার্পণ করেন এবং কয়েকদিন পরে তথা হইতে আমি, পূর্ণবাবু আদি বহু ভক্ত সপরিবারে উক্ত প্রবেশের নির্দ্ধারিত দিনের একদিন পূর্ব্বে ১৪ই ফাল্গুন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর

সহ চট্টগ্রাম রওনা হই। ট্রেনে একখানা বেশ লম্বা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আমরা প্রায় ২০।২৫ জন ছিলাম। সাক্ষাৎ নরনারায়ণ সান্নিধ্যে আমরা সমস্ত দিন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে কাটাইলাম। পাহাড়-তলী ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা সকলেই আশ্রমের দিকে চলিয়া যাই। তিনি ২।১জন ভক্তসহ চট্টগ্রাম শহরে বিধুভূষণ বসু মহাশয়ের বাসায় যাইয়া উঠেন। তৎপর দিন, অর্থাৎ ১৫ই ফাল্গুন, শুক্লা দশমী দিন প্রাতে বিধুবাবু ও চট্টগ্রামের আরও কয়েকজন ভক্ত সহ শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা বাসে (Bus) আশ্রমের পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন আশ্রমে আসাম, কলিকাতা ও অন্যান্য নানা স্থান হইতে আগত আমরা যাহারা ছিলাম, পরমানন্দে বন্ধু শৈলেনের সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে ঠাকুর মন্দিরে নিয়া আসিলাম। তখন ঐ মন্দিরের দুইটি মাত্র কামরা ছিল, তাহার পূর্ব্বদিকের কামরায় ঠাকুর থাকিবেন মনে করিয়া আমরা একখানা খাট ও তদুপরি বিছানাদি পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। পশ্চিমের কোঠায় অর্থাৎ এখন যেখানে "শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের চিত্রপট পূজিত হয়, তথায়ই শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে পূজা শেষ হইলে সেই কোঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে আমরা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় কি যে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যখন পুষ্প ও বিল্ব পত্রাদি শ্রীচরণে অর্পণ করিতে করিতে শেষ হইয়া গেল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ হস্তে অর্পিত পুষ্পাদি তুলিয়া আমাদের কাহারও কাহারও হাতে অঞ্জলি প্রদানের জন্য দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার চেহারায়ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দের স্ফুরণ হইয়াছিল। আমি সেই দিন কি

তাহার পরদিন ঐ সময় এইরূপ কল্পনাতীত আনন্দ অনুভব করার কারণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই জন্যই ঐরূপ আনন্দের স্ফুরণ হইতেছিল।" সেইদিন এবং সেই রাত্রে স্থানীয় জমিদার প্রাণহরি দাস মহাশয় সদল বলে আশ্রমে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকলে প্রসাদ পাওয়ার পর অধিক রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া তাঁহার জন্য আমরা যে বিছানার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তথায় শয়ন করিলেন। আমি ও আর-ও ২।১ জন ঐ কামরারই মেজেতে ঘুমাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিলেন, "এই কামরায় মোহন্ত থাকিবেন।" আমি বলিলাম, "মোহন্তের থাকার ঘর পিছনে প্রস্তুত হইয়াছে, আপনিই এই কামরাতে থাকিবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অত্যন্ত দয়ার্দ্রভাবে আমাকে বলিলেন, "আমার তো কোন আশ্রমেই থাকার গুরুর আদেশ নাই। কিন্তু আমার সমস্ত শক্তিই এই আশ্রমে থাকিবে সুতরাং আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই।" এই উত্তরে সাময়িক একটু হতভম্বের মত হইলেও ঠাকুরই কৃপা করিয়া ঐভাব স্থায়ী হইতে দিলেন না। ঐ কথার উপর আর কিছু বলা নেহাৎ-ই ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলা হইতে নিবৃত্ত হইলাম, যদিও আমাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুর অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় তখন হইতে আশ্রমেই অনেক সময়ে থাকিবেন, এবং আমাদের অনেক সময়েই শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে। ঠাকুর আশ্রমে থাকিবেন না, এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, আশ্রমে আগত ভক্তগণ প্রথমে একটু বিস্মিত ও দুঃখিত হইলে-ও, তাঁহারাও অল্প সময়ের মধ্যেই পুনঃ ঠাকুরের আদেশ

মান্য করাই মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া মনে করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। দোল পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা বুড়ির ঘর পোড়াইবেন না?" তখনি বুড়ীর ঘর প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া পরমানন্দে বহ্ন্যুৎসব সম্পন্ন করা হইল।

ঐ সময়ে আশ্রমে একটি দোল প্রস্তুত করা হইয়াছিল ও তাহার উপরে চৌকিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বসান হইয়াছিল। ঐদিন, অথবা তৎপর দিন শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে আশ্রমের সংলগ্ন উপরের পাহাড়টি দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ পাহাড়টির উপর আপনি বাড়ী করিয়া বাস করিলে, ছেলেপিলে সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। ঐ স্থানে বাড়ী করিবার চেষ্টা করিবেন।"

পাহাড়টি তৎকালে "কর্ণেল সাহেবের পাহাড়" বলিয়া খ্যাত ছিল। সে সময়ে তাহাতে একটি পুরাতন দালানের ভগ্নাবশেষ ছিল। দালানটির নানাস্থানে ও চতুর্দ্দিকে বহু বিরাট গাছ থাকায় উহাতে বড় বড় সাপ ও বাঘ, শূকরাদি বন্যজন্তু থাকার আশঙ্কায় কেহ-ই ঐ পাহাড়ে তখন যাইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ স্থানে আমার বাড়ী করার আদেশ দেওয়ায়, আমি উহা সরকার হইতে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হইলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ঐ পাহাড় রেলওয়ে ল্যাণ্ড (জমি) বলিয়া দুইবার সেটেল্‌মেণ্টে রেকর্ড হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বন্ধু রেল অফিসের কর্ম্মচারীগণ আমাকে জানাইলেন যে, উহা প্রকৃতপক্ষে Railway relinquished land, অর্থাৎ যদিও রেলওয়ের জন্য প্রথমে ঐ জমি acquire করা হইয়াছিল, পরে অনাবশ্যক বিধায় Railway কোম্পানী তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। তৎপর তৎকালীন Settlement Officerএর নিকট তদ্বির করিয়া

ঐ জমি Settlement Record-এ সরকারের জমি বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা সত্ত্বেও আমার তাহা পাইতে নানা প্রকারের যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় সমস্ত বাধা উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পাহাড় অতি অল্প মূল্যেই আমি পাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই পাহাড় বন্দোবস্ত পাওয়া সম্পর্কে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ এ. মোমিন ও চট্টগ্রামের তৎকালীন খাসমহল অফিসার মৌলভী সাদরলওয়ালা আমাকে আশাতীত ভাবে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ মোমিনকে আমি যখন প্রথম এই পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার কথা বলিয়াছিলাম, তখন এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, আমার গুরুদেবের আশ্রম উহার সংলগ্ন পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমার ঐ পাহাড় বন্দোবস্ত নেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তিনি নেহাৎ আপনভাবে আশ্রমের কথা যেন দরখাস্তে উল্লেখ না করি এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে আশ্রমের কথা লিখিলে গভর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত দিতে রাজী হইবেনা। কারণ আশ্রমের উপর গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সন্দেহাত্মক নজর আছে। তিনি মিঃ সাদরল-ওয়ালাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে আমি যাহাতে ঐ পাহাড় বন্দোবস্ত লইতে পারি, সেই ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে পুরাতন কর্ণেল সাহেবের কুঠির ভিত্তি যতটা ছিল, ততটা লইয়াই দোতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছি, যদিও প্রথমতঃ একটি খুব ছোট বাড়ীই আশ্রম বাসের জন্য নির্ম্মাণ করার

আমার ইচ্ছা ছিল। এই বাড়ীতে থাকিয়া আমার পরপুরুষের ও শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবা করিবে এই কথা এবং এই মর্ম্মে আরও কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ও অন্যান্য কোন কোন ভক্তকেও জানাইয়াছিলেন। এই বাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি এই কারণেই শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের বরাবরে দেবোত্তর করা হইলেও আমি এবং আমার অবর্ত্তমানে আমার বংশধরগণ তাঁহার সেবায়েত সূত্রে এই বাড়ী ও জমির দখলকার থাকিবে বলিয়া আমার দেবোত্তর দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ দলিলের মুসাবিধা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখান হয় এবং তিনি তাহা অনুমোদন করার পর রেজিষ্ট্রী করা হয়।

আশ্রম প্রবেশ উপলক্ষে কৈবল্যধামে ছয় সাত দিন থাকিয়া ঠাকুর আশ্রম ত্যাগ করেন। আর দেহ নিয়া তিনি কখনও তথায় যান নাই। আশ্রম প্রবেশের দুই তিন বৎসর পর তাঁহারই আদিষ্ট আমার ঐ বাড়ী নির্ম্মিত হইলে আমি একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "এখন তো আশ্রমের সান্নিধ্যে আমার বাড়ী হইয়াছে তথায় গিয়া আপনি থাকিলে সকলেই যথেষ্ট আনন্দ পাইবে। ঐ বাড়ীত' আর আশ্রম নয়! সুতরাং তথায় যাইতে আপনার আপত্তি হইতে পারে না।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "উহাও আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে। সুতরাং সেখানেও আমার থাকার জো নাই। জানেন ত' কিষণলাল সম্পর্কে গুরুর আদেশ অমান্য করায় আমার এখন স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।" একটু হাসিয়া বলিলেন, "আবারও আদেশ অমান্য করিলে, কী হয়, তিনিই জানেন।" আমি মনে মনে ভাবিলাম যে গুরুর আদেশ অমান্য করায় ভালই হইয়াছে, নচেৎ আমার ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও পাপী তাপীদের উপায় কি হইত? কিন্তু

সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। এ সম্বন্ধে আর জিদ করার ধৃষ্টতা হইতেও তাঁহারই কৃপায় রক্ষা পাইলাম।

আমি কয়েকজন প্রবীণ ভক্তের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কিষণলাল নামক কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক শক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া মুক্তির জন্য এক সময়ে কালীঘাটে তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া অতি কাতরভাবে মুক্তির প্রার্থনা করায় ঠাকুর তাহার ঐকান্তিক বিশুদ্ধ ভক্তিতে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেহমুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাকে দীক্ষা দেওয়া মাত্র সে দেহত্যাগ করিয়া সত্যলোকে স্থান পাইয়াছিল। শ্রীশ্রীপরম গুরুদেব কাহাকেও এইভাবে মুক্তি দিতে ঠাকুরকে অনুমতি দেন নাই। তত্রাচ দয়াময় ঠাকুর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কিষণলালকে এইভাবে মুক্ত করায় পরম গুরুদেব একটু অসন্তুষ্ট হইয়া আদেশ দিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে আরও বহুকাল লোকালয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

পাহাড়তলী কৈবল্যধাম আশ্রমের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে অনেক সময়ই অনেক কথা বলিয়াছিলেন এবং বহু পত্রেও ঐ সকল কথা লিখিয়াছেন। এই সম্পর্কে লেখার জন্য যোগ্যতর ব্যক্তিগণের উপরে ভার রাখিয়া আমি সংক্ষেপে তাঁহার মুখে শুনা দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করিব এবং তাঁহার লিখিত দুই, একখানা পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিবৃত্ত হইব।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, 'আমাদের কৈবল্যধাম আশ্রম কি কাশীর ন্যায় বৃহৎ তীর্থ স্থান হইবে?' তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'ইহা আসমুদ্র ব্যপ্ত হইবে এবং যেখানে কুম্ভ-

মেলা হয় সেরূপ বৃহৎ স্থান হইবে।' ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেক সময় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ঐ আশ্রমে শ্রীগুরু ও বহু দেবদেবী সকল সময় উপস্থিত থাকিবেন। শ্রীজয়ন্তী মা উহার রক্ষাকারিণী রূপে আছেন। কৈবল্যধামে আসিলে সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যাইবে এবং বহু দূরদেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ধর্ম্মপিপাসুগণ ঐ স্থানে আসিয়া পরম শান্তি পাইবেন এবং ঐ আশ্রমেই সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবে না। কালে কোন মহাত্মা ইহার মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। নিম্নে এই সম্পর্কে তাঁহার লিখিত কয়েকখানা পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১। "* * * * ঐ আশ্রমে আমার প্রাণ, প্রাণেরই ঈশ্বর শ্রীসম্পদ ভগবানের স্বরূপ শক্তি শ্রীগুরুদেবের পরমানন্দ সাধ্য আত্মশক্তি তাহান স্বজন, স্বগণ সহকারে ঐ কৈবল্যধামে কৈবল্য নিত্য বিস্তার করিয়া ভগবৎ বিভূতি স্থান সমূহ তীর্থাদি সমস্ত ত্রিলোকের গোলকাদি বৈকুণ্ঠ কৈলাসের আদর্শ শক্তি নিয়া, গয়া প্রভৃতি পুরুষোত্তমীয় শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি যাবতীয় অধিষ্ঠানীয় সমস্ত বিশুদ্ধ শক্তি নিয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন। কৈবল্য শক্তিতে সিংহবাহিনী প্রভৃতি মহাদেবীর যত রকম বিভূতি আছে, সাবিত্রি প্রভৃতি সমস্ত শক্তি বিস্তাররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ স্থান চ্যুত হইয়া একপদ-ও কোথা-ও যায় না। গয়া প্রভৃতি বিষ্ণু পদাদিতে পিণ্ডদানে, গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত তীর্থে স্নানোৎসবাদিতে যে সকল ফলশ্রুতি আছে, তাহার সমস্ত ফল ওখানে বাস, অবগাহন, পিণ্ডাদি দানে কি শুশ্রূষাদি দ্বারা পূর্ণরূপে ফলবতী হইবে। ইহা শ্রীমুখে আপন হইতে প্রকাশ করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাকে কোন আশ্রমেই থাকার অধিকার দেন নাই।

যেমনভাবে চলিতেছি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এমনই ভাবে এই দেহ ছাড়িয়া প্রারব্ধ দণ্ড মুক্তি করিতে হইবে। এই সংবাদ শ্রীমান শুভবাবুর নিকট লিখিয়াছিলাম। তাঁর ঐ আশ্রমে প্রাণ রহিয়াছে জানিবেন। * * * আপনারা এই বাক্য বিশ্বাস করিয়া অনন্যমনে ভ্রম শূন্য হইয়া ঐ কৈবল্য সম্ভারের অধিকারের নিত্য শুশ্রূষা করিয়া ধন্য হউন। এই প্রার্থনা। আমি আপনাদের নিকট সর্ব্বদাই থাকি, যেই রকম আসা যাওয়া করিতেছিলাম সেই রকম করিব। এই দেহটি কৈবল্যনাথের নিকট নিয়া কৈবল্য আশ্রমকে কলুষিত করিব না। ইহাই গুরুদেবের ইচ্ছা। * * * ঐ আশ্রমে আমার প্রাণ রহিয়াছে জানিবেন। যাহাতে ঐ আশ্রমের নিয়মিত সেবা ও যাহানরা ওখানে উপস্থিত থাকিবেন তাহানদের যেন কোনরূপ অভাব না হয় ইহাই আপনাদের উপর ভার দিয়া আপনাদের এই কৃপাপ্রার্থী হইয়াছি। কালে কোন মহাজন দ্বারা ঐ আশ্রম মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়া এই ত্রিলোক ধ্বনিত হইয়া যাইবে।"

২। "কৈবল্যধামের চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান সমস্ত কৈবল্যধামের অধীনে আসিবে। যত খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর সাধক এখানে আসিয়া সাধনা করিবে। কুম্ভ মেলায় যেমন সাধু সন্ন্যাসীদের সম্মেলন হয় তদপেক্ষা বৃহৎ সম্মেলন এই স্থানে হইবে। ইহা পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকের তীর্থস্থান হইবে। দেবতারা সর্ব্বদা কৈবল্যধামে যাতায়াত করেন, জগন্নাথ ও অধিকাংশ সময় এই ধামেই থাকেন। অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া কৈবল্যধামে শয়ন করিয়া আছেন। মন্দির ঠিক তাঁর জঙ্ঘার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মীদেবী বসিয়া সতত কৈবল্যনাথের

পাদসেবা করিতেছেন। মহাশক্তি কালী এক পদ কামশ্রীকুণ্ডে অপর পদ কৈবল্যকুণ্ডে স্থাপন করিয়া সতত তথায় দণ্ডায়মানা আছেন। জয়ন্তী মা এখানে সতত অবস্থান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান আছেন। কৈবল্যধামের বৃক্ষ, লতা, পত্র প্রত্যেকটী পবিত্র ও অশরীরিদিগের আশ্রয় স্থল। এই ধামে দেব, দেবী, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, গন্ধর্বাদি সর্ব্বদা বিহার করেন। তদ্গত চিত্ত যাঁরা দেহরক্ষা করিয়াছেন তাঁরাও সকলে আসিয়া এই ধামে মিলিত হইয়াছেন। একটু নিগম হইলেই এই সব দেখা যায়, বুঝা যায়। কৈবল্যধাম সকল তীর্থের বীজ স্বরূপ। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পূর্ণ দৃষ্টি ইহার উপর রহিয়াছে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় এই ধামেই হইবে এবং এই ধাম হইতে প্রচারিত স্বভাব ধর্ম্মই বিশ্বের লোকের ধর্ম্ম হইবে। কালে কোন মহাপুরুষ আসিয়া এই ধামের মাহাত্ম্য ত্রিলোকে প্রচার করিবেন * * *।”

১৩৩৮ সনের শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট পত্র দিয়া আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমরা আশ্রমে দুর্গা পূজা করিব কি না এবং যদি আমাদের ঐ পূজা করা তিনি সঙ্গত বোধ করেন, তাহা হইলে কী মূর্ত্তিতে পূজা করিব! সে সময়ে আমি তাঁহাকে আশ্রমে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি সিমলা হইতে আমাকে অবর্ণনীয় স্নেহমাখা ও আশীর্ব্বাদযুক্ত যে সকল পত্র দিয়াছিলেন তাহার উপরের পোষ্টেল সিল্ (Postal seal) এর তারিখ দিয়া নিম্নে কয়েকাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

৪-১০-৩১ ইং'—৺মায়ের পূজায়···যে ভাবে সম্পাদন কারতে ইচ্ছা

করিবেন সেইভাবেই হইবে প্রতিমা কিম্বা ঘটে কি পটে।…৺পূজার পরে আপনার সঙ্গে দেখা করিব।…'

৭-১০-৩১ ইং—'আপনার পত্র গতকল্য পাইয়া তাহার উত্তর… (দিয়াছি)। …কৈবল্যনাথের মঙ্গলাচরণাদি সম্পাদনে ৺দেবীর অর্চ্চনার জন্য…যে মত করিবেন তাহাই হইবে। অন্য সংশয় না করি। যে রকম ভাবে সুবিধা বোধ করেন, সেই রকমই করিবেন। কৈবল্যনাথ বলিতে গেলে কৈবল্য শক্তিও বলিতে হইবে। ইহাতে যে কোন দেবতারই অর্চ্চনা হউক না। সেই সেই দেবতার ঐ কৈবল্যনাথেরই হইবে। যে চিত্রপট আছে সেখানে মঙ্গল ঘট বসাইয়া তাহারই নিকট যাহার যে বিধান বিধি আছে সেই বিধি দৃষ্টেই পূজা হইবে। ইহার মধ্যে শংশয় কি হইতে পারে। ঐ চিত্রপটেও দেব-দেবীর অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক কারলেও হইতে পারে। বিধি বিধানে আছে ঘট পট হইতে পারে। মহাদেবীর ধ্যানাদি সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত যে পূজা বিধান আছে তাহা ঐ পটেও হয়। ঐ পটে যদি জীবের প্রাণি সত্তার রূপ বলিয়া সংস্কার থাকে তাহা হইলে কৈবল্য অর্চ্চনইত হইবে না। ঐ পটকেও কৈবল্যেরই প্রকাশ জানিয়া উহার সমস্ত বিভুতি আর জগতে শ্রীধা (?) বিকাশের দেবদেবী জানিবেন।…. আমাকে শ্রীগুরু স্বয়ং কোনরূপ আশ্রমে বাস প্রবেশ নিষেধ করায় ঢাকুরীয়ার এবং চিতোরে পাহাড়তলীর যাওয়া নিষেধ হওয়াতে জাইব না। তবে আপনারা আমার অনুমতি পাইয়াছেন যখন তখন কৈবল্যশক্তির অর্চ্চনায় দ্বিধা করেন কেন? আমাতে আর কৈবল্য প্রতিবিম্ব যাহা আছে অভিন্ন জানিয়া তাহার সেবা করেন এই প্রার্থনা।'

৯-১০-৩১ ইং—'….আশ্রমে কৈবল্যনাথ সাশক্তি (?) স্বজন

নিয়া প্রতিষ্ঠ হইয়াছে সেখানে গুরুদেবের অধিকার রহিয়াছে তার সঙ্গে আমার আত্মা পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া আছে আমার এই কলুষা যুক্ত শরীর নিয়া সেখানে প্রবেশের অধিকার করা গুরুর ইচ্ছা নাই। তিনি স্বয়ং নিষেধ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আমি কি করিয়া যাই। সহজেই বুঝিতে পারেন। আপনারা সকলে মনের ভ্রম দূর করিয়া বিচার করিয়া যাহাতে আশ্রমটী প্রতিষ্ঠা প্রচলন সমভাবে চলিয়া চিরকাল যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সকলে মনোযোগী হইলে আমার প্রাণের বড়ই শান্তি উৎপন্ন হইবে॥ আমার দেহ আর কতকাল থাকিবে এই জর পদার্থের কিই বা শক্তি দিবে। যাতে আপনারা সমবেত হইয়া ৺মায়ের পূজার সহিত চণ্ডি পাঠাদি কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে তাহা আপনারাই করিতেছেন এবং করিবেন। আমার ঐ আশ্রমে প্রবেশের আর অধিকার নাই,. ইহাই আমার প্রারব্ধ গুরুর আদেশ অমান্য করিবার আমার আর শক্তি নাই। যখন গুরু নিশেধ করিয়াছেন তখন কি করিয়া সেখানে যাই ইহাতে আপনারাও বিধি দিতে পারেন না। যাই হউক ৺ এখানে পূজা পর্য্যন্ত থাকিতেই হইতেছে কার্ত্তিক মাসের শেষতক আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হইবে, তখন সাক্ষাতে আমার অবস্থা জানাইব। তখন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন আশ্রমে কি ভাব আছে॥ ঐ আশ্রম বলিয়াই যে নিষেধ তাহা নহে। ঢাকুরীয়াও যাওয়া বন্ধ চিতোরের যে আশ্রমে যাওয়ার কথা ছিল সেখানেও না। আশ্রম তৈয়ারের প্রস্তাব হইলে পূর্ব্বেই তে (?) গুরু বলিয়াছিলেন ক'দিনের জন্য আশ্রম করিবে। সেই আভাশ বোধ হয় এই ভাবই ফলিয়াছে আপনারা মনে কিছু না করিয়া উৎসব যথাসাধ্য করুন।'

১৭-১০-৩১ ইং '... ... কোন চিন্তা করিবেন না। ৺ মায়ের

অর্চ্চনা বিশুদ্ধ ভক্তি শ্রদ্ধায় সাত্ত্বিক ভাবে করিয়া আনন্দ পাওয়া যায় মা আপনাদের অর্চ্চনায় তৃপ্তি লাভ করুন এই প্রার্থনা।.....বিশেষত আমি তো কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি আপনার সঙ্গে দেখা করিব। বাসাই থাকিবেন ॥...'

যতদূর স্মরণ হয় পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ভক্ত জানাইয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন• যে মায়ের পূজা চিত্রপটে, মৃন্ময়ী বা প্রস্তরময়ী যে কোন মূর্ত্তিতে সম্পন্ন হইতে পারে অর্থাৎ আমরা যে কোন মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করিতে পারি।

আমাদের দেশে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই পূজা হয় বলিয়া আমরা ঐরূপ মূর্ত্তি করাইয়া ঢাক-ঢোল সহকারে বেশ একটু আড়ম্বরের সহিত ই ঐপূজা করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন পশু বলির ব্যবস্থা তাহাতে করা হয় নাই। ঐ প্রতিমা আশ্রমের নাটমন্দিরের পূর্ব্বধারে বসান হইয়াছিল। পূজার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইয়া ঐ অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ জানাইলে তিনি খুব খুসী হইয়াছিলেন বলিয়াও মনে হইয়াছিল।

ঐ সনেরই বড়দিনের বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদপুরে খুব পীড়িত অবস্থায় আছেন, সংবাদ পাইয়া চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী হইতে আমরা কয়েক জন একই সময়ে শেষরাত্রে তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তাহাতে তিনি বেশ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে তাঁহাকে বেশ সুস্থ বলিয়াই মনে হইল এবং ঐ বাসার মালিক সহৃদয় বন্ধু শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার এক উৎসবের আয়োজনে উদ্যোগী হইলেন।

সেইদিন প্রাতঃকালেই 'পাগলী মা' নামে খ্যাত এক অতি উজ্জ্বল

মূর্ত্তি, তেজস্বিনী, সন্ন্যাসিনী, ঠাকুর যে স্কুল ঘরে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাহারই নিকটে রাস্তায় আসিয়া রোহিণীবাবুর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ এ বাসায় উৎসব হইবে ? পায়েস প্রসাদের ব্যবস্থা করা হইবে কি ?' ছেলে উত্তরে 'না' বলিলে, তিনি বলিলেন, 'তামাসা পেয়েছ ? ঠাকুর এ বাড়ীতে আছেন, আর পায়স ভোগ হবে না ! আচ্ছা, তোদের যা আছে নিয়ে আয়।' ছেলে এই কথা আসিয়া জানাইলে ঠাকুর বলিলেন, 'পায়েস ভোগের ব্যবস্থা কর।' তদনুযায়ী পায়েস ভোগের ব্যবস্থা হইল। তখন ডাল ভাত যাহা রান্না হইয়াছিল তাহা তাঁহাকে দেওয়ায় তিনি একই গ্রাস হইতে নিজেও কিছু গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গের কয়েকটি কুকুরকেও নিজ হাতে খাওয়াইলেন। 'পাগলী মা' অতঃপর তাঁহার সঙ্গের কুকুরগুলিসহ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পূজার ভোগ দেওয়ার পর তল্লাস করিয়া তাঁহাকে পাওয়া গেল না। ঠাকুর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তিনি প্রসাদ গ্রহণ না করিলে, সমস্ত উৎসব-ই পণ্ড হইয়া যাইবে।' তখন ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন। ঐ স্কুল ঘরের কিছু দূরে রেল রাস্তার উপর তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাহিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা যান।' আমি আস্তে আস্তে পাগলী মায়ের দিকে অগ্রসর হইলে, তিনি একটু দূরে দৌড়িয়া গিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করিতে দিবেন না মনস্থ করিয়াই ঐরূপ করিলেন মনে করিয়া আমি কিছুক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া একটু দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,

'ওরা কেমন ভক্ত রে! আমাকেও মারলে, আমার কুকুরগুলোকেও মারলে!' এই বলিয়া তিনি আরও দূরে সরিয়া পড়িলেন এবং আমি একটু হতভম্বভাবে স্কুল কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, 'ওরা কে যায় রে, আমার সমস্ত নিয়ে যায়!' আমি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি একটু হাসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ঢাকার ফটোগ্রাফার শ্রীমনোমোহন পাইন ভোগের জিনিষ তাঁহার মাথার উপরে থালায় করিয়া চাঁদপুরের নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষ পর্য্যন্ত 'পাগলী মা'র দর্শন পান। তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করায় 'পাগলী মা' প্রথমে বিশেষ আপত্তি করিলেও পরে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গের কুকুরগুলিকেও নিজ হাতে খাওয়াইলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

'পাগলী মা'র বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তিনি গৌরবর্ণ সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী ছিলেন। চাঁদপুরে যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি সকল সময়েই বেশ পরিষ্কার, সাদা লাল পাড়ের ধুতি পরিধান করিতেন এবং ট্রেণেও প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণী ছাড়া চলাফিরা করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় ও আকারে ঈঙ্গিতে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে-ও অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন বলিয়া মনে হওয়ায় সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আবার তাঁহার দেখা পাওয়ার ইচ্ছা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নদীর পাড়ে গেলাম। তথায় একটি দোকানে তাঁহাকে কয়েকটি লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন দেখিতে পাইয়া ঐ স্থানে দাঁড়াইলাম। একটু পরেই মৃদু হাসিয়া এবং চোখ বড় করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "আবার ডাগর ডাগর চোখ

দিয়ে দেখছে !” এই কথায় একটু থতমত খাইয়া আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। আমার স্নেহাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায়, যে ঐদিন ‘পাগলী মা’কে চাঁদপুরে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট শুনিয়াছি যে কয়েকদিন পরে চট্টগ্রামের রাস্তায় সে ‘পাগলী’মাকে দেখিয়া তাহার বাসায় নিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহার দেখা পায় নাই। চাঁদপুরের ভক্তগণও আর কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

ঐ বন্ধেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুযায়ী আমরা চাঁদপুরের নদীর অপর পাড়ে চরে নানা স্থানের গুরুভ্রাতা মিলিত হইয়া বনভোজন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব

ঐবার আমরা চাঁদপুর থাকাকালে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকে যাওয়ার কথা উঠিলে তিনি মাঘীশুক্লা দশমী তিথিতে সমবেত ভাবে সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া জন্মোৎসব করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ঐ সময়ে উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীর নিকটস্থ লালমোহন সাহা, চণ্ডীচরণ পাল আদি কয়েকজনের সাহায্য লইয়া ঐ কাজ সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আদি স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া আমরা চাঁদপুর হইতে লঞ্চে ডিঙ্গামানিক গ্রামে যাওয়ার সময় ঠাকুরবাড়ীর প্রায় ১ মাইল দূর হইতে নদীর পাড়ে পাড়ে লঞ্চের সঙ্গে বহুলোক

দৌড়াইয়া সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে ঐ লঞ্চে আসিতেছেন। লঞ্চ কার্ত্তিকপুর ষ্টেশনে থামিলে স্থানীয় লোকেরা ঠাকুর আসেন নাই জানিয়া মনে মনে একটু দুঃখিত হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা যে বর্ণনাতীত প্রীতি ও সৌজন্যের সহিত আনন্দোৎফুল্ল ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত ভাবে ঐ বৎসরের জন্মোৎসবে যোগদানকারী ভক্তমাত্রই এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ঐ মহোৎসবে প্রসাদ পাইয়াছিল। যাহারা কখনও কীর্ত্তনে নৃত্য করে নাই, আমাদের ন্যায় সেইরূপ বহুলোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল। এই সম্পর্কে আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত ও গুরুভাই ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সেইরূপ আনন্দ জীবনে কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঠাকুর বাড়ীর লোকের সহৃদয়তা, লৌকিকতা ও স্নেহ আমাদিগকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই উৎসব আনন্দের কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ অবর্ণনীয় নৃত্য, কীর্ত্তনাদির কথা আমি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, স্বয়ং মহাদেব ঐ কীর্ত্তন আনন্দের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং মা অন্নপূর্ণা ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৩৩৯ সনেও ডিঙ্গামাণিকে সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে আমরা সপরিবারে বন্ধু শৈলেনের

দিয়ে দেখছে!" এই কথায় একটু থতমত খাইয়া আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। আমার স্নেহাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায়, যে ঐদিন 'পাগলী মা'কে চাঁদপুরে দেখিয়াছিল, তাহার নিকট শুনিয়াছি যে কয়েকদিন পরে চট্টগ্রামের রাস্তায় সে 'পাগলী'মাকে দেখিয়া তাহার বাসায় নিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আর তাঁহার দেখা পায় নাই। চাঁদপুরের ভক্তগণও আর কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

ঐ বন্ধেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুযায়ী আমরা চাঁদপুরের নদীর অপর পাড়ে চরে নানা স্থানের গুরুভ্রাতা মিলিত হইয়া বনভোজন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব

ঐবার আমরা চাঁদপুর থাকাকালে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকে যাওয়ার কথা উঠিলে তিনি মাঘীশুক্লা দশমী তিথিতে সমবেত ভাবে সকল স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া জন্মোৎসব করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ঐ সময়ে উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে তাঁহাদের বাড়ীর নিকটস্থ লালমোহন সাহা, চণ্ডীচরণ পাল আদি কয়েকজনের সাহায্য লইয়া ঐ কাজ সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আদি স্থানের ভক্তগণ মিলিয়া আমরা চাঁদপুর হইতে লঞ্চে ডিঙ্গামানিক গ্রামে যাওয়ার সময় ঠাকুরবাড়ীর প্রায় ১ মাইল দূর হইতে নদীর পাড়ে পাড়ে লঞ্চের সঙ্গে বহুলোক

দৌড়াইয়া সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে ঐ লঞ্চে আসিতেছেন। লঞ্চ কার্ত্তিকপুর ষ্টেশনে থামিলে স্থানীয় লোকেরা ঠাকুর আসেন নাই জানিয়া মনে মনে একটু দুঃখিত হইলেও আমাদিগকে তাঁহারা যে বর্ণনাতীত প্রীতি ও সৌজন্যের সহিত আনন্দোৎফুল্ল ভাবে অভ্যর্থনা করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে নিয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না।

সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত ভাবে ঐ বৎসরের জন্মোৎসবে যোগদানকারী ভক্তমাত্রই এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক ঐ মহোৎসবে প্রসাদ পাইয়াছিল। যাহারা কখনও কীর্ত্তনে নৃত্য করে নাই, আমাদের ন্যায় সেইরূপ বহুলোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল। এই সম্পর্কে আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত ও গুরুভাই ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সেইরূপ আনন্দ জীবনে কখনও অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ঠাকুর বাড়ীর লোকের সহৃদয়তা, লৌকিকতা ও স্নেহ আমাদিগকে একেবারেই মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই উৎসব আনন্দের কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ অবর্ণনীয় নৃত্য, কীর্ত্তনাদির কথা আমি জানাইলে তিনি বলিলেন যে, স্বয়ং মহাদেব ঐ কীর্ত্তন আনন্দের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং মা অন্নপূর্ণা ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৩৩৯ সনেও ডিঙ্গামাণিকে সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবে আমরা সপরিবারে বন্ধু শৈলেনের

কীর্ত্তনের দল সহ নদীর পাড় হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ বৎসরও কীর্ত্তনাদিতে ও ঠাকুরবাড়ীর স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই অনন্য সাধারণ সৌজন্যে আমরা প্রভূত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কিন্তু যে কারণেই হউক, মহোৎসবে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা লোক সংখ্যা অনেক কম দেখা গিয়াছিল।

১৩৪০ সনের বড় দিনের বন্ধের পূর্ব্বেই আমরা ঠিক করিয়াছিলাম যে সেই বৎসরও সমবেতভাবে জন্মোৎসব ডিঙ্গামানিকে হইবে বলিয়া ময়নামতী সার্ভে স্কুলের তৎকালীন প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এর নামে পত্র ছাপান হইয়া যথাসম্ভব সকল স্থানের ভক্তগণের নিকট প্রেরণ করা হইবে। বড় দিনের বন্ধে আমি ও পূর্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী তরলা দেবী কাশীতে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ একটি বাড়ীতে বাস করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তেতলার একটি কামরায় থাকিতেন এবং আমরা দোতলায় থাকিতাম। একদিন প্রাতে পূর্ণবাবু তেতলা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, 'শুভদা খুব একটা ভাল খবর! শ্রীশ্রীঠাকুর এইমাত্র বলিলেন যে, এবার ভক্তদের সমবেত ভাবে জন্মোৎসব হয় নোয়াখালী, না হয় ফেণীতে হইবে—ডিঙ্গামাণিকে এই বৎসর সমবেত ভাবে জন্মোৎসব হইবে না।' আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম 'এই উৎসব জন্মস্থানে না হইয়া অন্যস্থানে হইবে কেন, বুঝিলাম না'। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আপনি এখনি যাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।' তখন তিনি ও আমি এক সঙ্গে তেতলায় ঠাকুরের নিকট গেলাম এবং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবার

নাকি জন্মস্থানে জন্মোৎসব হইবে না বালয়া বলিয়াছেন?' ঠাকুর তদুত্তরে, 'হাঁ, এবার ঐ জন্মোৎসব হয় নোয়াখালী —' বলিয়া বোধ হয় একটু থামিলেন অথবা 'হয় নোয়াখালী' বলিতেই পাছে তিনি 'নয় ফেণীতে' বলিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম 'যদি নোয়াখালী হইতে হয় তবে নোয়াখালীই হইবে। কিন্তু জন্মস্থানে জন্মোৎসব না হইলে মহেন্দ্র দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আদি ত' অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন!'. ঠাকুর বলিলেন, 'তাহারা দুঃখিত হইবে কেন? তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর নিজেরা যে ভাবে করিত সেই ভাবেই জন্মোৎসব করিবে। কিন্তু সকল স্থানের ভক্তগণের জন্মোৎসব এবার নোয়াখালীতেই হইবে।' আমি তত্রাচ একটু ক্ষীণ স্বরে 'জন্মোৎসব জন্মস্থানে হইবে না,' বলিয়া একটু বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেই তিনি বলিলেন 'যেখানে ভেদাভেদ থাকে সেখানে মহোৎসব হইতে পারে না। আমি বলিলাম, 'আমি ত' সেখানে কোন ভেদাভেদ দেখি নাই!' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'না, ভেদাভেদ ছিল। দেখিয়াছেন ত' প্রথম বৎসর লোকে যেখানে সেখানে বসিয়া পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ কারয়াছে, কিন্তু গত বৎসর ত' সেইরূপ হয় নাই।' যত দূর মনে পড়ে আমি রাজেনদার নামে পত্র ছাপাইবার ব্যাবস্থা হইয়াছিল বলিতেই ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, 'আমি রাজেনদা, টাজেনদা বুঝি না।' এই কথায় আমি আর ঐ সম্বন্ধে কোন দ্বিরুক্তি করিতে সাহস পাইলাম না। বলিলাম, 'তাহা হইলে আপনি ঢাকায় (বর্ত্তমানে পরলোকগত) সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, ফেনীতে প্রমথ দাদাকে, চট্টগ্রামের বিধুবাবু ও যোগেশ বাবুকে ঐ মর্ম্মে পত্র দিয়া জানাইবেন।' তিনি প্রত্যেক

নাম উচ্চারণ করিতেই, পত্র দিবেন বলিয়া আমাকে জানাইলেন। আমার বার বারই মনে হইতেছিল যে, এই ব্যাপারে মহেন্দ্র দাদা আদি ঠাকুর বাড়ীর সমস্ত লোক আমাকে কী মনে করিবেন। তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে পূজায় ও বড়দিনের বন্ধে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেই থাকি। এমতাবস্থায় তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে হয়ত তাঁহাদের অত আদর আপ্যায়ণ সত্ত্বেও আমার দ্বারাই এই বিরাট জন্মোৎসব নোয়াখালীতে স্থানান্তরিত হইল! যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার উপর তৎপূর্ব্বে কোন দিনই কোন কথা বলি নাই, তৎসত্ত্বেও যতটুকু বলিয়াছি, তদধিক বলা সম্ভব নহে বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলাম। তাহার দুই একদিন পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পনাতীত সৌজন্যের একটা উদাহরণ উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও রেল ষ্টেশন ঐ বাড়ী হইতে বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং আমাকে ট্রেনে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও দুই একজন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথাপি আমি ঐ বাড়ী হইতে রওনা হওয়ার সময় ঠাকুর বলিলেন, তিনি ষ্টেশনে যাইয়া আমাকে রেলগাড়ীতে উঠাইয়া দিবেন। আমরা সকলে যথাসাধ্য বিনীত ভাবে নিষেধ করায় তিনি ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইলেন।

আমি পূজার বন্ধের ও বড়দিনের বন্ধের শেষে নোয়াখালী ফিরিবার সময় চাঁদপুরের ও লাকসাম ষ্টেশনের রেল কর্ম্মচারী গুরুভ্রাতাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের সংবাদ জানিবার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতেন। এবারও তাঁহারা দেখা করিলে, তাঁহাদিগকে জন্মোৎসবের

বিষয়ও জানাইয়া দিলাম। তাহাতে লাকসামের তৎকালীন এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীধীরেন দাশগুপ্ত একটু বিস্মিত হইয়া বাললেন, 'আপনারাই ঠিক করিয়া গেলেন যে এবারও ডিঙ্গামাণিকেই ঐ জন্মোৎসব হইবে এবং ইতিমধ্যে হয়ত রাজেনদার নামে পত্র ছাপানও হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াইবে!' আমি সংক্ষেপে ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলোচনার কথা জানাইয়া বলিলাম, 'এই অবস্থায় আর উপায়ান্তর নাই।' আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে যে সন্দেহ পোষণ করিতেছিলাম যে ঐবার নোয়াখালীতে জন্মোৎসব হইলে হয়ত কেহ কেহ মনে করিবেন যে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে বোধহয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে, সেই সন্দেহই স্নেহাস্পদ ভাই শ্রীমান ধীরেনের কথায় দৃঢ়তর হইল।

নোয়াখালীতে পৌঁছিয়া তৎকালীন অরুণ চন্দ্র হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার পরলোকগত বন্ধুবর সুরেন সেন, শ্রীমান লোকেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করায় তাঁহারাও নানা কথা ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এইভাবে পত্র দিলাম যে, তিনি যেন দয়া করিয়া ঐ বৎসর ডিঙ্গামাণিক জন্মোৎসব করার অনুমতি দেন। পরের বৎসর হহতে জন্মোৎসব নোয়াখালীতে করা যাইবে। ঐ পত্রের উত্তর পাওয়ার দিন অতীত হইলেও কোন উত্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে না পাওয়ায় আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কারণ তাঁহার কথার উপর বারবার অন্যরূপ জেদ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। আমার গুরুতর অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহা মার্জ্জনা করার জন্য প্রার্থনা করিয়া

তাঁহাকে পত্র দিলে, তদুত্তরে তিনি অবিলম্বে জানাইলেন যে তিনি আমার পূর্ব্ব পত্র পান নাই এবং আমার উপর তাঁহার পক্ষে রাগ করা অসম্ভব। আনন্দের সহিত জন্মোৎসবের কাজে ব্রতী হইতে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন। এ স্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আমার পূর্ব্ব পত্রখানা শ্রীমান লোকেশ আমার দাদা, সুরেনবাবু ও আমার সাক্ষাতে নোয়াখালীর পোষ্ট অফিসের ডাক বাক্সে ফেলিয়াছিল। তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর না পাওয়ার কারণ আমাদের সম্পূর্ণ অবোধ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই ঢাকা হইতে সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, কুমিল্লার ময়নামতী হইতে শ্রীরাজেন্দ্র ব্যানার্জ্জীর, ফেণী হইতে প্রমথ দাদার এবং চট্টগ্রাম হইতে বিধুবাবুর অথবা যোগেশবাবুর পত্র পাইলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুর ঐবার নোয়াখালীতে জন্মোৎসব হওয়ারই আদেশ দিয়া তাঁহাদের নিকট পত্র দিয়াছেন। ঐ সকল পত্র পাইয়াই আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম এবং তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র পাইয়া পরমানন্দে জন্মোৎসবের কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

প্রথমতঃ এই কার্য্য নোয়াখালীর ন্যায় ছোট শহরে হওয়া সম্পর্কে নানাপ্রকার আশঙ্কাই বোধ করিতেছিলাম। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই প্রকার অপ্রত্যাশিত আদেশে মন যেমন উৎফুল্ল হইয়াছিল, তেমনই অতি গুরুতর দায়িত্বের চিন্তায় একটু বিব্রতও হইয়াছিলাম। যাহা হউক, নোয়াখালী শহরে আমার পরিচিত ভক্ত বন্ধুদের এই বিষয় জানাইলে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই খুব আনন্দ অনুভব করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতার আশ্বাসে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

উৎসবের কীর্ত্তনে আমাদের প্রধান সহায় গুরুভ্রাতা শৈলেন

চক্রবর্ত্তীকে এই সম্পর্কে পত্র দিলে তিনি উত্তর দিলেন যে তাঁহারা যোগদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চট্টগ্রাম আর্ম্মারি রেইড এর পর হইতে চট্টগ্রামের, বিশেষতঃ পটিয়া থানার যুবকদের অন্যত্র যাওয়া আসা সম্পর্কে পুলিশের নানা প্রকারের বিধি নিষেধ আছে বলিয়া তাঁহাদের উপস্থিতির কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের নোয়াখালী শহরের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সীতানাথ বৈষ্ণবের নেতৃত্বে একটি ভাল কীর্ত্তনের দল তখন ছিল। তাঁহাদের নায়কগণ আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিয়া দুই বৎসর পূজা উৎসবে পাহাড়তলী কৈবল্যধাম আশ্রমে পরমানন্দে কীর্ত্তনাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। এমতাবস্থায় অহোরাত্র কীর্ত্তনের ও নগর সঙ্কীর্ত্তন আদির ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত হইলে তাঁহারা সানন্দে ঐ ভার গ্রহণ করিলেন। আমরাও তাহাতে ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। তাঁহারা আমাকে জানাইলেন যে, অধিকারীদের দ্বারা মহোৎসবের ভোগ রান্না হইলে প্রসাদ গ্রহণে কাহারও আপত্তি হইবে না এবং তাঁহারা অধিকারীদের আনাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারেন।

জন্মোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক উৎসবে আমি নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া তথায় দেখি যে, উৎসবের অধিবাসের দিন তাঁহারা তাঁহাদের গুরু ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাদের ও নানা দেব দেবীর চিত্রপট বসাইয়া বেদীর সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহাতে আমার মনে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে যদি তাঁহারা ঐ প্রকার বেদী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট তাহার কোন স্থানে বসান হইবে? তাহা ছাড়া, আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাও জানিলাম

যে, অধিকারীরা আমাদের মহোৎসবে ভোগ রান্না করিলেও প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা অন্যত্র যাইয়া রান্না করিয়া আহার করিবেন।

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে আমি আমার বৈষ্ণব বন্ধুগণের সঙ্গে সরলভাবে আলোচনা কারয়া বলিলাম যে, জন্মোৎসবের আধিবাসের দিন বেদীতে কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট থাকিলেই ভাল হয়। কারণ তাঁহার চিত্রপট যদি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানে না বসান যায় তাহা হইলে, নানাস্থান হইতে আগত তাঁহার ভক্তগণ প্রাণে ব্যথা পাইবেন। অপর দিকে দেবদেবী এবং অন্যান্য মহাত্মাদের অপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানে তাঁহার চিত্রপট বসাইলে, অপরাপর অনেক লোকই একজন জীবিত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেবদেবী অপেক্ষা বিশিষ্টতর স্থানে দেখিলে নিশ্চয়ই মনঃক্ষুন্ন হইবেন। সুতরাং তাঁহার জন্মোৎসবে কেবল তাঁহার মূর্ত্তি বসাইলেই আর কোন প্রকারের কোন কথা কারো মনে হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা যেইরূপ বেদী প্রস্তুত করিয়া অধিবাস কীর্ত্তন করিতে অভ্যস্ত ঐরূপ বেদী না করিয়া কীর্ত্তন করিতে পারিব কিনা, তাহা বিশেষ চিন্তা করিয়া আপনাকে জানাইব। অধিকারীদের ভোগ রান্না সম্বন্ধে আমি স্পষ্টই বলিলাম যে তাঁহাদের রান্নার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি হইতে সকল স্থানের ভক্তগণের এই জন্মোৎসব উঠাইবার কারণ ঠাকুর আমাকে বলিয়াছেন, 'যেখানে ভেদাভেদ থাকে সেখানে মহোৎসব হইতে পারে না।' সুতরাং আমি তাঁহাদের নিয়ম জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের দ্বারা এই মহোৎসবে রান্নার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না। এই

কথার উপর অধিকারীদের রান্না না হওয়ার বিষয়ে বৈষ্ণব বন্ধুগণ আর আপত্তি উত্থাপন করিলেন না।

এদিকে জন্মোৎসবের তারিখ অতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে অথচ তাঁহারা কীর্ত্তন করিবেন কিনা তাহা জানিতে না পারায় এবং গুরু ভ্রাতা শৈলেনের দল-ও আসিতে পারিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা না থাকায়, বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

জন্মোৎসবের অধিবাস দিন বিকাল বেলা বৈষ্ণব বন্ধুদের মধ্যে দুই, তিন জন আসিয়া বিশেষ নম্রভাবে তাঁহাদের কীর্ত্তন করার অসমর্থতা জানাইলেন। আমি নানাভাবে তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁহারা বলিলেন, 'আমাদের চিরাভ্যস্ত নিয়মানুযায়ী বেদী প্রস্তুত না হইলে কীর্ত্তনে কিছুতেই আমাদের আনন্দের স্ফুরণ হইবে না।' এমন সময় নোয়াখালী রেলওয়ে ষ্টেশনের একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কীর্ত্তন কোন্ কোন্ সময়ে হইবে আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি হতাশভাবে বলিলাম যে কীর্ত্তন হয়ত হইবেই না।

প্রায় সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা উকিল শ্রীজানকীনাথ মজুমদার কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে আমি বৈষ্ণব বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম এবং তাঁহারাও অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

উক্ত জানকীবাবু তৎকালে অতি সামান্যই কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। এমতাবস্থায় তিনি এবং ঐ প্রকারের তাঁহার সঙ্গীগণই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের একমাত্র সম্বল হইবেন ভাবিয়া আমি নিজেকে অত্যন্ত বিপন্নই মনে করিলাম। কারণ আমাদের মধ্যে (বর্ত্তমানে স্বর্গীয়) পূর্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় ও শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ যাঁহারা একটু ভাল কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাঁহারা-ও নানা কারণে

ঐ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক কোন প্রকারে অধিবাস কীর্ত্তন শেষ হওয়ার পর আমি যখন অত্যন্ত বিষণ্ণ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম, আমার মাথা উঠাইবার পূর্ব্বেই আমাদের কীর্ত্তনের প্রধান সম্বল শৈলেন উচ্চৈঃস্বরে "জয় গুরু" বলিয়া আমার পিছনে দাঁড়াইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় একটি ঘোড়ার গাড়ীতে ও শ্রীমান অরবিন্দ তাহার মাতাসহ অপর একটি গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যে আমার মনে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা একেবারেই অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে আমার চোখ দিয়া অজানিতে যথেষ্ট অশ্রু বর্ষণ হইয়াছিল। তখন মনে হইল যে আর কোন চিন্তা নাই। যখন শৈলেন আসিয়াছে, অহোরাত্র কীর্ত্তনাদি কিছুরই জন্য আমার চিন্তা নাই। সে একাই সমস্ত চালাইয়া নিবে। রাত্রে সকলের কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই ঠাকুর ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে টেবিলের উপর তুলসীমঞ্চ বসাইয়া এবং তাহা যথাসম্ভব সাজাইয়া আমরা ৭।৮ জন লোক তাহা বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম।

প্রাতঃকালে অনুমান ৮টার পর হইতে নানাদিক হইতে ক্রমশঃ কীর্ত্তনের দল আসিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। একদল কীর্ত্তনিয়া 'জিরতলী' গ্রাম হইতে কয়েকটি ঢাক বাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। ঐ সময় হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঐ তুলসীমঞ্চ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে নোয়াখালী শহরে ঐ প্রকারের কীর্ত্তন হইতে আমরা কখনও দেখি নাই। প্রাতে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় দুই, তিন সহস্র লোক শহরের নানা রাস্তা, এমন কি প্রায় তিন মাইল

দূরবর্ত্তী সোনাপুর দীঘির চারিধারে ঘুরিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায়ও অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করে।

নেহাৎ অপ্রস্তুত অবস্থায়-ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় এইরূপ কীর্ত্তনাদি হওয়ায়। বলা বাহুল্য যে আমরা সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলাম। মহাপ্রসাদ বর্ণনির্ব্বিশেষে শহরের প্রায় সকল হিন্দুই সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে তাহা গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

নোয়াখালীতে তৎপূর্ব্বেও বহু মহোৎসবাদি হইয়াছে। কিন্তু, এইরূপ বৃহৎ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আনন্দাস্পদ মহোৎসব আর কখনও হয় নাই বলিয়া লোকে আলোচনা করিয়াছিল। আমার নিজ অভিজ্ঞতা হইতেও বলিতে পারি যে, যদিও পরবর্ত্তী প্রতি বৎসরের জন্মোৎসবেই আমরা তদপেক্ষা অনেক বেশী চেষ্টা পূর্ব্ব হইতে করিয়াছি এবং তাহাতে কোন কোন বৎসর কীর্ত্তনাদি ও বিভিন্ন জিলা হইতে জনসমাগম ঐ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইলেও, আনন্দের দিক দিয়া বোধ হয় ঐ বৎসর অপেক্ষা কোন বৎসরই বেশী হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় নিজকে অসহায় ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে উন্মুখ হইলে, তিনিই সকল ব্যবস্থা করিয়া পরিণামে আনন্দে আপ্লুত করিয়া দেন এবং আমাদের চেষ্টায় বেশী কিছুই করিতে পারা যায় না।

এই উৎসব উপলক্ষে উৎসবের আরম্ভেই একটি অল্প বয়স্ক অবাঙ্গালী যুবক আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আকারে ইঙ্গিতে ছাড়া সে কাহার-ও সঙ্গে কোন কথাই বলে নাই। তাহাকে কখনও আহারের জন্য কাহাকে-ও কিছু বলিতে,

কি কোন বিষয়ে কাহারও সহিত আলাপ করিতে দেখি নাই। এই সকল নানা কারণে আমার মনে স্বতঃই এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইনি কোন শরীরী বা অশরীরী মহাত্মা হইবেন। আমরা তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। অবশ্য একবার কতকটা জোর করিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। মহোৎসবের পরদিন হইতে আর তাঁহাকে আমরা কেহ-ই দেখি নাই।

নোয়াখালী শহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ষোল বৎসর ও মাইজদিতে আট বৎসর এবং কলিকাতায় গত দুই বৎসর (অর্থাৎ ১৯৫৮ ও '৫৯ ইং সনে) এই জন্মোৎসব পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং প্রায় বৎসরই এইভাবে কখনও ফকিরের বেশে, কখনও বা স্ত্রীলোকের বেশে এইরূপ শরীরী বা অশরীরী মহাত্মাগণ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া মহোৎসব সমাপনান্তে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে গত বৎসরের জন্মোৎসবের দিন এক মহাত্মার কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে উপস্থিতির বিষয় নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

জন্মোৎসবের দিন যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের শ্রীপ্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যভোগের পূজাদি সমাপনান্তে প্রাতে আসন ত্যাগ করিলে, আমি নিজ মনে তথায় বসিয়া কিছুক্ষণ 'বেদবাণী' পাঠ করিয়াছি। পাঠ শেষ করিয়া পিছন দিকে ফিরিতেই দেখি যে মাথায় খুব ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, গায়ে কম্বল জড়ান একজন সাধু ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই একটু অনন্যসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া আমার মনে হইল। তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে তিনি কাশী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার গুরু 'মাধব পাগলা' তাঁহাকে এই জন্মোৎসব

দেখিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'গত মাঘী পঞ্চমী তিথিতে আমার গুরু আমাকে এক নাম দিতে চেয়েছিলেন'— ঠাকুরের চিত্রপটের দিকে দেখাইয়া বলিলেন 'এই ঠাকুর আমাকে অন্য নাম দিতে বলায় আমার গুরুদেব আমাকে সেই নামই দিয়েছেন।' তাঁহার গুরু কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি কাশীতে 'পাতালেশ্বরে' বাস করেন বলিয়া বলিলেন। তাঁহার ঠিকানা আমাকে লিখিয়া দিতে বলায় তিনি একখানা পোষ্টকার্ডের উপরের অংশ ছিঁড়িয়া আমাকে দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—'জয় মাধব'—; ৩২।৬৫ পাতালেশ্বর বারাণসী (U. P.)।

আমি যদিও অনেকবার কাশীতে গিয়াছি, পাতালেশ্বর কখনও গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিশেষতঃ ১৯৫৮ ইং সনে নানা-কারণেই জন্মোৎসবের পত্র খুব অল্পই নানাস্থানে দেওয়া হইয়াছিল এবং পাতালেশ্বরে কোন পত্র দেওয়া হয় নাই সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত ছিলাম। সুতরাং কেমন করিয়া এই সাধু আমাদের এখানে আসিলেন ইহা ভাবিতেই আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের জন্মোৎসবে মহাত্মাগণের আগমনের বিষয় মনে পড়িল। আমি তাঁহাকে মহোৎসবের দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া যাওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করিলাম, তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমার তো থাকার জো নেই, আমার গুরুদেব আজই দ্বিপ্রহরে আমাকে 'দাঁতন' রওনা হয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।" "দাঁতন কোথায়" জিজ্ঞাসা করায় তিান বললেন যে উহা মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত। তাঁহার গুরুদেবের আদেশের কথা বলায় আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। তিনি দুইখানা এক টাকার নোট আমার হাতে দিয়া বলিলেন ঐ টাকা দিয়া একখানা লাল

গোলাপ ফুলের মালা ও ভোগের জন্য মিষ্টি যেন কিনিয়া দিই। ঠাকুরের চিত্রপটের দিকে দেখাইয়া আবার তিনি বলিলেন "আহা কত জন্ম এঁর পিছনে পিছনে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই।" এই কথা বলার সময় তাঁহার চোখের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছিল। ঐ টাকা দুইটি আমার ছোট ছেলে শ্রীমান রামময়কে দিলে সে দুই টাকা মূল্যে লাল গোলাপ ফুলের মালা না পাওয়ায় যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন যে ফুলওয়ালা পূর্ব্বে ঐ মালার মূল্য পাঁচ টাকা বলিয়াছিল, সেই তাহাকে ডাকিয়া দুইটাকা মূল্যেই ঐ মালাটি দিয়া দিল।

উপরোক্ত সাধু জন্মোৎসবের প্রসাদ গ্রহণান্তে দ্বিপ্রহরেই 'দাঁতন' রওনা হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি সাধারণ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী নহেন, এবং তাঁহার উপরোক্ত বিষয়ে কোন মিথ্যা উক্তি করারও কারণ নাই। এমতাবস্থায় তিনি ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিয়া থাকিলে, "ইনিই অন্য নাম দিতে আমার গুরুদেবকে বলায়, তিনি অন্য নাম দিয়েছেন", এই কথা কখনও বলিতে পারিতেন না এবং নিজ হইতে দুইটি টাকাও ঐভাবে দিতেন না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেহ ভাগ্যবান হইলে এখনও ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইতে পারেন। এই সাধুর আবির্ভাবে আমিও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রথম বৎসর কলিকাতা উৎসবে নানা কারণেই আমি বহু বাধা ও অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে এইরূপ বিরাট উৎসবের জন্য স্থানাভাব, কর্ম্মী ও জিনিষপত্র আদি সকল কিছুরই অভাব সম্বন্ধে আমার মনে মাঝে মাঝে নানাপ্রকারের আশঙ্কার উদয় হইতেছিল। তদুপরি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট তাঁহার

PRESENTED

সকল স্থানের ভক্তগণের সমবেতভাবে এই উৎসব ঐবার কলিকাতায় হইবে, না মাইজদিতে হইবে, এই কথা লইয়া সামান্য দ্বন্দ্বও উপস্থিত হওয়ায় আমি একটু বিব্রতও হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারই আদিষ্ট কাজে ব্রতী হইয়াছি, ইহা নিশ্চিতরূপে আমার জানা থাকায় কোন কথা বা বাধাই কলিকাতায় ঐ উৎসব সুসম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমার মনের জোর হরণ করিতে পারে নাই। বস্তুতপক্ষে ক্রমে ক্রমে তিনি সমস্ত অভাব ও বাধাই তিরোহিত করিয়া পরমানন্দে উৎসব সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

জন্মোৎসব সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উপরোক্ত কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া অন্যকথা উত্থাপন করিতেছি এমন সময় আমার কন্যা শ্রীমতি মৃন্ময়ী যাহার দ্বারা এই বিষয় লেখাইতেছি, বলিল যে, জন্মোৎসব নোয়াখালী হইতে কেন মাইজদিতে গেল এবং তথা হইতে কেন কলিকাতায় আসিল এ সম্বন্ধে কিছু না লিখলে, যদি এই লেখা অন্য কোন লোকের পড়িবার সুযোগ হয় তাহা হইলে তাঁহার বা তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে একটু সংশয় থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব। আমি তদুত্তরে বলিলাম যে উহা বিস্তারিতভাবে লিখিতে ইচ্ছা না করিয়াই আমি এইভাবে সংক্ষেপে লিখিতেছি। কারণ তাহা বিস্তারিত ভাবে লিখা আমার পক্ষে নানা কারণেই অসুবিধাজনক; হয়ত তাহাতে অপ্রত্যক্ষে কাহারও কাহারও মনে ব্যথাও দিতে পারি। তারপর কিছুক্ষণ এই বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়া ঐ সময়ে লেখা বন্ধ করিলাম। ঐ রাত্রে অনেক চিন্তার পর আমি স্থির করিলাম যে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সংক্ষেপে ঐ বিষয় লিখিয়া সত্য প্রকাশ করাই সঙ্গত। তদনুযায়ী নিম্নে ঐ বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

নোয়াখালীতে প্রথম বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী এই জন্মোৎসবের পর হইতে প্রতি বৎসরই জন্মোৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে কখনও মৌখিকভাবে এবং কখনও পত্র দ্বারা কোথায় এই জন্মোৎসব হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার অনুমতি লইয়া কার্য্যসূচী প্রস্তুত করা হইত। তিনি অনুমোদন করিলে, উহা ছাপাইয়া ভক্তগণকে জানাইয়া দেওয়া হইত। তাঁহার শ্রীদেহ ত্যাগের দুই, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি চৌমুহনী যাইয়া সেই বৎসর কোথায় এই জন্মোৎসব হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আপনি যেখানে থাকেন সেখানেই হইবে।' ইহার পর হইতে আর আমি কোথায় ঐ জন্মোৎসব হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস বা ইচ্ছাও করি নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর জিজ্ঞাসার কারণ এই ছিল যে, যদিও তিনি কাশীতে ঐ বৎসর সমবেত ভাবে সকল স্থানের তাঁহার ভক্তগণের জন্মোৎসব নোয়াখালীতে হওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, নোয়াখালীতেই যে তখন হইতে জন্মোৎসব হইবে, এমন কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। এই মহোৎসবে যোগ দেওয়ার ও সম্পন্ন করার সৌভাগ্য তাঁহার সকল স্থানের ভক্তগণেরই উপর অর্পিত হইয়াছিল। তদবস্থায় প্রতি বৎসর ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা না করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইবে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু তাঁহার উপরোক্ত উক্তির পর আর তাহা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

বাং ১৩৫৬ সালের ১৮ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে চৌমুহনীতে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীদেহ ত্যাগ করেন এবং ঐ সনের শ্রাবণ মাসে আমার সমস্ত বাড়ীসহ নোয়াখালী শহরের জন্মোৎসব প্রাঙ্গন নদীগর্ভে বিলীন হয়। নোয়াখালী শহর মাইজদিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি বাধ্য হইয়াই মাইজদিতে চলিয়া আসি।

ঐ বৎসর পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে সমবেতভাবে ঠাকুরের জন্মোৎসব কোথায় হইবে এই বিষয় আলোচনা কালে, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত নির্দ্দেশের বিষয় ঐ সভাতে ভক্তগণ জানিতে পারায়, সকলে একবাক্যে মাইজদিতে আমি যে বাসায় ছিলাম, সেখানেই ঐ জন্মোৎসব হইবে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঠাকুর আমাকে ঐ নির্দ্দেশ দেওয়ার সময় আমার পরম পূজনীয় দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত ছাড়া অপর কেহ উপস্থিত ছিলেন বলিয়া স্মরণ নাই। আমাদের পক্ষে ঐ নির্দ্দেশের কথা সর্ব্ব সাধারণে প্রকাশ করা যে একটু অসুবিধাজনক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ঐ নির্দ্দেশের কথাগুলি প্রায় গোপনই ছিল। পাহাড়তলী আশ্রমে পূজা উৎসবের সভায় নানাস্থানের ভক্তগণের মধ্যে যখন তাঁহার আদিষ্ট এই জন্মোৎসব ভবিষ্যতে কোথায় হইবে এই আলোচনা হয় তখন ঠাকুরের ঐ সম্পর্কে শেষ নির্দ্দেশের কথা প্রকাশ হয়। কলিকাতায় প্রথম উৎসবের পূর্ব্বে নানা জন নানা কথা বলায়, আমি বাধ্য হইয়াই কাহারও কাহারও নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপরোক্ত বাণীর পুনরুল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেশ বিভাগের পর কাহাকেও জন্মস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বলিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। আমার নিজ হইতে তাঁহাকে কখনও ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয় নাই, যদিও দেশ বিভাগের পর নানা কারণেই আমার মনে হইয়াছিল যে আমার পক্ষে নোয়াখালীতে হয়ত আর বেশী দিন থাকা সম্ভবপর হইবে না। ঐ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি এবং আমার দাদা প্রায় প্রতি রবিবারে এবং বন্ধ হইলেই, চৌমুহনী যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিতাম। একদিন প্রাতে

তথায় যাওয়া মাত্র স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রকুমার সাহা ও ৺নরেন্দ্র ভূইঞা হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল যে, 'দাদা, আপনি নাকি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন?' আমিও হাসিয়া উত্তর দিলাম —'হ্যাঁ, তাহা ত হইবেই। তোমাদিগকে, এমন কি ঠাকুরকেও না জানাইয়া আমি অবশ্যই পালাইয়া যাইব।' তাহাতে তাহারা বলিল যে, সেদিন ঠাকুর ঐ বাঙ্গ্‌লো হইতে ষ্টেশনে অপেক্ষমান একখানা রেলগাড়ীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'শুভবাবু বুঝি ঐ গাড়ীতে সকলকে নিয়া চলিয়া যান!' তাহাতে তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'তাহা কি হইতে পারে?' তথাপি ঠাকুর বলিলেন, 'হ্যাঁ, তিনি যাইতেছেন বলিয়াই ত' মনে হয়!' এই কথা শুনিয়া আমি ঠাকুর যে কামরায় ছিলেন তথায় প্রবেশ করা মাত্র তিনি বলিলেন, 'আমি যেন দেখিলাম, আপনি সকলকে নিয়া চলিয়া যাইতেছেন।' আমি মৃদু স্বরে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনাকেও না বলিয়া যাইবই ত'।' তিনি আরও বলিলেন, 'আপনার যাওয়ার ত' কোন কারণ দেখি না।' ইহার পর আর ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কোন কথাবার্ত্তা কখনও হয় নাই। বস্তুতঃ পক্ষে এক সময়ে আমার মন এমনই বিকল হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি ঐখানকার সরকারী ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় ব্যবসা করিলেই বোধ হয় ভাল হইবে এরূপ মনে করিতেছিলাম। কিন্তু দেশ বিভাগের পর দশ বৎসরের মধ্যে ছেলে, মেয়ে, আত্মীয় স্বজনের নেহাৎ পীড়াপীড়িতে আমার মন সময় সময় একটু দুর্ব্বল হইয়া উঠিলেও, 'আপনার যাওয়ার ত' কোন কারণ দেখি না'; তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত ঐ বাণী আমাকে ঐ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিত। প্রকৃত পক্ষে দেশ বিভাগের পর এমন কি সরকারী

ওকালতী ত্যাগের পরেও আমাদের নোয়াখালী জিলার উপরিতন কর্ম্মচারীদের কিংবা জনসাধারণের নিকট হইতে আমি কখনও কোন আপত্তিজনক ব্যবহার পাই নাই। বরং সময় সময় পূর্ব্বাপেক্ষাও অনেক বেশী সম্মানের ও সৌহার্দ্দের পরিচয় পাইয়াছি।

১৯৫৭ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি চিরতরে ওকালতী ব্যবসা ত্যাগ করি। তাহার দুই, তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত ছেলে মেয়েরা ব্যবসা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাহাদের নিকট আসিয়া শেষ বয়সে বিশ্রাম নিতে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিতেছিল। কিন্তু নানা কারণে আমি তখন ব্যবসা ছাড়া সঙ্গত বোধ করি নাই। ব্যবসা ত্যাগের বৎসরখানেক পূর্ব্ব হইতেই আমার আর ব্যবসা করা সঙ্গত হইবে না বলিয়া বার বার মনে হইতেছিল। পরিশেষে ঐ ইচ্ছা এতই প্রবল হইল যে, আমি ঐ পূজার বন্ধের পর আর ব্যবসা করিব না বলিয়া সকলকে জানাইয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম যে, ব্যবসায়ে থাকিয়া ঠাকুর আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করা দূরে থাকুক, তাহা পালনের চেষ্টা করারও বেশী সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। অপর দিকে আমার নিকটে আমার স্ত্রী ছাড়া আত্মীয় স্বজন কাহারও থাকা সম্ভব হইতেছে না। এমন কি সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদের পক্ষে পাসপোর্ট আদি লইয়া ২।৪ দিনের মধ্যে উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হইবে না। ব্যবসা না করিয়া আত্মীয় স্বজন শূন্য মাইজদি গ্রামে পড়িয়া থাকা দৃষ্টতঃই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। এই সকল কারণে ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা আদি স্থানে বেশী সময় কাটাইয়া, বৎসরে, পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে পূজা উৎসবের সময় ২।১ মাস ও চৌমুহনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি আশ্রমে তিরোধান

উৎসব উপলক্ষে কিছু দিন, এবং সম্ভব হইলে তাঁহার জন্মস্থান ডিঙ্গামানিকেও কয়েক দিন থাকার মনস্থ করিয়া নোয়াখালী ত্যাগ করিলাম। ঠাকুর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালী ত্যাগ করার কোন কারণ দেখেন নাই বটে, কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে শারীরিক অবস্থার এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে যে আমার মূল উদ্দেশ্য সাধনে মাইজদিতে আর থাকার কোন কারণই দৃষ্ট হয় নাই।

আমার মাইজদি ত্যাগের ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রতি বৎসর জন্মোৎসব উপলক্ষে সাপ্তাহিক যে সভা হইত তাহাতে স্থানীয় লোকদের জানাইয়া দিতাম যে, আমার এবং আমার দুই চারজন বন্ধুর হয়ত বেশীদিন মাইজদিতে থাকা নানা কারণেই সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদের অনুপস্থিতে-ও যাহাতে ঠাকুরের জন্মোৎসব সাধ্যানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, এবং 'বেদবাণী' র উপদেশাবলী আলোচিত হয়, তদ্বিষয়ে যেন তাঁহারা সচেষ্ট হন। মাইজদিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সংখ্যা খুবই কম, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে না দেখিয়া আমরা একটু হতাশই হইয়াছিলাম। তাহারা ভবিষ্যতে এই আনন্দোৎসব হইতে বঞ্চিত হইলে বিশেষ দুঃখিত হইবে জানা সত্ত্বেও আমার পক্ষে প্রতিকারের কোনও পন্থা ছিল না; কারণ অবসর প্রাপ্ত জীবনে বেশী সময় পাহাড়তলী কৈবল্যধামে এবং কলিকাতায় থাকিব বলিয়াই সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরোক্ত আদেশানুযায়ী সকল স্থানের ভক্তগণের সম্মিলিতভাবে এই উৎসব ঐ দুই স্থানের একস্থানেই হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কোন আশ্রমেই জন্মোৎসব হওয়া তাঁহার

অভিপ্রেত ছিল না বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি জন্মোৎসবের সময়ে তাঁহার সেবার জন্যও চৌমুহনী আশ্রমে কাহাকেও থাকিতে দিতেন না।

অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসর এই উৎসব চৌমুহনীতে করার জন্য তথাকার কোন কোন বিশিষ্ট ভক্ত অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও ঠাকুরের সম্মতি পান নাই। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে উৎসবের সময় আমার কলিকাতায় থাকিতে হইবে বলিয়া এই উৎসব কলিকাতায় না হইয়া উপায়ান্তর ছিল না। উপরোক্ত কথাগুলি বারংবার বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ মাইজদিবাসীদের সান্ত্বনা দিতে পারি নাই।

প্রথম বৎসরের কলিকাতার জন্মোৎসবই যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট সকল স্থানের তাঁহার ভক্তগণের সমবেত উৎসব, সেই সম্বন্ধে আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বে বর্ণিত ঐ অজ্ঞাত সাধুটিকে জন্মতিথি পূজার দিন কলিকাতার জন্মোৎসব প্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করিতে পারিলে কোন বাধা বিপত্তিই যে কার্য্যকরী হয় না, তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এক বৎসরের জন্মোৎসবে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রথম কয়েক বৎসর জন্মোৎসবে নোয়াখালীর নানা দলের ভলান্টিয়ারগণ মহোৎসবের দিন এমন শৃঙ্খলা, দক্ষতা এবং পরিশ্রমের সহিত বহু সহস্র লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিল যে, তাহাতে বিভিন্ন জিলা হইতে আগত ভক্তগণ তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অন্য কোথাও ঐরূপ বিরাট ব্যাপারে এইরূপ শৃঙ্খলা কখনও দেখেন নাই। বস্তুতঃ সর্ব্ব বিষয়েই তাহাদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তাহাদিগকেই মহোৎসবের প্রধান সম্বল বলিয়া আমরা মনে করিতাম।

এক বৎসর জন্মোৎসব আরম্ভের দিন; কি তৎপরদিন এক মিষ্টি বিক্রেতার সহিত তাহাদের একজনের বচসা হয়, তাহাতে তাহাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আসিয়া আমাকে বলিল যে ঐ মিষ্টি বিক্রেতার দোকান উঠাইয়া না দিলে তাহারা কাজ করিবে না। আমি তাহাদের বলিলাম, "সে যাহাতে তোমাদের নিকট মাপ চায়, সে ব্যবস্থা আমি করিব। কিন্তু আনন্দোৎসবের মধ্যে একটি লোককে তাড়াইয়া দিলে এবং দ্বন্দ্ব আরও বৃদ্ধি করিলে, আমাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সকলের সঙ্গেই অন্ততঃ উৎসব প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সদ্ভাব রাখিয়া চলাই আমাদের আদর্শ।" ইত্যাদি।

যদিও অন্য সময়ে আমাকে তাহারা অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, তথাপি আমি বুঝাইয়া বলা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের জিদ ছাড়িল না। ঐরূপ অবস্থায় আমি নিজকে একটু বিপন্নই বোধ করিলাম। কিন্তু একটি লোককে অত্যন্ত সামান্য কারণে উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে বহিষ্কার করার অপরাধ মাথায় লইতে সাহস করিলাম না এবং তাহাদিগকে স্পষ্টভাবেই জানাইলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় তাঁহার জন্মোৎসব নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে, যদি আমরা কোন অপরাধ না করি। সুতরাং তাহারা যাহা সঙ্গত বোধ করে, তাহা করিতে পারে। তাহারা এবিষয়ে আরও বিবেচনা করিবে বলিয়া সরিয়া পড়িল, কিন্তু পরে আর আমার সঙ্গে দেখা করিল না। তদবস্থায়ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় প্রসাদ বিতরণাদি সকল কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। ঐ বৎসর আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার ঐ ব্যাপারে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। অবশ্য অনেকেই

তাঁহার সহকর্মীভাবে আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সময় সময় বলিতেন, "প্রথম বলি আমি, তারপরে বলে ভূতে" এই বাক্যেরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা একবৎসর জন্মোৎসবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম হইতেই আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে জন্মতিথি পূজার পূর্ব্বদিন হইতে অধিবাস কীর্ত্তনাদি করিয়া এবং জন্মতিথির পূজাদি সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী রাববারে মহোৎসরের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। আমরাও তাঁহার কথা অনুযায়ী ঐভাবেই উৎসবের কার্য্যসূচী প্রস্তুত করিয়া রবিবার দিন মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছিলাম। এক বৎসর জন্মতিথি পূজার পরের রবিবার দিন একাদশী তিথি পড়ায়, কোন কোন বৈষ্ণব বন্ধু জানাইলেন যে একাদশী দিন মহোৎসব হইলে বৈষ্ণবেরা প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু রবিবারের পরের দিনও অফিসাদি ঐ বৎসর বন্ধ থাকায়, সোমবারে মহোৎসব করিলে সকলেই সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। সকলেই ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, ইহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকায় আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে পত্র দিয়া জানাইয়াছিলাম যে, বৈষ্ণবগণ ঐ প্রকারের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে জানাইলেন যে, বস্তুতঃই তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি হইতে পারে, এবং আমরা ইচ্ছা করিলে সোমবারেও মহোৎবব করিতে পারি। এই পত্র প্যাইয়া আমরা মহোৎসব সোমবারেই হইবে বলিয়া স্থির করিলাম। ঐ বৎসর উৎসবের আরম্ভ হইতে রবিবার পর্য্যন্ত পরমানন্দে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু সোমবার ভোর

হইতে আকাশে ক্রমশঃ মেঘ ঘনীভূত হইতে লাগিল, এবং বৃষ্টি গুরুতর রূপে বর্ষণ হইয়া উৎসব পণ্ড হইবার আশঙ্কায় আমরা অতি মাত্রায় ভীত হইয়া সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। স্নেহের ভাই শৈলেন তাহার সঙ্গে অন্য কীর্ত্তনীয়াগণকে লইয়া উৎসবের প্রাঙ্গন, ভোগ রান্নার স্থল এবং প্রসাদ বিতরণের স্থানগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই বৃষ্টি বন্ধ হইল না এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত উৎসব প্রাঙ্গন জলে ভাসিয়া গেল। প্রথম অবস্থায় কিছু কিছু লোক নির্বিঘ্নে প্রসাদ পাইলেও পরে বহু সংখ্যক ভক্তই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এবং একজন প্রসাদ পাইয়া গেলে, তাহার পরিত্যক্ত পাতাতেই প্রসাদ লইয়া ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। প্রসাদ বিতরণকারী ব্যক্তি গণের দুরবস্থার অবধি ছিল না। তাঁহারা অনেকেই দৌড়াদৌড়ী করিবার কালে পা পিছলাইয়া পড়িতে ছিলেন। কিন্তু অসম্ভব বৃষ্টিতে ভিজা ও অন্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সানন্দে প্রসাদ বিতরণে বিরত হন নাই।

এই উৎসবের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আমি উপস্থিত হইলে, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন যে, ঐবার মহোৎসবে বৃষ্টিতে কিছু কষ্ট দিয়াছে বটে, কিন্তু প্রসাদ নষ্ট হয় নাই। যাঁহারা পাওয়ার তাঁহারা সকলেই পাইয়াছেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ হইতে যাহা যখন বলিয়াছেন, তাহা যে কোন কারণেই বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিলে তাহার শাস্তি অনিবার্য্য। তিনি কিছু নির্দ্দেশ দেওয়ার পর যদি কেহ তাহার ব্যতিক্রমে কিছু করার জন্য অনুরোধ করিত, ঠাকুর তাহাতে

কোন বাধা দিতেন না এবং তাঁহার আচরণে দেখিয়াছি যে বিশেষ গর্হিত কিছু না হইলে যে যাহা বলিত, তিনি তাহাতেই সায় দিতেন। কাহারও প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে বাধা দিতেন না। এই সম্পর্কে তাঁহার অভিমত বেদবাণীর প্রথম খণ্ডের ৫২নং পত্রে দ্রষ্টব্য।

আমাদের পরিবারের দুইটি অত্যন্ত শোকাবহ ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুর কিভাবে আমাদের কল্পনাতীত শান্তি দিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীসুধাময় দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ননীর ১৩ বৎসর বয়সে একটি উচ্চশিক্ষিত এবং সর্ব্বদিক বিবেচনায় অত্যন্ত সুপাত্রের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের দুই বৎসর পরেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার চরিত্র এতই মধুর ছিল যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে আমাদের পরিবারের সকলেরই স্নেহভাজন হইয়াছিল। ছেলেটি কলিকাতা সেক্রেটারিয়েটে কাজ পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়, এবং নানা প্রকার চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও প্রায় বৎসরেক ভুগিয়া একদিন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় দেহত্যাগ করে। সে ঐ সময়ে কলিকাতায় ছিল। ঐ দিন আমি বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় জজকোর্টের সরকারী উকীলের কামরায় বসিয়া আছি, এমন সময় আমার নিকটে টেলিগ্রাম আসিল যে, 'সতীশ' (আমাদের জামাতা) আর ইহ জগতে নাই। এই নিদারুণ সংবাদে আমি অত্যন্ত শোক বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং প্রথমেই আমার মনে হইল এই সংবাদে আমার দাদার অবস্থা কি হইবে! কারণ তিনি অতীব শান্ত প্রকৃতির এবং কোমল হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি। তখন আমার মনে মনে এই চিন্তাই

হইল, "ঠাকুর, তোমাকেত' আমি কখনও আমাদের নিকটে আসিতে প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু তুমি অবিলম্বে আমার দাদার নিকট উপস্থিত হও, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।" ঐদিন রাত্রের গাড়ীতে আমার দাদার কর্ম্মস্থল চট্টগ্রামে রওনা হইলাম। দাদার মেয়েটি তখন তাঁহার নিকটেই ছিল। আমি প্রাতে তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলে, প্রথমে সকলেই ভীষণ শোকাবেগে অস্থির হইয়া কান্নাকাটি করিলাম। একটু পরেই শুনিতে পাইলাম যে, ঠাকুর আমি পৌঁছার পূর্ব্বদিন প্রাতে অর্থাৎ সতীশের মৃত্যুর ঠিক সম সাময়িক কালে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়াছেন। আমি যে সময়ে নোয়াখালীতে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম, প্রায় সেই সময়েই আমার দাদার বিশেষ বন্ধু শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু ঐরূপ একটি টেলিগ্রাম পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর চট্টগ্রাম ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই আমার দাদাকে টেলিফোন করেন যে, তিনি যেন গুরুভ্রাতা শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। যদিও আমরা ঐ জামাতার অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্কটাপন্ন হইতেছিল বলিয়া জানিয়াছিলাম, বহুদিন যাবত শ্রীশ্রীঠাকুর কোথায় আছেন, তাহা আমরা কিংবা ঐ জামাতা বা কলিকাতায় তাহার শুশ্রূষাকারী কেহই, জানিতাম না। ঠাকুর হঠাৎ ঐভাবে সেদিন ষ্টেশন হইতে ফোন করায় (যাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও করেন নাই), আমার দাদা সতীশ সম্পর্কে কিছু অমঙ্গলজনক হইয়া গিয়াছে এই আশঙ্কায় ভয় বিহ্বল চিত্তে ঐদিন প্রাতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া কাঁদিয়া ফেলেন। যদিও ঠাকুর সকল বিষয় ভালভাবেই জানিতেন, কারণ তাহা না হইলে তাঁহার হঠাৎ চট্টগ্রামে এই ভাবে আবির্ভাবের কোন কারণ ছিল না, তিনি দাদাকে

ঐকথা কিছুই না বলিয়া নানা ভাবে শান্ত হওয়ার জন্য বুঝাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদা অফিসে যাইবেন বলিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন। এদিকে, উপরোক্ত অক্ষয় বাবু ঐ টেলিগ্রাম পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই নিদারুণ সংবাদ দাদা এবং তাহার পরিবারস্থ অন্যদের কি ভাবে দিবেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে, ঠাকুর আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারায়ই এই সংবাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে ঠাকুর নিজ হইতেই বলিলেন যে টেলিগ্রামের সংবাদ আমার দাদাকে তিনি স্বয়ংই জানাইবেন। ঠাকুর অবিলম্বে দাদার বাসায় চলিয়া আসিয়া এই নিদারুণ সংবাদ দিলে দাদা প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান হইলে দেখিলেন যে, তিনি ঠাকুরের কোলেই শুইয়া আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত পরিবারস্থ সকলকে সান্ত্বনা দিয়াছেন জানিয়া আমি ঐ সময়েই কিছুটা আশ্বস্ত হইলাম এবং মনে হইল যে তাঁহার দয়ার অবধি নাই। শুনিয়াছিলাম, গুরু কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে যেইরূপ যাহাই প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়, সেইরূপ গুরুও সমস্ত প্রার্থনাই পূরণ করেন। কিন্তু আমাদের গুরু এমনই দয়াল যে, তিনি প্রার্থনার প্রতীক্ষা রাখেন না, প্রার্থনার পূর্ব্বেই তাহা পূরণ করেন। আমি পূর্ব্বদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় আকুল চিত্তে দাদার নিকট তাঁহার অবিলম্বে উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি ঐ সময়ের কয়েকঘন্টা পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া দাদাকে সান্ত্বনা দিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমি দাদার বাসায় পৌঁছানর দিনও বিকাল বেলা শ্রীশ্রীঠাকুর চট্টগ্রাম টাউন হইতে চট্টগ্রাম বন্দরের জেঠীতে দাদার বাসায় আসিয়াছিলেন। তৎপরদিন আমরা সকলেই

একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ নোয়াখালীর বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তথায় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ থাকিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিয়া সেইবার নোয়াখালী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে 'ফেণী' পৌঁছিলে আমাদের সহৃদয় গুরু ভ্রাতা শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে বলিলেন, "সুধাদার ন্যায় অত নিরীহ ব্যক্তির উপর ভগবানের এ কি অবিচার ?" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, তাঁহারা সকলেই শান্ত হইয়াছেন।"

এই দুর্ঘটনার ৩।৪ মাস পরেই পাহাড়তলী কৈবাল্যধামে দুর্গাপূজার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন তাঁহারই আদিষ্ট আমার বাড়ীতে শ্রীশ্রীকৈবাল্যনাথের চিত্রপট সহ প্রবেশের অনুমতি দেন। তদনুযায়ী পূজা উৎসবে সম্মিলিত ভক্তগণ সহ তৎকালীন মোহন্ত মহারাজ ৺হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে আমরা গৃহ প্রবেশ করি। ঐ সময়, কি পূজা উপলক্ষে সেই বৎসর আশ্রমে অবস্থান কালে কয়েকমাস পূর্ব্বে যে আমাদের উপর অত বড় বিপৎপাত হইয়াছিল তাহা ঘুনাক্ষরেও মনে আসে নাই। তাঁহার অপার কৃপা না হইলে ঐ সময় আমাদের মনের কি অবস্থা থাকিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতি (খুকু) কে আমরা যথাসাধ্য খরচ করিয়া একটি সুপাত্রে বিবাহ দিয়াছিলাম। ঐ সম্বন্ধ স্থির করার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দান কালে 'উহারা সুখীই হইবে' —ইহা বলিয়াছিলেন। এ আশ্বাসে পরমানন্দে উহাদের বিবাহ নোয়াখালীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। কি বিবাহের দুই বৎসর পরেই মেয়েটি টাইফয়েড রোগে

ভাগলপুরে তাহার শ্বশুরালয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি তাহার অতি সঙ্কটাপন্ন অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া নোয়াখালী হইতে ভাগলপুরে প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, মেয়ের অজ্ঞান অবস্থা, কথা বলিতে পারে না। তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বলিলেন প্রায় দুইদিন যাবৎ তাহার ঐ অবস্থা চলিতেছে এবং তথাকার সুদক্ষ সিভিল সার্জ্জেন ও আরও কয়েক জন ভাল ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। আমি চীৎকার দিয়া বলিলাম, 'খুকু, খুকু, আমি বাবা,—কোন ভয় নাই', এই কথা বলিতেই সে 'উঁ উঁ' করিয়া উঠিল। তাহাতে আমার মনে হইল যে তাহার জ্ঞান আছে। আমি তখন জোরে বলিলাম, 'ঠাকুর যে নাম দিয়াছেন তাহা কি তোর মনে আছে?' সে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার তাহা মনে নাই। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে বার বার তাহার কাণে 'রাম রাম' কয়েকবার উচ্চারণ করিলাম। ক্রমে আমার মনের ভ্রান্তিতে বা সত্যই মনে হইল, যে তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে যাইতেছে। কিন্তু বিকাল বেলা হইতে আবার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে বলিয়া সকলেই মনে করিতেছিল এবং স্থানীয় সিভিলসার্জ্জেনও এমন ভাব দেখাইলেন যে সন্ধ্যার সময়ই তাহার দেহত্যাগ হইবে। আমি অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে কেবল নাম জপিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময় তাহার সমবয়স্ক মেয়েরা, যাহারা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের এবং উপস্থিত সকলকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাঁহারা যেন সকলে যাঁর যাঁর গুরু-নাম, উপাস্য দেবতার নাম জপ করেন, ইহাই অনুরোধ করিলাম। ক্রমে আবার তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে যাইতেছে দেখিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

আমার নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথাকার আত্মীয়দের পীড়াপীড়িতে যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া আবার তাহার নিকটে আসিয়া বসিলাম। প্রায় রাত্রি বারটার সময় তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী পাশের কামরায় একটু বিশ্রাম করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে আমি তথায় যাইয়া বোধহয় আধ ঘণ্টাও শুই নাই, এমন সময় আমার জামাতা আসিয়া বলিল 'বাবা, দেখুন খুকু কি ক'রছে!' আমি যাইয়া দেখি সে খুব জোরে শ্বাস টানিতেছে, সম্ভবতঃ এই শেষ কাল উপস্থিত মনে করিয়া তাহার হাতখানা আমার এক হাতের মধ্যে রাখিয়া অপর হাতে মাথায়, ঠাকুর আমাকে যে নাম দিয়াছিলেন তাহাই জপ করিতে করিতে বুলাইতে লাগিলাম। ক্রমে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, এবং উভয় চক্ষুই একটু বিস্ফারিত হইল। তাহার অন্যপাশে উপবিষ্ট নার্সটি তাহার চক্ষু বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলে, আমি নিষেধ করিলাম। তৎপর আপনা হইতেই তাহা সাধারণ অবস্থায় আসিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হইল।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে পনের ষোল ঘণ্টা আমি তাহার নিকটে থাকিয়া যথাসাধ্য নাম জপ করিতেছিলাম, ঐ সময়ের মধ্যে কখনও ঠাকুর আমার মনে এই প্রার্থনা উদয় করেন নাই যে, তিনি যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেন। বরং ইহাই আমার বারবার মনে হইতেছিল যে,—'ঠাকুর যাহা তুমি তাহার পক্ষে মঙ্গলাস্পদ মনে কর, তাহাই কর।'

যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে তখন-ই হঠাৎ আমার শোকোচ্ছ্বাস ভীষণভাব ধারণ করিল এবং কিছুতেই আমি তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম হই নাই। তাহার অতি সঙ্কটাপন্ন

অবস্থা দেখিয়াও আমি ভাবিয়াছিলাম যে যখন ঠাকুর এক সময় বলিয়াছেন যে, তাহারা অর্থাৎ জামাই ও মেয়ে 'সুখী হইবে এবং তখনও তাহাদের ঐ প্রকার কোন সুখের অবস্থা দেখিতে পাই নাই, তখন তাহার এবার মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে না। তাহার মৃত্যুর পর আমার মনে হইতে লাগিল—তাহা হইলে কি ঠাকুরের কথা মিথ্যা হইল? তাহা হইলে কোথায় দাঁড়াইব? আমার জীবনের শান্তির ও সর্ব্বাবস্থায় প্রধান সম্বল, ঠাকুরের প্রতিই যদি অবিশ্বাস হয় তবে কোথায় দাঁড়াইব? এইরূপ চিন্তাই বার বার মনে আসিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। যদিও আমি মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলি নাই, আমার অতি অসহায় অবস্থা বুঝিয়া আমার বৈবাহিক মহাশয় নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতেছিল, ঐ সময়েই এই পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ পিতা কন্যা হারাইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহাতে তাহারা ত জীবনের সর্ব্বস্ব হারায় নাই। যাহা হউক সমস্ত রাত্র তাহাকে স্পর্শ করিয়া এবং যথাসাধ্য ঠাকুরের প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র জপিয়া কাটাইলাম। ভোর হইতে হইতে বহু লোক সমাগম হইল এবং তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিবে জানিয়া আমি ঐ কামরা পরিত্যাগ করিলাম। আমার আত্মীয় শ্রীমান মাখনলাল রায় চৌধুরী (তৎকালে ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক) আমাকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ ঠাকুর সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব কথাগুলিই ভাবিতে লাগিলাম। ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্নানাদি করিয়া আমরা আমার বৈবাহিকের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলে আমি পুনরায় অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। তাঁহারা আমাকে একটি বিছানায় শোয়াইয়া দুইটি টেবিল ফ্যানের বাতাস যেন আমার মাথায় লাগে,

তাহার ব্যবস্থা করিলেন। একটু পরে আমার জামাতা আসিয়া আমার পাশে বসিল। ছেলেটি অতি সরল প্রকৃতির। সে আমারই মত অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম, "বাবা, কত লোকেরই ত' অল্প বয়সে পত্নী বিয়োগ হয় তাহাতে খুব অস্থির হওয়ার কোন কারণ নাই, কিন্তু আমি এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, সে অবস্থায় জগতে বোধ হয় কেহই পড়ে না। কারণ আমার জীবনের প্রধান সম্বল শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা উভয়ে জীবনে সুখীই হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? বিবাহের পর এই দুই বৎসরের মধ্যে বোধ হয় খুকু ছয় মাসেরও বেশী আমাদের বাড়ীতেই ছিল। বাকী সময়েও সে ভাগলপুরে থাকিত, আর তুমি পূর্ণিয়া থাকিয়া কাজ করিতে। তোমরা কী করিয়া সুখী হইলে?' এই কথা শুনিয়া সে বলিল, 'বাবা, আমরা সুখেই ত' ছিলাম! এখান হইতে পূর্ণিয়াতে আমার কার্যস্থল মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। প্রতি বন্ধে এবং শনি, রবিবার আমি ভাগলপুরে আসিতাম।' আমার জানা ছিল যে ছেলেমেয়ে উভয়েই পূর্ণিয়াতে এক সঙ্গে থাকার ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। ইত্যাদি নানা কারণে জামাতার এই কথাতেও আমার মন শান্ত হইল না। শ্রীমান মাখনলাল বিকাল বেলায় আমার নিকট আসিয়া একটু বেড়াইয়া আসিবার জন্য জেদ করিলে, আমি বেড়াইবার সময় তাহাকে আমার শোকের প্রধান কারণ বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছিলাম। ইহাও বলিয়াছিলাম যে যদিও তখন বরাবর আমার নোয়াখালী যাওয়াই কর্ত্তব্য; কারণ আমার পরিবারস্থ সকল ভীষণভাবে শোকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমার কলিকাতা

হইয়াই যাইতে হইবে। ঠাকুর কলিকাতায় কতকটা লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন বলিয়া শুনিয়াছি, তথায় যে প্রকারে হউক আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কেন তাঁহার কথার ব্যতিক্রম হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিব। আমার বৈবাহিকের বাসায় ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারাও আমাকে অন্ততঃ পক্ষে সেই রাত্র তথায় থাকিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণে আমি ঐ রাত্রেই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম। ষ্টেশনে শ্রীমান মাখন আমাকে লইয়া আসিবার সময়, এক প্রকার খালি গায়ে ও খালি পায়েই আমার জামাতা ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে আসিয়া ট্রেণ ছাড়া পর্য্যন্ত ঐ কামরায় দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ রাত্রে যদিও আমি উপরের বাঙ্কে নিরুপদ্রবে শুইয়াছিলাম তত্রাচ ঠাকুরের কথার ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়াই আর ঘুমাইতে পারি নাই। প্রাতে নীচের বার্থে আসিয়া বসিলে আমার সঙ্গীয় একজন যাত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা সংক্ষেপে জানিয়া বলিলেন, 'যে ছেলেটি আপনার সঙ্গে এই কামরাতে উঠিয়াছিল, সেই কি আপনার জামাতা ?" আমি 'হ্যাঁ', বলিলে তাহার নিকট আমার দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ দিলেই ভাল হয় এবং কতকটা সান্ত্বনা পাইব বলিয়া জানাইলেন। আমি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে হাওড়া ষ্টেশনে আমার ছেলে মেয়েরা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে কিছুতেই আমার এই শোকাচ্ছন্ন ভাব বুঝিতে দিব না।

কিন্তু তাহারা হাওড়া ষ্টেশনে আমার কামরার সম্মুখে আসিলে আমি 'হাউ' 'হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম, এবং কিছুতেই সেই শোকের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এই অবস্থায় অতিকষ্টে

আমার আত্মীয় শ্রীমান অরুণ চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম এবং যাহাতে আমি কলিকাতার নানা স্থানে ঘুরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যে একখানা মোটরগাড়ী সমস্ত দিনের জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তিনি কলিকাতায় যেখানে যেখানে থাকিতেন তাহা আমার জানা থাকায় আমি দ্বিপ্রহরের পরই প্রথমতঃ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের নিকটস্থ ১৬নং কালু ঘোষ লেনে ৺নির্ম্মল সেন মহাশয়ের বাড়ীতে, তৎপর বেলেঘাটা ১১নং তাল-পুকুর লেনে ডাঃ কৈলাশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে ও পরে রুস্তমজী ষ্ট্রীটে শ্রীপূর্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত জানিলাম যে, ঠাকুর আমার আত্মীয় ও গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন ঘোষের পরাশর রোডের বাড়ীর তেতলার কামরায় আছেন। ঐ সময় তিনি নেহাৎ শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি ছাড়া প্রায় কাহাকেও দেখা দিতেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সকল বাড়ীতেই তিনি যে সকল কোঠায় থাকিতেন, সেই সেই কামরায় তাঁহারা ঠাকুর নাই বলা সত্ত্বেও আমি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বীরেন বাবুর বাড়ীর ঐ কামরায়ও আমি সরাসরি চলিয়া গিয়াছিলাম এবং যাইয়া শুনিলাম যে তিনি ঐ দিন ১৭।১৮ বার পায়খানায় গিয়া অতি দুর্ব্বল অবস্থায় আছেন। পরবর্ত্তী দিন প্রাতেই আমার নোয়াখালী রওনা হইতে হইবে। কাজেই ঐ কথা শুনা সত্ত্বেও আমি ঐ কামরায় প্রবেশ করিলাম। ঠিক এই সময়ে ঠাকুর বলিলেন, "উঃ, বড় বেদনা," এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পায়খানায় গেলেন। ঠাকুরের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু বলিব কিনা এই বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার আর কলিকাতা অপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না বলিয়া তখনই তাঁহাকে সকল কথা বলিব বলিয়া

স্থির করিলাম। ঐ সময়ে আমাদের পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ ও আরেক জন ব্যক্তি ঐ কামরায় ছিলেন। তাঁহাদিগকে অল্প সময়ের জন্য ঐ কামরা হইতে আমি বাহির হইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা বাহিরে গিয়া বসিলেন। আমি তখন এক রকম কৈফিয়ৎ তলবের ভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার বড় মেয়ে, খুকু মারা গিয়াছে, জানেন ত?" ঠাকুর তদুত্তরে 'মারা গিয়াছে' ও আরও কি সামান্য কথা একটু অস্ফুট স্বরে বলিলেন, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বলিলাম, "বেদবাণী হইতেও আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি তাহা জানেন ত? আপনি বলিয়া ছিলেন যে জামাই ও মেয়ে সুখী হইবে। কিন্তু তাহারা সুখী হইল কৈ?" তখন ঠাকুর বলিলেন, "তাহারা সুখেই ত' ছিল।" আমি বলিলাম, "না, তাহারা দুঃখেও ছিল।" ঠাকুর তৎপর আমাকে কতগুলি কথা বলিলেন, যাহা এখন আমার মনে নাই। তাহাতে একটু সুস্থ হইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খুকু এখন কোন স্থানে আছে?' আমার এই কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে, তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তেরা খুব নিভৃত অবস্থায় পরলোকগত আত্মা কোন্ লোকে কি অবস্থায় আছে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা বলিয়া দিতেন এবং কাহারও কাহারও সম্পর্কে খুব ভাল অবস্থায় আছেন, আবার কাহারও কাহারও সম্বন্ধে খারাপ অবস্থায় আছেন বলিয়া উল্লেখ করিতে আমি নিজে শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর আমার ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'সে খুব আনন্দেই আছে। আপনার কোন সন্তান অস্থানে যাইবে না।'—ইত্যাদি। ঐ সময় হইতে আমার শোকের অবস্থা যেন সম্পূর্ণ চলিয়া গেল।

আমি বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে ঠাকুরকে বলিলাম, 'আমার ছেলে মেয়েরা যাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছে তাহারা আসিয়া প্রণাম করিয়া যাইতে পারে কি ?' তাহাতে তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। তৎপর আমরা সকলেই কিছু প্রসাদ পাইয়া পুনঃ শ্রীমান অরুণের বাড়ীতে ফিরিলাম।

সন্ধ্যার অল্প পরেই আমার কয়েকজন বন্ধু আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমার প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি বোধ হয় ঠাকুর মহাশয়ের দেখা পাইয়াছেন।' আমি 'হ্যাঁ', বলিয়া বলিলাম, 'আপনি কি করিয়া তাহা বুঝিলেন ?' তিনি তদুত্তরে বলিলেন, 'আজ আপনি কলিকাতা উপস্থিত হইবার পর, আপনার যে অবস্থার কথা শুনিয়াছিলাম, সেই শোকাচ্ছন্ন অবস্থার এখন কিছুই দেখিতেছি না।' বস্তুতঃপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া আসার পর আমার মনে কোন অশান্তি নাই বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সময় সময় মনে হইতে লাগিল যে, আমার মেয়ের সুখ শান্তি-ই ত আমি চাহিয়াছি, সে এখন খুব আনন্দেই আছে বলিয়া ঠাকুর যখন বলিয়াছেন, তখন আমার দুঃখের কি কারণ হইতে পারে বিশেষতঃ আমাদের নোয়াখালীতে সামাজিক বা ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎসবাদিতে তাহার ভাগলপুর হইতে যোগ দেওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হইত না, কিন্তু এখন উৎসবাদিতে সকল সময়ই হয়ত সে আমাদের নিকটেই থাকিবে।

পরদিন প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে হঠাৎ আমার পরম স্নেহাস্পদ গুরুভ্রাতা শ্রীমান উপেন্দ্রকুমার সাহাকে পাইলাম এবং আমরা উভয়েই ট্রেণে ও ষ্টীমারে একই সঙ্গে কাটাইলাম। ষ্টীমারে উপেন আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলিল যে, আমি ঠাকুর মহাশয়ের

সঙ্গে দেখা করিয়া আসার পর তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছেন, 'খুকু এখন কি অবস্থায় আছে, তাহা যদি শুভ বাবু জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি একেবারেই অস্থির হইতেন না, বরং সুখীই হইতেন। ঐ ষ্টীমারে আর একজন সহযাত্রী গুরুভ্রাতা পরলোকগত ক্ষিতিভূষণ সেন মহাশয় আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়াসে নিজের অনেক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, ক্রমেই ঐই শোক মন্দীভূত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু নিজের হাত কি, অপর কোন অঙ্গ দেহচ্যুত হইলে, যেমন ঐ কথা কখনও ভুলা যায় না, সেইরূপ এই শোকের অভিজ্ঞতা-ও আমাকে সময় সময় কষ্ট দিবে, ইহাও সত্য। ঠাকুরের ঐ দিনের কথাগুলি আমার মনের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, আমি তখন মনে মনে ভাবিলাম যে, আমি এখনই কোন ব্যথা অনুভব করিতেছি না এবং তাঁহার কৃপায় সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও আমাকে আর এই শোকে বিচলিত করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ পক্ষে নোয়াখালীর বাসাবাটীতে পৌছিয়া নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাদের শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়াও আমি কোনরূপে শোকবিহ্বল হই নাই। ইহাতে কেহ কেহ আমার তৎকালীন স্থৈর্য্যের প্রশংসা করিলেও ঐ স্থিরতা বা ধৈর্য্য যে সম্পূর্ণই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা সম্ভূত তদ্বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি স্বভাবতঃই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, অতি সহজেই দুঃখে ও কোন সময়ে আনন্দে বিহ্বল হই। সুতরাং যদি পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ শান্তির ব্যবস্থা না করিতেন, ঐ অবস্থায় আমার পক্ষে স্থির থাকা একেবারেই অসম্ভব হইত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণার বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিলে,

বহু দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইতে পারে। এই উপলক্ষে আরও দুই একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

এই জীবনে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পাওয়ার পর হইতে তাঁহার শ্রীদেহ ত্যাগের প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি প্রায় সকল পূজার ও বড়দিনের বন্ধই তাঁহার সান্নিধ্যে কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছি। এক বৎসর বড়দিনের বন্ধের পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম যে তিনি দিল্লীতে আমাদের আত্মীয় ও গুরুভ্রাতা পরলোকগত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। তৎকালীন ফেনী কলেজের প্রফেসার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী আমাকে ঐ বন্ধে তথায় যাইতে লিখিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, নোয়াখালী হইতে দিল্লীতে যাতায়াতেই অনেক দিন লাগিবে, এমতাবস্থায় মাত্র ৩।৪ দিনের জন্য আমার তথায় যাইতে ইচ্ছা হয় না। কারণ অত অল্পদিন থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া আসা আমার একেবারেই ভাল লাগিবে না, অথচ কার্য্যানুরোধে বন্ধের পর অফিস হইতে অনুপস্থিতি আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই পত্র লেখার কয়েক দিন পরেই প্রমথদা আমাকে সংবাদ দিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমি বোধ হয় বড়দিনের বন্ধে তাঁহার নিকট দিল্লী যাইব। সুতরাং ঠাকুরের কি ইচ্ছা তাহা উপলব্ধি করিতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমি অবিলম্বে দিল্লী যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। ৩।৪ দিন তথায় থাকিয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বিদায় গ্রহণ কালে, আমার মন অত্যন্ত বিষাদ ভাবাপন্ন হইল। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, 'কোন চিন্তা করিবেন না, কেবল উপস্থিত কর্ত্তব্য ও নাম করিবেন। আমি ত' আছিই।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টতঃ ক্রোধের ভাব যে কিছুই নহে, এবং তাঁহার বাক্য পালনে সামান্য অনবধানতাও যে অত্যন্ত গর্হিত, একবার পূজার বন্ধে তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সেবারও শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে দুর্গোৎসব সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শের জন্য ঐ সময়ে তিনি কটকে থাকায়, তথায় গিয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে কটকবাসী পরলোকগত গুরু-ভ্রাতা বামাচরণ দে মহাশয় আশ্রমের পূজায় এতই আনন্দ পাইয়াছিলেন যে দশমী দিন রওনা না হইয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া একদিন পরে রওনা হইতে ইচ্ছা করিলেন। ঐ কারণেই সেই বৎসর একদিন গৌণেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমাদের সঙ্গে আর একজন গুরু-ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র ভট্টও ছিলেন। কটক পৌঁছিয়া আমরা তিনজনেই যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদস্পর্শে ধন্য হইলাম। ঠাকুর তখনই বামাচরণ বাবুকে একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'আপনার না কাল উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল ?' বামাচরণ বাবু উত্তর করিলেন, 'আশ্রমে এমনই আনন্দ অনুভব করিলাম যে. আরও একদিন থাকার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহাতেই এরূপ গৌণ হইয়াছে।' তখন ঠাকুর বলিলেন, 'ঐ ভাবে একখানা চিঠি লিখিতে কী বাধা ছিল ? আমি আজই এই স্থান ত্যাগ করিব।' বামাচরণ বাবু অতি সহৃদয়, বন্ধু-বৎসল ও স্ফূর্ত্তিবাজ লোক ছিলেন। আমাদিগকে এবং ঠাকুরকে লইয়া কয়েক দিন আনন্দ অনুভব করিবেন, এই ইচ্ছাই তিনি পোষণ করিতেছিলেন। ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'শুভবাবু, এঁরা আসিয়াছেন, এমতাবস্থায় অন্ততঃ দুই চারি দিন না থাকিলে, আমরা মনকে কী ভাবে বুঝাইব ?' ঠাকুর বলিলেন, 'তাঁহারা কয়েক দিন আপনার বাসায় থাকুন, আমি

কিন্তু আজই যাইব।' ঠাকুর এই কথা বলামাত্র আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, 'কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবনে এক মুহূর্ত্তও না। আপনি রওনা হইলে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইব।' এই কথা শুনিয়া ঠাকুর এমন ভাব ধারণ করিলেন, যাহাতে মনে হইল যেন তিনি কয়েক দিন থাকিতে তখন রাজী হইয়াছেন এবং বামাচরণ বাবুও সানন্দে বহু মৎস্য ও তরকারী আদি আনাইয়া আমাদের ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া প্রায় বিকাল বেলা আমরা শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে বামাচরণ বাবু আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং অতি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিলেন, 'শুভদা ঠাকুর ত' চলিয়া যাইতেছেন'। আমিও আত ব্যগ্রভাবে উঠিয়া দেখি যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে এবং ঠাকুর বেশ একটু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইতেছেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিলাম, 'এখন কোথায় যাইতেছেন?' তিনি একটু রাগের ভাবেই বলিলেন, 'ষ্টেশনে যাইতেছি।' 'রাত্র সাড়ে আটটা ন'টায় ট্রেণ, এখন তথায় যাইয়া কি হইবে?' এই কথা বলিয়া আমি একটু জিদ করায় ঠাকুর আমাদের গুরুভ্রাতা শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় বৈঠকখানায় একটু বসিলেন। এদিকে বামাচরণবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই ঠাকুর কিছুই গ্রহণ না করিয়া অতি ব্যগ্রভাবে এবং ক্রোধভরে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, অত্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতেও সাহস করিতেছিলেন না। সন্ধ্যার একটু পরে তিনখানা ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য আনা হইলে, ঠাকুর তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'আপনারা গাড়ীতে যান, আমি হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাইব।' তাহাতে স্বভাবতঃই আমরা

বিস্মিত হইলাম এবং আমি জিদ্ করিয়া তাঁহাকে একখানা গাড়ীতে উঠাইলাম। পঞ্চাননবাবু তৎকালে রেলওয়ের টিকিট চেকার ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই আমাদের জন্য টিকিট কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুর গাড়ীতে যাইয়া উঠিলে আমি দেখিলাম যে, বামাচরণবাবু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, 'দাদা, আমার কোন অপরাধে একবার ঠাকুর আমাকে দুই বৎসরের জন্য দেখা দেন নাই। কোনস্থানে দর্শন করিতে গেলে, তথাকার গৃহস্বামী 'ঠাকুরের নিষেধ আছে' বলিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। আবার কত বৎসর দর্শন হইতে বঞ্চিত হই, তাহা তিনিই জানেন।' পরস্পর সেই সময় জানিয়াছিলাম যে, বামাচরণবাবুর একটি কন্যাকে ঠাকুর 'অষ্টসখীর এক সখী' বলিয়া খুব স্নেহ করিতেন, কিন্তু সেইদিন সেই মেয়েটিও ঠাকুরের নিকট কোন পাত্তাই পায় নাই। বামাচরণবাবুর, আমাদের বিবেচনায়, এইরূপ লঘুপাপে অত গুরুতর দণ্ড হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের তখন যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে আর কিছু বলিতেই সাহস করিলাম না এবং তিনি-ও সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন।

রেলগাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিলেন, 'একটু খাওয়ার জল দিতে পারেন?' ঠাকুর সাধারণতঃ কখনও আমাদিগকে আদেশ দিতেন না। তিনি জল চাহিলেন, অথচ আমি দিতে পারিতেছি না, এই অবস্থায় আমি নিজকে অত্যন্তই বিপন্ন বোধ করিলাম। বিশেষতঃ আমাদের কামরায় কটক ষ্টেশনে তথাকার বন্ধুরা অনেকগুলি ডাব দেওয়া সত্ত্বেও

আমি এমনই অকর্ম্মণ্য যে ঐ ডাব কাটিয়া তাঁহাকে জল দিতে পারিতেছি না'—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গাড়ী পরের ষ্টেশনে থামিলে, আমি লাফ দিয়া আমাদের কামরা হইতে নামিয়া শ্রীরামভট্ট মহাশয় যে গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীতে দৌড়াইয়া গেলাম। কারণ তিনি অত্যন্ত করিৎকর্ম্মা লোক, সুতরাং যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবেনই বলিয়া ভাবিলাম। কার্য্যতঃও তাহাই হইল। তিনি আমার কথা শুনা মাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া একটি ডাব গাড়ীর মেজেতে আছাড় দেওয়ায় জল বাহির হইতে লাগিলে, আমাদের সঙ্গের কাঁচের গ্লাস ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আবার নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। আমি ঐ গ্লাস শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে দেওয়া মাত্র তিনি জল পান করিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তখন হইতে কোন রাগের ভাবই দেখিতে পাইলাম না। আমিও একটু পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

প্রাতে ঘুম হইতে জাগিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "বামাচরণ বাবুরা গতকাল আপনার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন,"—ইত্যাদি। ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি কখনও তাঁহার উপর রাগ করিতে পারি? ঐরূপ না করিলে কি আসিতে পারিতাম?" সুতরাং তাঁহার ঐ স্থান ছাড়ার যেন বাধা না হয়, তজ্জন্য তিনি ঐরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন, ইহাই আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। কলিকাতা পৌঁছিয়াই আমি বামাচরণ বাবুকে ঠাকুরের কথা জানাইয়া পত্র দ্বারা আশ্বস্ত করিলাম। তৎপর দিনই ৺সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী রওনা হন। আমার দিল্লী অবস্থান কালে সেইবার এক অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। ঠাকুর চেয়ারে বসা থাকা অবস্থায় আমি ও সত্যেন বাবু সময় সময় তাঁহার দুই পায়ে হাঁটুর উপর

পর্য্যন্ত তেল মালিশ করিতাম। একদিন সন্ধ্যায় আমরা দুইজনে তাঁহার দুইপায়ে তেল মালিশ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল তাঁহার পা দু'খানা খুব ঠাণ্ডা এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ, অসাড় ও প্রাণহীন এবং শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে না। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কি ব্যাপার সত্যেন্দ্র বাবুর নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "ঠাকুর হঠাৎ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবেন যে আবার সকলই স্বাভাবিকভাব ধারণ করিবে।" তাঁহার নাকি ঐভাবের অভিজ্ঞতা অনেকবার হইয়াছে। আমরা ঐ অবস্থাতেও তেল মালিশ করিতেই লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত শব্দ করিয়া বলিলেন—"মালিশ হইয়াছে ত?" আমরা "হাঁা" বলিলেই ঠাকুর স্বাভাবিক ভাবে উঠিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত আমাদের ঠাকুর সকল সময়ই তাঁহার কোন শক্তি নাই এমন ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় চলাফিরা করিয়া তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই গোপন রাখিতেন। আমাদের ন্যায় যাহারা তাঁহাকে মানুষ ত' দূরের কথা, দেবতাদের অপেক্ষাও উচ্চ স্থান দিত, তাহাদিগকেও তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তাঁহার বেশী কোন শক্তি আছে, ইহা জানিতে দিতেন না। সকলের প্রতিই তিনি সমভাব পোষণ করিতেন এবং আচার ব্যবহারেও সমভাবই দেখাইতেন। কখনও তাঁহাকে কাহারও নিন্দা করিতে শুনি নাই। কিন্তু প্রয়োজন বোধে তিনি আমাদিগকে কখনও কখনও সাবধান করিয়াও দিতেন। তাঁহার দুইটি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে আরও দুইটি ঐধরণের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই "শা-সাহেব" নামক একজন মুসলমান ফকীর মাঝে মাঝে নোয়াখালীতে আসিতেন। তিনি খুব লম্বা, গৌরবর্ণ এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও বেশ স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায়ও অতি মাত্রায় সৌজন্যের ভাবই প্রকাশ পাইত। আমি মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি অনেক সময় ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর আদি স্থানে থাকিতেন। তাঁহার অনেক ভক্তও জুটিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ সকল স্থানের তাঁহার প্রতি এক সময়ে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কিছু কিছু নিন্দার কথাও প্রকাশ পাইতে লাগিল। এমন কি আমাদের নোয়াখালী শহরের একজন সাবজজও আমাকে গোপনে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমি নিজেও তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও আচরণে তাঁহার ন্যায় একজন সাধু ব্যক্তির নিকট যাহা আশা করি নাই, এইরূপ ভাব লক্ষ্য করি। আমার শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসার ২।৩ বৎসর পর 'শা সাহেব' নোয়াখালী আসিলে, আমি একবার মাত্র যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার কিছু দিন পরে ঐ ফকির সাহেব কেমন লোক শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন, 'উনি ভাল লোক।' আমি বলিলাম, 'তিনি যে, যে স্থানে থাকেন সে, সে স্থানের লোকেরা কিন্তু এখন তাঁহার সম্বন্ধে নিন্দার কথা বলে। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'তাহারা বোঝে না। তিনি ভাল লোকই।' এই কথায় আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে আমি অন্যায় করিয়াছি। কারণ শেষবার তিনি নোয়াখালী আসিলে, আমি একবার মাত্র তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি, আর যাই নাই।' তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'না

গিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। সাধু হইলে, সে আপনি-ই আসিবে!' ইহাতে আমার মনে হইল যে আমার মনে যেন নিন্দার ভাব না আসে সেই জন্যই ঠাকুর প্রথমতঃ দুইবার তিনি ভাল লোক ইহাই বলিয়াছেন এবং আমি যেন তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য ব্যগ্র না হই, সেই জনাই পরের কথাগুলি বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুবার আমাদের বলিয়াছেন এবং বেদবাণীর বহু পত্রে-ও লিখিয়াছেন—'না দেখিবে কারো দোষ, না করিবে কারে রোষ মনে প্রাণে আপনি হইবে সাবধান।'

শ্রীশ্রীঠাকুর যে বজরুকদের সকল সময়ই এড়াইয়া চলিতে আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এক বৎসর আমাদের নোয়াখালী শহরে একজন যুবক সাধু গিয়াছিলেন। ঘটনা চক্রে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতার বাড়ীতে তিনি উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ঐ সাধুটির ব্যবহার আমাদের ঠাকুরের ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আমরা অন্য যে কয়েকজন গুরুভ্রাতা তখন নোয়াখালী শহরে ছিলাম, সকলেই মনে মনে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলাম এবং আমাদের যে গুরুভ্রাতাটি তাঁহার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ ভ্রান্তিতে আমরা একটু দুঃখিতও হইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কয়েক দিন পরই দেখা হইলে আমি ঐ সাধুকে তিনি চিনেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর তাঁহাকে চিনেন না বলিয়া বলিলেন। আমি বলিলাম যে, তিনি অনেকেরই গুরু কি নাম দিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিতেন এবং তাঁহার অপেক্ষা

অনেক বেশী বয়সের ভদ্রলোকদেরও 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার সমক্ষেই একজন সাব্ জজ্‌কে বলিলেন, 'তোর ত' শিব।" এই কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'এ ত' ভাল না। এ ত' বুজরুক। একজনের মনের কথা বলিয়া দেওয়া ত' কিছুই নয়। একটু সামান্য প্রক্রিয়া করিলেই লোকের মনের কথা বলিয়া দিতে পারা যায়।" তিনি ঐ প্রক্রিয়ার কথা আমাকে তখন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ মনে না থাকায় এবং অনাবশ্যক বোধে আমি আংশিক ভাবেও তাহা প্রকাশ করিলাম না। বস্তুত পক্ষে ঐ সময়ে এবং পরেও ঐ সাধুর কথা ও আচরণ সম্বন্ধে আমি নিন্দনীয় অনেক কথা শুনিয়াছি এবং তাহার প্রভাবও নোয়াখালী হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে।

"আমি উপদেষ্টা নই। আমি দৃষ্টান্ত মাত্র"

শ্রীশ্রীঠাকুর দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই অনেক সময় বলিতেন, 'আমি উপদেষ্টা নই, আমি দৃষ্টান্ত মাত্র।' এবং কাহারও অনুরোধে কিছুক্ষণ কোন বিষয় বলিয়া শেষ করার সময় বলিতেন, 'আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।' তাঁহার উপদেশাবলী এতই উচ্চস্তরের ছিল যে, আমরা অতি নিম্নাধিকারী বলিয়া অনেক সময়ই তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তাঁহার কথা শুনিতে খুব ভাল লাগিত বলিয়াই যথাসাধ্য মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিতাম। শুনার পর তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইলেই তাহা পুনরাবৃত্তি

PRESENTED

করিতে কিন্তু কেহ সমর্থ হইতেন না। সুতরাং তাঁহারই কৃপায় তাঁহার দেহ ত্যাগের পর 'বেদবাণী' সঙ্কলিত হওয়ায় আমাদের তাঁহার উপদেশাবলী স্মরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করার সৌভাগ্য হইয়াছে। খুব নিবিষ্ট মনে সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া যদি কেহ তাহা বারংবার পাঠ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সান্নিধ্যে আমার ন্যায় নিম্নাধিকারী তাঁহার কথা শুনিয়া সত্যের ও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার যে সুযোগ পাইয়াছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ পাইবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত পত্রাংশগুলি যাহা তিন খণ্ড 'বেদবাণীতে' ছাপা হইয়াছে তাহাই আমাদের প্রধান সম্বল। বহুকাল আমি তাঁহার কথা শুনিয়া যে অতি সামান্য আলোক পাইয়াছি তদপেক্ষা অন্ততঃপক্ষে কিছু অধিক আলোকের আভাস 'বেদবাণী' বহুবার পড়িতে পড়িতে পাইতেছি বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কিন্তু কবে যে তাঁহার কথাগুলি বুঝিয়া এবং তদনুযায়ী চলিতে অভ্যাস করিয়া পূর্ণ আলোক পাইব তাহা তিনিই জানেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, "অভ্যাসে পঙ্গুভিঃ লঙ্ঘ্যতে গিরিং"। যদি অনবরত তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে, আমরা এক সময়ে যে নিশ্চয়ই পরমানন্দে আপ্লুত হইয়া তাঁহারই ভাষায় 'রসাম্বুদে' ডুবিয়া যাইতে পারিব, সে বিষয়ে তিনি বারংবার আশ্বাস দিয়াছেন। ইহাই এই অবিশ্রান্ত সুখ দুঃখের তরঙ্গে জড়িত জীবনে সান্ত্বনার প্রধান সম্বল সন্দেহ নাই। তাঁহার কৃপায় এই যাবৎ তাঁহার উপদেশের মূলতত্ত্ব নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহা প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইলেও

অতি সংক্ষেপে আমার এই স্মৃতিলিপি শেষ করার পূর্ব্বে বিবৃত করার ইচ্ছা রহিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টান্ত, যাহা আমাকে লক্ষ্য করিতে তিনি কৃপা করিয়া সুযোগ দিয়াছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি তাঁহার সঙ্গে আমার দীক্ষার পূর্ব্বে প্রথমে দুইদিন ফেনীতে দেখা করি। আমার বক্তব্য কি জ্ঞাতব্য কিছুই মনে উদয় না হওয়ায় তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেন নাই, যদিও বহুক্ষণ আমি একাই তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী জীবনেও যতদূর মনে হয় কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে বা না বলিলে, তিনি সাধারণ সৌজন্যের ভাবে 'কেমন আছেন'—ইত্যাদি ছাড়া কিছুই বলেন নাই। কিন্তু যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছি অথবা তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনিতে মনে মনে আগ্রহ অনুভব করিয়াছি, তখনই আমি বুঝি, আর না-ই বুঝি তিনি অনর্গল অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তও তাঁহার সান্নিধ্যে আগত ব্যক্তিদের প্রতিও ঐ একই ভাবের আচরণ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, তিনি নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা বলিতেন না এবং তাহাতে অপ্রত্যক্ষে আমাদিগকে অপ্রয়োজনে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাজে আলাপ ব্যবহারে যে ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে তাঁহার পত্রাবলীতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

বিনা প্রয়োজনে তিনি কখনও কোথাও যাইতেন না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অনেক অনুরোধ করিলেও তিনি হয়ত কোন কোন স্থানে যাইতেন না, আবার বিনা অনুরোধেও হঠাৎ কখনও কখনও ভক্তগণের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। আমার নিজের

ব্যক্তিগত ভাবে এই অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে ২।১টি ঘটনা বর্ণনা করিতেছি।

একদিন আমি আমার বৈঠকখানায় বসিয়া মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিলাম, যে একখানা ঘোড়ার গাড়ী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর নামিয়া আমার বৈঠকখানার দিকে আসিতে-ছেন। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম। দুই তিন দিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

আর একবার আমি আমার ভিতরের বাটীতে রাত্রে বসিয়া আছি এমন সময় হঠাৎ তৎকালে ফেনীর প্রফেসার প্রমথ দাদার "শুভদা, শুভদা" বলিয়া ডাক শুনিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সেইবারও কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঐ দুইবারই তিনি কেন যে আসিয়াছিলেন এবং কেনই বা অত সত্বর চলিয়া গেলেন তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং বুঝিতে চেষ্টাও করি নাই। এইরূপ ভাবে আরও বহুবার তিনি আসিয়াছেন ও গিয়াছেন, কিন্তু সঠিক বিবরণ মনে না থাকায় তাহা উল্লেখ করিলাম না।

অপর পক্ষে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি নোয়াখালীতে আসিতে রাজী হন নাই, তাহারও একটি দৃষ্টান্ত আমার ভালরূপে মনে আছে। এক বৎসর আমি পূজার কিংবা বড়দিনের বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে আমার পরলোকগত বন্ধু গুরুভ্রাতা সুরেশ চন্দ্র ঘোষ আমাকে বলিল, "তুমি বন্ধ হইলেই ঠাকুরের কাছে যাও এবং তাঁহার সঙ্গে অনেকদিন থাক বলিয়াই আমাদের অনুরোধ

সত্ত্বেও তাঁহাকে নোয়াখালী অসিতে বল না। এবার কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া অবশ্য অবশ্য সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়া আসও।” আমি উত্তর করিলাম, “ঠাকুর যখন আমাদের প্রয়োজন বোধ করেন. তখন নিজ হইতেই চলিয়া আসেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁহাকে আসার জন্য অনুরোধ করা সঙ্গত বোধ করি না।” সে তত্রাচ বিশেষ ভাবে পীড়াপীড়ি করায় সেইবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে নোয়াখালীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। ঠাকুর বলিলেন, “তথায় গেলে অনেক লোক ভিড় করিয়া দেখা করার জন্য গোলমাল করিবে। আমি এখন একটু নিভৃতে থাকিতে ইচ্ছা করি।” আমি বলিলাম, “আপনার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও ঘরে ঢুকিতে দিব না।” ঠাকুর একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “তাহা কি পারিবেন?” ইহার পর আর আমি এ বিষয়ে কোন জিদ্ করিলাম না এবং তিনিও আসিলেন না।

কোন সময়ই যে আমাদের অনর্থক বসিয়া থাকিয়া নানা চিন্তা ও জল্পনা কল্পনায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তাহারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। একমাত্র আপাতদৃষ্টিতে নিদ্রার সময় ব্যতীত তিনি প্রায় সকল সময়ই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্য বই কি পত্রিকা নিকটে না থাকিলে অন্ততঃ পক্ষে পঞ্জিকাখানি তাহাকে পড়িতে পড়িতে অনেক পাতা উল্টাইতে দেখিয়াছি!

তাঁহার নিজের প্রয়োজনে কাহাকেও কোন বিষয়ে আদেশ না দিয়া যথসাধ্য সকল কাজই তিনি নিজে করিতেন। অন্য কাহারও অপেক্ষায় থাকিতেন না। যদিও তিনি সকল সময়ই স্থির

থাকিতেন এবং কোন কারণেই চঞ্চল বা অস্থির হইতেন না, তিনি আলস্যগ্রস্ত হইয়াছেন এইরূপ অবস্থা আমার কখনও চোখে পড়ে নাই।

তিনি দৈনন্দিন জীবনে যে নম্রতা ও সৌজন্যের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত তাহার দুই একটী ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। একবার কিছুদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গে কাশীতে ছিলাম, সেই সময় তিনি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। ঐ সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া খবর দিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের কুলগুরুবংশের একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে এই সময় দেখা করিতে অনুমতি দিবেন কি না তিনি জানিতে চাহিলেন, ঐ কথা শুনা মাত্র ঠাকুর বলিলেন, "তিনি কেন আসিবেন? আমি নিজেই যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব।" তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া বলিলাম যে, তিনি ঐ অসুস্থ শরীর লইয়া কি করিয়া তথায় যাইবেন। বিশেষতঃ কাশীর বাঙ্গালীটোলার গলিগুলি এতই অপরিসর যে তাহাতে যানবাহন চলাচল একপ্রকার অসম্ভব। ঠাকুর বলিলেন যে, সে সকল কিছুরই প্রয়োজন হইবে না— তিনি হাঁটিয়াই সেখানে যাইবেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই যে দেহ একেবারে চলৎশক্তি রহিত বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, তাহা লইয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি তেতলা হইতে নামিতে ছিলেন, এমন সময় একটি ভক্ত তাঁহাকে ধরিয়া নামার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিলে, ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে নিষেধ

করিলেন এবং নিজেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিয়া পড়িলেন। কিছুদূর পথ হাঁটিয়া আবার এক দোতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া তাঁহার অপেক্ষা অনেক কম বয়স্ক ঐ দর্শনেচ্ছু ভদ্রলোককে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আবার হাঁটিয়াই তিনি নিজ বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি এবং আরও কয়েকজন ভদ্র-লোক ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে আপ্লুত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ঐস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

ঠিক এইভাবের ঘটনা চাঁদপুরেও হইয়াছিল বলিয়া আমার পরম ভক্তিভাজন নোয়াখালীর উকীল ৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। ঠাকুরের কুলগুরুবংশের আর একটি ভদ্র লোক ঠাকুর দর্শনে চাঁদপুর গিয়াছিলেন। তিনিও বয়সে ঠাকুর অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখামাত্র অতি নম্রভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঐ ভদ্রলোকটি চাঁদপুর হইতে নোয়াখালী আসিয়া আশুবাবুর বাড়ীতে এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া নিজেই ঐ ব্যাপারে অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ জগতে কেবল রাম ঠাকুরের পক্ষেই এইরূপ আচরণ সম্ভব"।

আর একটি ঘটনা যাহা একবার তাঁহার সহিত আমি ঢাকা থাকাকালে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা এস্থলে বিবৃত করি-তেছি। ১৩৬৬ সনে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ আমরা 'ব্রজধাম' নামক বাড়ীতে অবস্থানকালে পেন্সন প্রাপ্ত জজ ৺প্রাণকুমার বসু ঐ বাড়ীতে ২।৩ দিন আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি "মা আনন্দময়ীর" শিষ্য

ছিলেন। একদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন যে "মা" বিশেষভাবে ইচ্ছা করেন যে ঠাকুর যেন একবার তাঁহাকে দর্শন দেন। 'মা আনন্দময়ী' তখন ঢাকাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। ঠাকুর যাইবেন বলিয়া প্রকাশ করায় তিনখানা ঘোড়ার গাড়ী আনয়ন করা হইল এবং আমরা পরিবারবর্গ সহ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে 'মা আনন্দময়ী'র আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর মা আনন্দময়ীর নিকটে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, 'মা' বলিলেন, "বাবা আমি যেন দেখ্‌লাম তুমি জানালা দিয়ে আমাকে ডাক্‌ছ—চলে আয় চলে আয়! কেন এমনভাবে ডাক্‌লে"? —আরও কি কি বলিয়াছিলেন আমার ঠিক মনে নাই। ঠাকুর তদুত্তরে অনেকগুলি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কিছুই স্মরণ নাই এবং তখনও তাহা বিশেষ কিছু বুঝিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় নাই। 'মা আনন্দময়ী'র প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তিনি আরেকবারও চাঁদপুরে ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছিলেন এবং সেখানেও ঠাকুর ঐ ভাবেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। 'মা আনন্দময়ী' শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথ দর্শনের জন্য একবার পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্য-ধামেও পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কোন প্রয়োজন বোধ ছিল না তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। একদিন ঠাকুর একখানা মলিন এবং স্থানে স্থানে ফাটা বস্ত্র পরিধানে আমাদের নোয়াখালি বাসাবাটীতে উপস্থিত হন। ইহা দেখিয়া আমার স্ত্রী তখনই বলিয়া ফেলিল, "এবারত খুব ভাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।" তদুত্তরে

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ হাওয়া খেলে।" কেহ বদলাইয়া না দিলে তিনি কখনও আর একখানা বদ্‌লাইতেন না। ভক্তেরা আত্মতুষ্টির জন্য সময় সময় বহু মূল্যবান শাল চাদর কি বস্ত্রাদি দিলে তাহাদের মনের শান্তির জন্য দুই এক ঘণ্টা কি বড়জোর দুই একদিন পরিয়া তাহা অন্য কাহাকেও দিয়া দিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানেই থাকুন না কেন, কেহ এমন কি তাঁহার বিশেষ অনুগত ভক্তেরাও তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের বসার জন্য কোন আসন কি সতরঞ্চি আদি পাতিয়া দেওয়ার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন এবং সময় সময় তাঁহার নিজ বিছানায় বসার জন্যও অনুরোধ করিতেন। কাহাকেও খালি মেঝেতে বসিতে এবং ফলাদি কিছু প্রসাদ না নিয়া বিদায় লইতে দিতেন না।

তিনি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণকেও 'আপনি' ও 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করতেন। কাহারও প্রতি কখনও 'তুই' শব্দ ব্যবহার করিতে শুনি নাই। নেহাৎ অল্প বয়স্ক বালক-বালকাদিগকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাহাকেও কোনরূপ অশ্রদ্ধা করিতে, কি কাহারও প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে আমি শুনি নাই। কোন প্রসঙ্গ আলোচনার সময় কেহ তাঁহার কথা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কোন কথা বলিলে তিনি অতি স্নিগ্ধ মৃদু হাসিয়া 'আজ্ঞা' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া অতি নম্রভাবে তাহার কথা বুঝিয়া লইয়া তাহাকে জবাব দিতেন, তদবস্থায় কখনও বিরক্তির ভাব দেখা যাইত না, বরং তাহাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার নমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

তিনি কীর্ত্তনাদি খুব মনোযোগের সহিত শুনিতেন। কচিৎ প্রধান কীর্ত্তনীয়াকে কীর্ত্তন শেষে প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, কিন্তু কীর্ত্তনাদিতে কখনও তাঁহার ভাববিহ্বলতা দৃষ্ট হয় নাই, সকল সময় সমভাবেই থাকিতেন।

তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা কোন বাড়ীতে যাইতেন তাহাদিগকে বিশেষ আদর যত্ন না করিলে ঠাকুর সেই বাড়ীতে বেশী সময় থাকিতেন না। আমার এই অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে যে ঠাকুর তাঁহার প্রতি আদর অভ্যর্থনার বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গের লোক যাহাতে আহারাদিতে খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। সময় সময় কে কি খাইতে ভালবাসে তাহা বলিয়াও দিতেন, সঙ্গীয় লোকের মনে বিন্দুমাত্রও অশ্বস্তি হইবে বুঝিলে তিনি ঐ স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করিতেন।

এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতার খুব প্রসিদ্ধ ধনী এবং ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত আমাদের একজন গুরুভ্রাতার বাড়ীতে পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে আমিও পরলোকগত গুরুভ্রাতা জ্ঞান আচার্য্য মহাশয়ও গিয়াছিলাম। তথায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ঠাকুরের কথায় ও হাবভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে ঠাকুর হয়ত এ-বাড়ীতে দুই একদিন থাকিবেন। আমরা তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র গৃহস্বামী আমাদের সকলকেই যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিলেন এবং ভাল জলখাবারের ব্যবস্থা করিলেন। আমি মনে ভাবিলাম অন্ততঃপক্ষে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠাকুর সান্নিধ্যে দাদার সঙ্গে পরমানন্দে সেইদিন ঐ বাড়ীতেই কাটাইব। অনুমান ঘণ্টাখানেকের

মধ্যেও গৃহস্বামী আমাকে ও জ্ঞানদাদাকে সমস্তদিন ঐ বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ না করায় আমরা ঠাকুর হইতে বিদায় লইয়া যাওয়ার কথা বলিলে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমিও যাইব ;" এই কথা শুনিয়া বাড়ীর মালিক খুব ব্যস্তভাবে তাঁহাকে থাকার জন্য বিশেষ পাড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং আমরাও তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করিলাম। পরে ভদ্রলোক আমাদিগকেও থাকার জন্য যত্ন করিলেন, কিন্তু ঠাকুর আর কোন অনুরোধই মানিলেন না। একবার 'না' বলিলে আর কিছুতেই তিনি মত বদলাইতেন না। বস্তুতঃ-পক্ষে সাধারণ ভাবে চিন্তা করিলে ভদ্রলোকের ঐ সম্পর্কে বিশেষ কোনও অপরাধ ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে আমরা দুইজন চলিয়া গেলে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নিরিবিলি সমস্ত দিন ঠাকুরকে নিয়া পরমানন্দে থাকিতে পারিবেন। কিন্তু ঠাকুর সম্ভবতঃ আমাদের মনের কথা জানিয়াই তাহার ভোগ দেওয়ার প্রার্থনা আদি সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া আমাদের সঙ্গে চলিয়া আসিলেন।

আশ্রিত বাৎসল্য—একবার পূজার বন্ধে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ তৎকালীন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কলিকাতার বাসায় ঠাকুর আছেন জানিয়া আমি তথায় উপস্থিত হওয়ার দুই একদিন পরেই তিনি আমাকে ও বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার যাদবপুর আশ্রমের সেবাইত শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় সহ ঠাকুরকে লইয়া দেওঘরে তাঁহার নবনির্ম্মিত বাড়ীতে আসেন। তথায় আমাদের থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দুই তিন দিন পরেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া যান। তদবস্থায় ভুবনবাবুই তথাকার সকল

কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ঠাকুর প্রায় দিনই আমরা কোন সময় কি আহারাদি করি জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন প্রাতে আমরা কিছুই খাই নাই এবং দুধওয়ালা আসিলে পরে দুধ খাইব শুনিয়া বলিলেন পাচক ব্রাহ্মণকে দিয়া অন্ততঃপক্ষে কিছু হালুয়া ও লুচি প্রস্তুত করাইয়া আমরা প্রাতে যেন আহার করি, নচেৎ শরীর শুকাইয়া যাইবে।

সেখানে থাকাকালে ঠাকুর রাত্র ভোর হওয়ার অনেক পূর্ব্বে বিছানা ত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ আঙ্গিনায় যাইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেন। আমরা বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে গেলে আমরা কোনদিকে যাইতে চাই জানিয়া বেশ দ্রুতপদেই কয়েক মাইল হাঁটিয়া আমরা বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করি কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া, বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ইহাদ্বারা পরোক্ষে আমরা যেন সকল সময় ঐ প্রকার সঙ্গীয় অপরের মনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলি ইহাই শিক্ষা দিলেন।

কয়েকদিন পরে ঠাকুর হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় ভুবন বাবুকে যোগেশবাবুর বাড়ী ও তথাকার আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া আমাকে নিয়া কলিকাতায় পরাশর রোডে গুরুভ্রাতা শ্রীবীরেন ঘোষের বাড়ীতে আসেন। তথায় আসিয়াও আমাকে সঙ্গে নিয়া খুব ভোরে কলিকাতার পার্ক আদিতে বেড়াইতেন। ঐভাবে বেড়াইবার সময় একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। যদি তাঁহার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে পরদিন আর তিনি ঐ পার্কে বেড়াইতে না যাইয়া অন্যস্থানে যাইবেন বলিয়া বলিতেন। ইহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে তিনি গোপনেই থাকিতে চাহেন এবং হয়ত পরোক্ষে আমাকে একা বেড়ানই ভাল বলিয়া উপদেশ দিলেন।

পূজার বন্ধ শেষ হইয়া আসিলে আমি বাড়ী ফিরার জন্য অনুমতি চাহিলে, ঠাকুর অতি স্নেহভরে বলিলেন, 'আপনি চলিয়া গেলে আর কে আমাকে লইয়া বেড়াইবে। আমি এখন চোখে খুব কম দেখি, এমতাবস্থায় কে কলিকাতার জনাকীর্ণ যানবাহনের রাস্তা পার করাইয়া দিবে।' আমি নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে ভাবিলাম, যিনি এক মুহূর্ত্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থান দেখিতে পারেন তিনি আমার সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার রাস্তায় চলিতে পারিবেন না, এই কথা শুধু আমাকে খুসী করার জন্যই বলিলেন। আমাকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দেওয়ার জন্য এবং পূত স্মৃতির দ্বারা ভবিষ্যতে ঐ আনন্দে আপ্লুত করার জন্যই আমাকে নিয়া বেড়াইতেন, নচেৎ তাঁহার আমাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

আর একবার পূজার বন্ধে আমি ও প্রফেসার প্রমথ দা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে প্রায় তিন সপ্তাহ কলিকাতায় ১০ নং যদুলাল মল্লিক রোডে গুরুভ্রাতা শ্রীহরেন্দ্র কুমার সাহার বাড়ীতে ছিলাম। ঐ সময় ঠাকুর প্রাতে বিডন পার্কে আমাদিগকে সঙ্গে নিয়া বেড়াইতেন। তখন তাঁহার মুখে খুবই লালা সঞ্চয় হইত এবং বারংবার থুতু ফেলিতেন। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি থুথু কাঁটাগাছের ঝোপ আদি ছাড়া পরিষ্কার রাস্তায় কখনও ফেলিতেন না। অপরাহ্ন প্রায় তিনটার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরতেন। আমরা কোন কোন দিন ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে বেড়াইতে গিয়া ঐ বিরাট পার্কে দুই এক চক্কর দিয়া হয়রাণ হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়িতাম এবং তিনি আর এক চক্কর দিয়া তথায় ফিরিয়া আসিলে পুনঃ তাঁহার অনুগমন করিতাম। অতি

বৃদ্ধাবস্থায়ও তাঁহাকে কখনও শরীর এলাইয়া খুব আস্তে হাঁটিতে দেখি নাই, সকল সময় তাড়াতাড়িই চলিতেন।

এক বৎসর পূজার বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্তের বাড়ীতে অবস্থান কালে আমি তথায় গেলে ডাক্তার দা, তাঁহার স্ত্রী, চারপুত্র, পাচক, ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও আমার সঙ্গে ঠাকুরকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য কাশীতে পাঠাইলেন। তিনি কর্ম্মব্যস্ততার দরুণ আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। কাশীতে পৌঁছিয়া ঠাকুর আরও বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে মাথা এমনই গরম ও অস্থির বোধ করিলেন যে, ডাক্তার দাদার স্ত্রী অতি যত্ন সহকারে ঠাকুরের মাথায় বহুবার জলের ধারা দেওয়া সত্ত্বেও ঠাকুর দোতলা হইতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়া নীচে জলের কলের নিকট যাইতে উদ্যত হইলে শ্রদ্ধেয়া দিদি, মায়ের ন্যায় জড়াইয়া ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন। ঐ সময় দুই তিন দিন ডাক্তার দাদার স্ত্রী এবং আর একজন ভদ্রমহিলার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সারারাত্র জাগিয়া সেবা শুশ্রূষা দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ ভদ্রমহিলাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৈধব্য অবস্থায় "মা আনন্দময়ীর" সঙ্গিনী ও সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষারূপে 'পুরী'তে দেখিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, তিনি 'মা আনন্দময়ী'র শিষ্য পেন্সানপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন শশাঙ্ক বাবুর মেয়ে বলিয়া জানিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুস্থতার ঐ কয়দিন আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই অসহায় অবস্থা হইতে ত্রাণের জন্য মনে মনে তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিতেছিলাম। তিনি আমাদের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া বিনা ঔষধেই হঠাৎ সুস্থ হইয়া আমাদিগকে নিয়া পুনঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

খুব কষ্ট করিয়া কেহ ঠাকুরের সেবা করুক, ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। একবার বড়দিনের বন্ধের পূর্ব্বে ফেনী হইতে প্রমথ দা আমাকে জানাইলেন যে, ঠাকুরের চোখে ছানি পড়িয়াছে। তাহা কাটাইবার জন্য আমাদের উভয়কে ঢাকায় গুরুভ্রাতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসা হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে হইবে। তদনুযায়ী আমরা উভয়ে ঐ বাসা বাটীতে উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁহারা ঢাকার খুব ভাল ভাল মিষ্টি দিয়া আমাদের আপ্যায়িত করিলেন। ঐ সুস্বাদু মিষ্টিগুলি আস্বাদনের সময় আমার মনে হইতেছিল যে, এই সঙ্গে মিষ্টিশূন্য নিম্‌কি আদি কিছু থাকিলে ভাল হইত। ঠাকুর তখন চোখে প্রায় কিছুই দেখিতেন না। তদুপরি যে কামরায় তিনি ছিলেন তথা হইতে আমরা যেখানে বসিয়া খাইতেছিলাম সে স্থান যদিও একেবারেই দেখা যাইতেছিল না, ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "কেবল কতগুলি মিষ্টি কি খাওয়া যায়? অন্য কিছু সঙ্গে থাকা উচিত।" ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিয়া ভাবিলাম আমার অতিমাত্রায় তৃপ্তি অভিলাষী দুর্ব্বল মনের চিন্তাই ঐ বাড়ীর লোকদের অতি সাদর আতিথেয়তা সত্ত্বেও একটু দুঃখের কারণ হইল।

ঠাকুরের চোখের ছানি কাটাইবার জন্য তিনি কলিকাতায় যাইবেন এই কথা তথাকার ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ জানিয়াছিলেন, যদিও ঐ বিষয় একেবারেই যেন গোপন থাকে ইহাই ঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত কোনও প্রকারে এই কথা জানিতে পারিয়া চক্ষু অপারেশনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহার বাড়ীর একটী কামরায় ঐ কার্য্য খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট খরচ করিয়া তাড়াতাড়ি সকল রকমের ব্যবস্থা করিয়া

রাখিয়াছিলেন। আমরা কলিকাতায় পৌঁছার পূর্ব্বেই ঠাকুর আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার চক্ষু অপারেশন যেন কোনও নিভৃত হাসপাতালে হয় এবং দুই, তিন জন ভক্ত ছাড়া (যাঁহাদের নাম তিনি বলিয়াছিলেন) অন্য কেহ, বিশেষতঃ উপরোক্ত ডাক্তার দা যেন না জানিতে পারেন, এমতাবস্থায় কলিকাতা পৌঁছিয়া আমরা বিষম সমস্যায় পড়িলাম। কিন্তু পরম দয়াল ঠাকুরের কৃপাতেই তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী গোপনে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে অপারেশন অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল এবং ঠাকুর অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া হাসপাতাল ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেন যে এইরূপ গোপনের ব্যবস্থা করিয়া অনেক ভক্তের, বিশেষতঃ ডাক্তার দা ও তাঁহার স্ত্রীর, মনে কষ্ট দিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমার মনে হয় ডাক্তার দা তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী সারাদিন ও সমস্ত রাত্র জাগিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া অসুস্থ হইবেন ভাবিয়া, ঠাকুর ঐ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ডাক্তার দাদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হওয়া অবধি আমি তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়েরই খুব স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে খবর না দেওয়ায় অন্ততঃপক্ষে কিছুদিনের জন্য ঐ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের দরুণ তাঁহাদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়া ছিলাম। ঐ প্রকার ভাব যে হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই কিছুটা অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু গুরুবাক্য অবহেলার মহাপাপ ইচ্ছা করিয়া ঘাড়ে নিতে সাহস করি নাই।

১৩৩৭ সনের ১৫ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুর পাহাড়তলী কৈবল্যধামে প্রবেশ করার পর প্রতিবৎসরই আমরা যেন ৺দুর্গাপূজার সময় যথাসম্ভব সকলে কৈবল্যধামে মিলিত হই এই ইঙ্গিত ঠাকুর স্বয়ং দিয়াছিলেন এবং

১৩৩৮ সন হইতে তথায় প্রতিবৎসরই দূর্গাপূজা বেশ আড়ম্বরের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম তিন বৎসর দেশাচার মতে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করা হইয়াছে, কিন্তু তৎপর হইতে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের মূর্ত্তিতেই যথাসাধ্য শাস্ত্রীয় সমস্ত মন্ত্র আচার বিধি ও নিয়মাদি পালন করিয়া ঐ পূজা সম্পন্ন করা হয়। আমি ঐ বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই কৈবল্যধামে পূজা সমাপনান্তে দশমীদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ স্পর্শ করার জন্য রওনা হইতাম এবং তাঁহার শ্রীদেহ ত্যাগের ছয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (যে সময়ে তিনি চৌমুহনীতে ছিলেন) প্রায় বৎসরই সমস্ত বন্ধ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে ঘুরিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতাম, জানিনা কি কারণে এক বৎসর তাহার ব্যত্যয় হইয়াছিল। সেই বৎসর ৺বিজয়া দশমী দিন ফেনীতে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ৺সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসাবাটীতে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দুই একদিনের মধ্যেই তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার সঙ্গে কোনও দিকে রওনা হইব বলিয়া আশা করিয়া ছিলাম। কিন্তু ঠাকুর সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা না করায় সমস্ত বন্ধই তাঁহার সঙ্গে ঐ বাসাতে কাটাইয়া আমি নোয়াখালীর দিকে রওনা হইলাম এবং ঠাকুরও অন্যত্র চলিয়া গেলেন। যদিও সেবার বন্ধে নানাস্থানে যাওয়ার আমার প্রবল ইচ্ছায় বাধা পড়িল, কিন্তু প্রায় সকল সময় ঠাকুরের পবিত্র সান্নিধ্য হেতু এবং সুরেশ দা ও তাঁহার পত্নীর অসাধারণ উদার ও বর্ণনাতীত স্নেহযুক্ত আচরণে ও তাঁহাদের কন্যা শ্রীমতী বকুর সেবা ও যত্নে অত্যন্ত আনন্দেই সেই বন্ধ কাটাইয়াছিলাম, সুরেশবাবু তখন ফেণীতে সাবডেপুটী কালেক্টর ছিলেন এবং তথায় "সঙ্কলন" পুস্তকটি প্রথম মুদ্রিত করেন।

আর একবৎসর পূজার বন্ধে কিন্তু সময় সময় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া থাকা সত্বেও অন্যান্য বৎসরের অবিচ্ছিন্ন আনন্দ হইতে কিছুটা বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সেই সময় ঠাকুর ঢাকার পোষ্ট মাষ্টার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। পূজা উপলক্ষে অফিস বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলাম যে, ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তথায় আছেন এবং মাধব বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও সঙ্গে কথাও বলেন না এবং দেখাও দেন না। এই অবস্থায় তথায় যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা ইতস্ততঃ করিয়া মাধববাবুকে এক পত্র দিলাম। তদুত্তরে মাধব বাবু আমাকে জানাইলেন যে, আমি একা যেন বিজয়া দশমীর দিন আশ্রম হইতে ঢাকা রওনা হইয়া আসি এবং অন্য কেহ যেন ইহা জানিতে না পারেন, ঠাকুর এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তদনুযায়ী আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি চিরন্তন ভাবেই আমাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া প্রাণে খুবই ব্যথা পাইলাম। ঢাকার ভক্তেরা সময় সময় আসিয়া অনেক দূর হইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করা কি কথা শুনা দূরে থাকুক, তাঁহাকে দূর হইতে দর্শনের সৌভাগ্য হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ সময় যে কামরায় থাকিতেন তাহার দরজা প্রায় সকল সময়ই বন্ধ থাকিত। অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া দর্শন লাভে অসমর্থ হইয়া সময় সময় মাধববাবুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদও করিত। আমার নাম উল্লেখ করিয়াও এক ভদ্র মহিলা একদিন বলিয়াছিলেন যে যদি সকলের পক্ষেই দর্শন নিষিদ্ধ হয়

তাহা হইলে 'উনি কি করিয়া এখানে আছেন ও দর্শন পান।' এই প্রকার বাদানুবাদের ফলে এবং আমার সহৃদয় ঢাকার বন্ধুগণ, যাঁহাদের সঙ্গে বিকাল বেলা বেড়াইতে যাইতাম এবং যাঁহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ ভোজনাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তাঁহারাও ঠাকুর দর্শনের সুযোগ না পাওয়ায়, কিছুদিন পরেই তথায় আমার আর খুব বেশী দিন থাকা সঙ্গত হইবে না বলিয়া মনে হইতেছিল। বিশেষতঃ অন্যান্য বন্ধে যে ভাবে ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াইবার সুযোগ পাইতাম এবং তাঁহার কথা শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ পক্ষে যতদূর মনে হয় মাধববাবু ও তাঁহার স্ত্রী ঠাকুরের শরীরে ঔষধ মালিশ করিতে দিনে মাত্র দুইবার ঠাকুরের কামরায় প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহার ঔষধ মালিশ করায় আমিও তাঁহাদের সঙ্গে তথায় যাইয়া বসিয়া থাকিতাম। সকলেই সম্পূর্ণ নীরব থাকিতাম। এতদ্ব্যতীত কাহাকেও ঐ কামরায় প্রবেশ করিতে দেখি নাই। বাড়ীর মালিকদের যথেষ্ট আদর যত্ন সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে আমার ক্রমশঃ একটু খারাপই বোধ হইতে লাগিল, কারণ আমার তথায় অবস্থানের দ্বারা ঠাকুর দর্শনেচ্ছু বিফল মনোরথ বাহিরের ভক্তগণের মনের ব্যথা বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। সকল দিক চিন্তা করিয়া পূজার বন্ধ শেষ হওয়ার ৫।৬ দিন পূর্ব্বেই ঐ স্থান ত্যাগ করার অনুমতি চাহিলে ঠাকুর সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রেল ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য গাড়ী উপস্থিত হইলে, ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় এক সমস্যায় পড়িলাম। ঠাকুর বলিলেন, 'আর কয়েকটা দিন থাকিলে হয় না ?' এই কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে আমার চোখে একটু জল আসিল

এবং অত্যন্ত হতভম্বের ভাবে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, গাড়ী আসিয়াছে, হয়ত মালপত্রও উঠিয়াছে। ঠাকুর আমার এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা তবে আসুন গিয়া।' এই দোদুল্যমান ভাব নিয়াই সেইবার বিদায় গ্রহণ করিলাম। অনেক বন্ধুই ঠাকুরের সঙ্গে পরমানন্দে কাটাইবার সৌভাগ্য তিনি দিয়াছেন এবং বন্ধের একদিনও বেশী হাতে রাখিয়া তাঁহার পবিত্র মধুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সেই বার কেন এইরূপ হইল তাহা ঠাকুরই জানেন। হয়ত কোনও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার তথায় অবস্থিতির বিষয়ে জানিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কায় তিনি দালানের ছাদের উপরও ঐ সময়ে বেড়াইতেন না বলিয়া মাধববাবু আমাকে বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতি অর্চ্চনা করিতে করিতে মনে হইল যে একবার তাঁহার সঙ্গে সিলেট জিলার অন্তর্গত পৃথ্বীমপাশা গ্রামে যাইয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। পরম ভক্তিভাজন গুরুভ্রাতা জ্ঞান আচার্য্য মহাশয় তথাকার মুসলমান জমিদারের ষ্টেটে তখন সার্ভেয়ারের কাজ করিতেন এবং তাঁহারই নিকট আত্মীয় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীধীরেন্দ্রকুমার আচার্য্য ঐ সময়ে ঐ ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। জ্ঞান দাদার মত ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত খুবই বিরল। তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতি ধৈর্য্যশীল ও সকল অবস্থায় স্থির ও প্রফুল্ল চিত্ত ব্যক্তির সঙ্গলাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ আদর যত্নে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না থাকা সত্বেও ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সেবার জন্য অপ্রত্যাশিত

ভাবে খুব ভাল ভাল জিনিষ পত্র জুটিয়া গিয়াছিল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে আর একজন অতি সহৃদয় বিনয়ী এবং প্রাণভরা স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ গুরুভ্রাতা শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। তিনি তৎকালে কুলাউড়ার রেল ষ্টেশন বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সারাজীবন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করা সত্ত্বেও তিনি কখনও অন্যায়ভাবে কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং রেল কোম্পানী হইতে প্রাপ্ত বেতনেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই খ্যাতি তিনি বিশেষভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

আর একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমি ও গুরুভ্রাতা ডাক্তার অনন্ত কুমার সেন সিলেট জিলার অন্তর্গত রাণীবাড়ী চা বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পরলোকগত গুরুভ্রাতা অতি মিষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট ও বিনয়ী ডাক্তার ক্ষিতিভূষণ সেন ঐ চা বাগানের মালিক ছিলেন। তথায় অবস্থানকালে ঠাকুর সান্নিধ্যে তথাকার ভক্তদের সঙ্গে আলাপে ও ডাক্তার অনন্তবাবুর সঙ্গে চা বাগানের অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া খুবই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এই ক্ষিতিবাবুর সাগ্রহে প্রদত্ত জমিতেই যাদবপুর শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত মৈমনসিংহ জিলায় কণ্ট্রাক্টারের কাজে নিযুক্ত থাকা কালে বেশ আড়ম্বরের সহিত পঞ্চম দোল উৎসব ঐ শহরে সম্পন্ন করিতেন। এক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ উৎসবে উপস্থিত থাকিবেন জানিয়া আমিও তথায় গিয়াছিলাম। ঠাকুর তখন একটু অসুস্থ থাকায় ভক্তগণের ঐ ঘরে বেশী যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। যে দুই, তিন দিন সেখানে ছিলাম, আমি উৎসবের

নানা হৈ চৈ এমন কি কীর্ত্তনাদি হইতেও যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ঠাকুরের সান্নিধ্যে অনেক সময় থাকার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। খুব সম্ভবতঃ সেইবার প্রথম পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনলিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তদবধি তাঁহার ও তদীয় ভক্তিমতি সরলা ও স্নেহশীলা পত্নীর সহিত ক্রমশঃ আমার ঘনিষ্টতর পরিচয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও আমাদিগকে কোন নিয়ম কানুনের বা বিধি নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করেন নাই, স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারেই চলিতে দিতেন। একবার তাঁহার সঙ্গে কাশীতে অবস্থানকালে আমার পূর্ব্ব পরিচিত একজন প্রৌঢ়া বিধবা ভদ্রমহিলা আমাকে একবেলা আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে আমি ঠাকুরের অনুমতি লইয়া মধ্যাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে আহার করি। তিনি খুব যত্ন করিয়া নানা ব্যঞ্জন আদি দ্বারা আমার ভূরি ভোজন করাইয়া আমাকে বেশ নরম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করায় আমি আলস্য বশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলাম। জাগিয়া উঠিয়া বেলা প্রায় শেষ হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটে আসিলে ঐ বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, আমার ফিরিতে গৌণ হওয়ায় ঠাকুর খুবই ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া অনেকবার আমি ফিরিয়া আসিয়াছি কিনা এই সংবাদ নিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে আমি এই অনিচ্ছাকৃত গৌণের জন্য খুবই লজ্জা বোধ করিয়াছি ও দুঃখিত হইয়াছি। পরে চিন্তা করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আমার পক্ষে ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই সঙ্গত ছিল। যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা তাঁহার নিকট ঐ গৌণের কারণ নিশ্চয়ই অবিদিত ছিল না। তিনি

ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণে আমাকে সম্মতি দেওয়ার সময় ঐ স্থানের পরিস্থিতি ও সবই জানিয়াও আমার ভোজনের লিপ্সায় বা সৌজন্যে বাধা দেন নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ঐরূপ অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখাইয়া প্রকারান্তরে আমাকে তথায় পুনরায় যাইতে বারণ করিলেন। বস্তুতঃপক্ষে আমি আর কখনও তথায় যাই নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অতি স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, সৌম্য, মূর্ত্তি দর্শনে ব্যক্তি মাত্রই আকৃষ্ট হইত এবং সাময়িকভাবে হইলেও আনন্দে আপ্লুত হইত। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার বাক্যের প্রতি অমনোযোগ কিংবা অবহেলার ভাব দেখিলে তিনি খুব অল্প সময়ের জন্য হইলেও অন্ততঃ পক্ষে বাহ্যিকভাবে মহামুনি দুর্ব্বাসার মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। তখন তিনি বিশেষ কিছু না বলিলেও ঐ ভক্তের বাক্য স্ফুরণের শক্তি থাকিত না। তাঁহার সাময়িক ঐ মূর্ত্তি ধারণ যে ভক্তের অশেষ মঙ্গলেরই জন্য তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত আমার ঠাকুর দর্শনে একবার কটক ভ্রমণ বৃত্তান্ত উপলক্ষে উল্লেখ করিয়াছি। ঐরূপ আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত এ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আমার প্রথম সংস্পর্শের পর হইতে তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বৎসর তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ও স্নেহ যে কত পাইয়াছি এবং কত স্নিগ্ধ, মধুর সম্ভাষণে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু প্রারব্ধানুযায়ী যে কোনও লোকের কথার পৃষ্ঠে অহেতুক কথা বলার হীন অভ্যাসের দরুণ একবার তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি আমার নিজ সম্পর্কে দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার কয়েক বৎসর পর আমি একবার কলিকাতা

গেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবাকারী ভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার আমাকে বলিলেন যে "শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিনের জন্য একাকী খুব নিভৃত স্থানে আছেন। ঐ স্থান ভক্তদের মধ্যে প্রায় কেহই জানেন না এবং তথায় যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, কিন্তু আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে তথায় নিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন।" আমি তৎক্ষণাৎ অক্ষয় বাবুর সঙ্গে ঐ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে স্থানটী যেমন দুর্গম তেমন শ্রীশ্রীঠাকুর যে কামরায় বসিয়া আছেন তাহা আলোছাড়া দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি তথায় যাওয়ামাত্র ঠাকুর বলিলেন আশ্রমের রিজার্ভ ফাণ্ড আরও বাড়াইতে হইবে। তদুত্তরে আমি বলিলাম যে "এখন প্রায় (২৭) সাতাইশ হাজারের মত হইয়াছে।" তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'সাতাইশ হাজারে কি হইবে—অনেক বাড়াইতে হইবে।' এই কথা শুনিয়া আমি এমনই অপদার্থ যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রকৃতিগত চিরন্তন অভ্যাস বশতঃ বলিয়া ফেলিলাম—আশ্রমের প্রারব্ধে থাকিলে হইবে', যদিও জীবনে আর কখনও তাঁহার কোনও কথার উপর এভাবের কোন কথা বলিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কথার উত্তরে অবহেলাব্যঞ্জক ঐ কথা শুনিয়া ঠাকুর একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, 'আপনি যখন আশ্রমকেও প্রারব্ধের মধ্যে ফেলিতেছেন, ঐ আশ্রমের সঙ্গে কোন সংশ্রব আমার রাখার দরকার নাই। আশ্রমসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে এবং কাগজপত্রে আমার নামের পরিবর্ত্তে আপনার কি শ্যামের (তৎকালীন মোহন্ত) নাম লেখাইয়া নিবেন,' ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য আর কি বলিয়াছিলেন আমার মনে নাই, আমি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ ও স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলাম

কেনই বা এই 'প্রারব্ধ' শব্দটা ব্যবহার করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংশ্রবে আসার পূর্ব্বে আমি ত এই শব্দটা জানিতাম না। তাঁহার শ্রীমুখে এই শব্দ বহুবার শুনিয়া আমার মনে ইহা এমনই আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে আমি স্থানে অস্থানে উহা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহা হউক, এখন আর কোন কথা বলার সাহস না পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। নোয়াখালী পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঠিক ঐ ভাবের খুব রাগের পত্র পাইলাম। আমার উত্তর দেওয়ার পর কি তৎপূর্ব্বেই বোধ হয় ঐ ভাব প্রশমিত হইল, কারণ তৎপরে দেখা হইলে পূর্ব্ববৎই করুণার দৃষ্টি ও ব্যবহার তাঁহার নিকট পাইয়াছি। কিন্তু আমি এমনই প্রারব্ধের দাসানুদাস যে তাঁহার ঐ আদেশ সত্ত্বেও আমি ভবিষ্যতে ঐ আদেশ পালন করিতে সমর্থ হই নাই, যদিও পরম দয়াল ঠাকুর আমার অশেষ মঙ্গলের জন্যই আমাকে ঐ আদেশ দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উপরোক্ত স্মৃতি আমার প্রগলভতার ভাবকে সময় সময় একটু প্রশমিত করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আমার প্রতি আদিষ্ট কাজ আশাতীত ভাবে শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সুসম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমার এই বিষয় অপরাগতার কথা অনেক সময় মনে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দ্বারা ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে ভাবিয়া প্রাণে শান্তি পাই এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হই। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সংক্রান্ত চারটী আশ্রমেরই প্রধান অধিনায়ক। তাঁহার অনন্য চিন্তায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আশ্রম-

গুলির কিভাবে অতি দ্রুত গতিতে সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে পরে উল্লেখ করার ইচ্ছা রহিল।

আরও দুইবার পত্রে আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমার দীক্ষা গ্রহণের প্রায় দুই বৎসর পর যখন আমার স্ত্রী সাংঘাতিক ভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া পরে ক্রমে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন তাহাকে এক বৎসর আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত মহাশয়ের চট্টগ্রামের বাসায় থাকার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আদেশ দেন। ঐ রেলওয়ে কোয়ার্টারটী অতি প্রকাণ্ড একটী দীঘির পাড়ে অবস্থিত ছিল এবং কর্ণফুলী নদীও দক্ষিণধারে অতি নিকটেই ছিল। ঐ একবৎসরের মধ্যেই ঠাকুরের অনুমতি লইয়া আমি ডাক্তার দেখাইবার জন্য তাহাকে বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় নিয়া যাই। তথা হইতে ফিরিবার সময় চাঁদপুর হইতে অল্প দূরে জাহাজ চরাতে আটকিয়া যায় এবং সন্ধ্যার অল্প পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নদীর মধ্যেই পড়িয়া থাকে এবং প্রাতঃকালে অন্য একখানা জাহাজের সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হইয়া আমাদিগকে চাঁদপুর পৌঁছাইয়া দেয়। তথা হইতে আমাদের সোজা চট্টগ্রাম যাওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে চট্টগ্রামের গাড়ী পাওয়া যাইবে না বলিয়া আমরা নোয়াখালীতে নিজ বাসাবাড়ীতে পৌঁছিলাম। পূর্ব্ব রাত্রের ক্লান্তি নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ শিশুদের বিশ্রামের জন্য, অল্প কয়েকদিন নোয়াখালীতে থাকা অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভৎর্সনা মূলক পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ শিশুগণসহ আমার স্ত্রীকে চট্টগ্রাম পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ঐ পত্র হইতে ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে প্রায় অনিচ্ছাকৃত অবস্থায়ও গুরুবাক্য সামান্য অবহেলাও নেহাৎ গর্হিত কার্য্য।

এই ঘটনার অনেক বৎসর পর শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যন্ত ক্রোধ-ব্যাঞ্জক আর একখানা পত্র পাইয়াছিলাম। আমার স্বভাব সুলভ গভীরতা এবং ধৈর্যশক্তির অভাবই ঐ পত্রের কারণ ছিল, যাহা সকলের নিকটেই গোপন রাখা সঙ্গত এমন কোন বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে একখানা পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ পত্রের লেখা স্থানে স্থানে এমনই অস্পষ্ট ছিল যে আমি ঐ পত্রের প্রধান কথাটাই ঠিক ভাবে পড়িতে সমর্থ হই নাই। তদবস্থায় কোন magnifying glass আদির সাহায্যে আমার পড়িতে চেষ্টা করা সঙ্গত ছিল। আমি তাহা না করিয়া যে বাড়ী হইতে ঠাকুর ঐ পত্র দিয়াছিলেন তাহার মালিক ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং অনেক সময় তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত পরম স্নেহভাজন শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদারকে ঐ অস্পষ্ট কথাটী কি তাহার কিঞ্চিত আভাস দিয়া সম্ভব হইলে তাহা সঠিক জানাইতে ও অবিলম্বে ঠাকুরের তৎকালীন ঠিকানা জানাইতে পত্র দিয়াছিলাম, তাহাকে ঐভাবে পত্র দিলে কোন অন্যায় হইবে তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও মনে করি নাই। কিন্তু ঠাকুর ঐ পত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া আমাকে অত্যন্ত ক্রোধ ভরে পত্র দিলেন যে তিনি আর কখনও আমাকে ঐভাবের পত্র দিবেন না, কারণ আমি ঢেঁড়রা দিয়া গোপন কথা প্রকাশ করি ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে শ্রীমান মাধবের ন্যায় ভক্ত ঐসম্বন্ধে কিছুই জানে না এবং ঐ বিষয়ে কিছু আভাস পাইলে অত্যন্ত অন্যায় কিছু হইবে। যাহা হউক, ঐ সম্পর্কে ভবিষ্যতের জন্য খুবই সাবধান হইলাম এবং খুব অনুতাপ করিয়া দুই, একখানা পত্র দেওয়ার পর তিনি আবার স্বাভাবিক অতি শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর ভাব ধারণ করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন শেষবার নোয়াখালী শহরে পদার্পণ করেন সেই বারও এইধরণের একটী ঘটনা হইয়াছিল, তিনি ঐ সময়ে আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন, সুতরাং অন্যান্য বারের ন্যায় আমার ঠাকুর ঘরে না থাকিয়া নানা সুবিধার জন্য অন্য একঘরে অবস্থান করিলেন। অসুস্থতার দরুণ সেবার অল্প সময়ের জন্যও অন্য কোনও বাড়ীতে যাইতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। এমতাবস্থায়ও মাইজদী গ্রামবাসী আমাদের গুরুভ্রাতা ৺যোগেন্দ্রকুমার মিত্র ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমাদের বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিছুতেই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। প্রথমতঃ ঠাকুর তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করায় আমরা মনে করিলাম তিনি কিছুতেই অন্যত্র যাইবেন না। আমি স্নানাদি করিয়া অফিসে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় শুনিলাম ঠাকুর অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিতেছেন, "যেখানে নিতে চান, সেখানেই যাইব" ইত্যাদি বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গমনোন্মুখ হইলেন এবং অফিসে যাওয়ার জন্য আমার গাড়ী প্রস্তুত থাকায় অতি দ্রুতবেগে ঐ গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম এবং অফিসে না যাইয়া মাইজদি মিত্রদের বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইতে বলিলাম। তথায় পেঁৗছিয়া ঠাকুর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং যোগেন্দ্রবাবু উৎসবের জন্য খিচুড়ী আদি ভোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রান্নার গৌণ হইবে মনে করিয়া আমি তৎকালীন মাইজদি ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ঐ বাড়ী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মাইজদী ষ্টেশনে আসিয়া পেঁৗছিলাম।

তথায় উক্ত মাষ্টারবাবু ও তাঁহার পত্নীর ঐকান্তিক আগ্রহে ও যত্নে

অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া মাত্র গাত্রোত্থান করিয়াছি এমন সময়ে মিত্রদের বাড়ী হইতে একজন লোক আসিয়া অতি সন্ত্রস্তভাবে আমাকে সংবাদ দিল যে, ঠাকুর মহাশয় তখনই ঐ বাড়ী ছাড়িয়া ষ্টেশনে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং আমাকে খুঁজিয়া আনিতে বলিতেছেন। আমি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে, ঠাকুর তাহাদের দালান হইতে বাহির হইয়া উঠানে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখামাত্র ঠাকুর বলিলেন—'আমি এখনি ষ্টেশনে যাইব।' আমি বলিলাম এখনও গাড়ী (ট্রেন) আসার অনেক গৌণ আছে। ইহা বলা সত্ত্বেও ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্রবাবু, 'এখনও ঠাকুরের ভোগ হয় নাই এবং আমরাও একটুও প্রসাদ পাই নাই' ইত্যাদি বলিয়া অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করায় এবং এই সময় ঠাকুর ও আমরা চলিয়া গেলে ঐ বেচারীর সমস্ত উৎসব পণ্ড হইয়া যাইবে ইত্যাদি অনেক কথা আমি বলায় ঠাকুর পুনঃ আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অতি শীঘ্র আমাকে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। আমি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সামান্য কিছু খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের নিকট আসা মাত্র তিনি মাইজদী ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলেন। ঐ বাড়ীতে যে কয়েক ঘণ্টা ছিলেন, তিনি এক বিন্দু জলও গ্রহণ করেন নাই। এমন কি ঔষধ সেবন করিতেও অস্বীকার করিয়াছেন। মাইজদী ষ্টেশন মাষ্টারের বাসায় আসিয়া ঠাকুর পুনঃ তাঁহার স্বাভাবিক অতি শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং মাষ্টার দম্পতির ভক্তিভরে দেওয়া ডাবের জল ও দুধ আদি সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরম শান্তি দিলেন।

পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম প্রতিষ্ঠার ২।১ বৎসর পর

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত কলিকাতার উপকণ্ঠে, ঢাকুরিয়াতে একখানা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা করেন এবং তাঁহারই অনুমতি লইয়া একখানা গোলপাতার ছাউনির বেশ বড় ঘর নির্ম্মাণ করেন। উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘরে প্রবেশ করেন। ঐদিন তথায় কীর্ত্তন ও ভোগআদির যথা-নিয়মে ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথায় কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের পর ঠাকুর ভক্তদের মধ্যে একজনকে নিকটে ডাকিয়া প্রস্তাব করেন যে, কাশীবাসী একজন প্রায় নব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু অসিতানন্দ ব্রহ্মচারীকে যেন তাঁহারা স্থান দেন এবং তাঁহার বালবিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী যেন তথায় থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করে। সেই ভদ্রলোক তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী কেন ঐ ভদ্রলোকের সেবা করিবে ? তিনি ঠাকুরের ঐ বাক্য পালন করিতে পারিবেন না বলায় ঠাকুর অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—'এই আশ্রম ভূতের আশ্রম, তাহাদের খেলা কৌতুকের স্থান' ইত্যাদি বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ঘর হইতে বাহির হইয়া যান। হঠাৎ ঠাকুরের এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হইল। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিছু বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিতে সাহস পাইল না। ঠাকুর চলিয়া যাওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই উৎসবানন্দের স্থান নিরানন্দ ও বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া চিরতরে ভূতের স্থানে পরিণত হইল এবং ঐ প্রস্তাবিত আশ্রম সংশ্লিষ্ট সকলেরই আশ্রম সম্পর্কীয় সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল হইল।

এই ঘটনার বৎসরেক পরে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া ঐ আশ্রমের স্থানেরই অতি নিকটবর্ত্তী মতিবাবুর ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে গেলে কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া ঐ আশ্রমের স্থান দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাহিলে

তিনি আমাকে তথায় যাইতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিলেন। মতিবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ গোলপাতা ঘরখানা তখনও খালি অবস্থাতেই পড়িয়াছিল।

উপরোক্ত মতিবাবু, যিনি এক সময়ে বহুবাজার ষ্ট্রীটের 'সত্য-নারায়ণ ভাণ্ডার' নামীয় কাটা কাপড়ের দোকানের মালিক ছিলেন এবং যাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তৎকালে ঠাকুরের বহুভক্ত তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছে, যাঁহার সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্টতা এতই গভীর বলিয়া প্রতীয়মান হইত যে আমি মনে মনে তাঁহাকে নন্দরাজ ও তাঁহার স্ত্রীকে যশোদারাণী বলিয়া অভিহিত করিতাম, তিনিও সময়ের দোষে একবার ঠাকুরের কথা অবহেলা করায় অন্ততঃ পক্ষে বাহ্যিকভাবে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে মতি বাবুর আর্থিক অবস্থাও ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল। একবার আমি শ্রীশ্রীঠাকুর সহ সত্যেন্দ্রবাবুর ২০ নং সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়ীতে থাকা কালে সত্যেন্দ্রবাবুর নিকট মতিবাবু ঠাকুর দর্শনে ও নানা কারণে অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে কাল কাটাইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়ায় ঠাকুরকে মতিবাবুর বাড়ীতে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প হইলাম, কারণ মতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর অতি মধুর সস্নেহ আতিথ্য আমি কয়েকবারই গ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর একবার 'না' বলিলে কিছুতেই সহজে 'হাঁ' বলেন না ইহা জানা সত্বেও সভয়ে অতি বিনীতভাবে একবার অল্পসময়ের জন্য হইলেও মতিবাবুর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি প্রথমতঃ একটু অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া, পরে রাজী হইলেন। আমি

অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে আর একজন ভদ্রলোক সহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে মতিবাবুর ঢাকুরিয়া বাড়ীতে নিয়া যাই। অনেক দিন পরে ঠাকুর দর্শন পাওয়া সত্ত্বেও মতিবাবু কি তাঁহার স্ত্রীর কোনও ভাব বিহ্বলতা দেখিতে পাইলাম না। তাঁহারা যেন কিছুক্ষণ নিরিবিলি বসিয়া আপন মনে প্রাণ খুলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে এবং কিছুটা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি ঐ বাড়ীর নিকটস্থ পূর্ব্ব বর্ণিত ঢাকুরিয়ার গোলপাতার ছাউনির আশ্রম ঘর দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি না পাওয়ায় মতিবাবুর নিকটেই বাধ্য হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঐ সময়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা প্রায় কিছুই হইল না। অল্পক্ষণ তথায় বসিয়া ঠাকুর পুনঃ আমাকে সঙ্গে করিয়া সত্যেনবাবুর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা না মানিয়া নিজেদের সীমাবদ্ধ মন ও বুদ্ধির আওতায় পড়িয়া আরও অনেক ভক্তের নানা ভাবে মানসিক অশান্তি ভোগ করার বিষয় অনাবশ্যক বোধে এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতে আমার মনে হয় যে, ঠাকুর আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে গুরুবাক্য আমরা বিন্দুমাত্রও যেন অবহেলা না করি। যদি এক চুলও তাঁহার কথার ব্যতিক্রম করিয়া নিজ বুদ্ধি পরিচালনা করি, তবে পরিণামে দুঃখ ও অশান্তি অনিবার্য্য। তিনি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। আমরা প্রকার অনুযায়ী কর্ত্তা সাজিয়া মায়াময় জগতে অতি সীমাবদ্ধ ভ্রান্তমন ও বুদ্ধির দাস হইয়া কেবল দুঃখ ভোগই বৃদ্ধি করি। গুরুবাক্য অতি নিখুঁতভাবে পালনের যথাসাধ্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলস্পদ সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সকলের প্রতি সমভাব

আমরা দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আদর অভ্যর্থনায় কি আচার ব্যবহারে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি তাঁহার আচরণে কোনও তারতম্য বা পার্থক্য ছিল না। ব্যক্তি-মাত্রের প্রতিই যে তিনি সমভাবাপন্ন এবং কল্পনাতীত দয়ালু ও সেবা-পরায়ণ ছিলেন, তাহার দুইটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। কামাখ্যায় তাঁহার অল্প বয়সেই প্রথম গুরুদর্শন হইলে তিনি বহু বৎসর গুরুদেবের সঙ্গে হিমালয় আদি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে গুরুদেবের আদেশে পুনঃ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তৎপর তাঁহার গ্রামস্থ একজন ওভারসিয়ারের সঙ্গে তাহার পাচক হইয়া নোয়াখালী আসেন। কিছুদিন পরে ফেনীতে যে জেল-খানা প্রস্তুত হইতেছিল তাহার সরকার হইয়া ফেনী আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২৬।২৭ বৎসর। কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন ঐ সময় ফেনীর সাবডিভিসানাল অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত "আমার জীবন" গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে ঐ বয়সেই নানা অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া এবং তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—'পর সেবায় তাহার পরমানন্দ। জেলখানার ইটখোলার গৃহে পাবলিক ওয়ার্ক প্রভুদের বারাঙ্গনাগণ কখন পালে পালে উপস্থিত হয়. কিন্তু রামঠাকুর তাহাদের ঘৃণা করা দূরে থাকুক বরং সন্তোষের সহিত নিজে রাঁধিয়া তাহাদের অতি যত্নে আহার করায় এবং মাতাল হইয়া পড়িলে তাহাদের আপন মাতা কি ভগিনীর মত শুশ্রূষা করে।"

ইহার কিছুদিন পর ঠাকুর আবার নিরুদ্দেশ হইয়া নানাস্থানে নানা-ভাবে ভ্রমণ করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে বিক্রমপুর ফিরিয়া আসেন। সেই সময় প্রায় তিন বৎসর তিনি ঢাকা জিলার রাজাবাড়ী থানার অন্তর্গত বেরপাড়া (বেহেরপাড়া) গ্রামের শ্রীসুধীর কুমার সারখেলের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে বাস করিয়াছেন। ঐ বাড়ী হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে বাহেরক গ্রামে ৺সত্যরঞ্জন গাঙ্গুলীর ও ৺জ্ঞান আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ছিল। উক্ত সত্যরঞ্জন গাঙ্গুলীর কাকা মনমোহন গাঙ্গুলী অতি দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া তাহাকে গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র সাব্যস্ত করিয়া সমাজচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার কার্য্যস্থল ঢাকা সহরে একটি বারবণিতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সে তাহার বাড়ীতেই বহু বৎসর যাবৎ কালাতিপাত করিতেছিল, দেশের আত্মীয় স্বজন কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিত না। প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে সে ভীষণ রক্তামশায় রোগে আক্রান্ত হয়। তখন একেবারেই সহায় সম্বল বিহীন অবস্থা হওয়ায় কোথায়ও যাওয়ার তাহার শক্তি ছিল না। ক্রমে তাহার মরণোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া ঐ মেয়েটি মনে মনে স্থির করিল যে, মনমোহন গাঙ্গুলীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহাকে রাখিয়া আসিলে নিশ্চয়ই কেহ না কেহ দয়ার্দ্র-চিত্তে তাহার শেষ সময়ের ক্রিয়া আদি সম্পন্ন করিবে। এই চিন্তা করিয়া সে অতি কষ্টে উক্ত মনমোহন গাঙ্গুলীকে তাহার বাড়ীর নিকটস্থ ভোমতাতা নামক কোন বৈষ্ণবের আখড়ার জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া যায়। ঐ আখড়াবাসীরা তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাদের ঘরে আশ্রয় দেয়। ক্রমে গ্রামবাসীরা সকলেই এই সংবাদ পায়। কিন্তু তাহার জন্য সহানুভূতি হওয়া দূরে থাক বরং নাসিকা কুঞ্চন করিয়া

অনেকেই, এমন কি তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যরঞ্জনও, "যেমন কর্ম্ম তেমন ফল', ইত্যাদি নানাকথা বলিয়া তাহার নিকটে গেলেও মহাপাপ হইবে মনে করিয়া দূরে সরিয়া থাকে। ঠাকুর, (তখন তাঁহাকে সকলে "রামসাধু" ডাকিত) এই সংবাদ পাইয়া সত্যরঞ্জন বাবুকেও নানাভাবে বুঝাইয়া ঐ আখড়ায় নিয়া যান এবং উভয়ে মিলিয়া অতি কষ্টের সহিত সযত্নে সত্যরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে একখানা ছোট ঘরে স্থান দেন। ঐ ঘরে থাকিয়া ঠাকুর প্রায় তিন মাস কাল এই মৃত্যু শয্যায় শায়িত রক্তামাশয়ের রোগীর দিবারাত্রি সর্ব্বপ্রকারের সেবা পরিচর্য্যা একাকীই সম্পন্ন করেন। তাহার দেহত্যাগ হইলে স্থানীয় একটি লোকও তাহাকে স্পর্শ করিতে রাজী না হওয়ায়, ঠাকুর ও উক্ত সত্যরঞ্জন বাবু নিজ হাতে আম গাছ কাটিয়া যথানিয়মে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করেন

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে সময়ে মনমোহন দেহত্যাগ করে ঠিক ঐ সময়ে তাহার অতি নিকটস্থ প্রতিবেশী নানা শাস্ত্রবিদ, অহরহ গীতা ও চণ্ডীপাঠক এবং জ্যোতিষী হেমচন্দ্র আচার্য্যও দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শশ্মানে বহুলোক সমবেত হইয়া খুব আড়ম্বরের সহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু মনমোহনের শশ্মানে ঠাকুর ও সত্যবাবু ছাড়া আর কেহই যায় নাই।

উক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। জ্ঞান দাদা জানিতেন যে, আত্মা দেহ ত্যাগ করিলে কি অবস্থায় আছে ইহা গোপনে জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিতে সক্ষম ছিলেন। জ্ঞানদাদা ঠাকুরকে একই সময়ে মৃত এই দুই ব্যক্তির দেহত্যাগের

পরের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, মনমোহনের আত্মা মুক্ত হইয়াছে, তাহার আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না। কিন্তু হেম বাবুর আবার জন্ম হইবে।

উপরোক্ত ঘটনার কথা খুব সম্ভবতঃ আমি জ্ঞানদার মুখে এবং অন্য কাহারও মুখেও বহুবৎসর পূর্ব্বেই শুনিয়াছি, কিন্তু তখন কিছুই লিপিবদ্ধ করার কি স্মরণ রাখার প্রয়োজন বোধ না করায় লোকের ও স্থানাদির নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবার পাহাড়তলী কৈবল্যধাম আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় প্রথম হইতেই নিত্যসেবাপরায়ণা শ্রীশ্রীঠাকুরের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীপ্রিয়ভাষিনী দিদির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা কালে তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া তাঁহারই সমক্ষে এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি ঐ ঘটনার সময় ঐ সকল বাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী তাঁহার পিত্রালয়ে থাকায় স্বয়ং সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেকোনও কাজই হেয় মনে করিতেন না, তাহার তুইটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উক্ত প্রিয়ভাষিণী দিদির মুখে শুনিয়াছি। উপরোক্ত শ্রীসুধীর সারখেলের বাড়ী থাকাকালে ঠাকুর স্বহস্তে তাহাদের ঘরের মূলীবাশের দোহারা একখানা বেড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ বেড়ার জন্য তরজা করা হইতে সমস্ত কাজই তাঁহাকে নিজহাতে করিতে প্রিয়দি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সুধীর বাবুদের বাড়ী পদ্মানদীতে ভাঙ্গার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ বেড়াখানা শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন রূপে তাঁহারা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ঐ সমসাময়িক কালে ঠাকুর কিছুদিন ধলছত্র গ্রামের পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ বক্তা ৺তারকচন্দ্র সাংখ্য সাগর মহাশয়ের বাড়ী অবস্থান কালে

তাঁহাদের অজ্ঞাতে তাঁহাদের বাড়ী হইতে প্রায় তিনমাইল দূরবর্ত্তী হাট হইতে নিজে কাঁধে করিয়া আধমণ ওজনের চাউলের বস্তা সাগ্রহে নিয়া আসিয়াছিলেন। এই খবর পাইয়া প্রিয়ভাষিণী দিদির পিতার গুরু ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপরোক্ত সাংখ্য সাগর মহাশয়কে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমি শালগ্রাম দিয়া বাট্না বাট'। তাহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত সলজ্জভাবে দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাদের সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ঐ বোঝা বহন করিয়াছেন।

ঠাকুর এইভাবে কোনও ভক্তের বাড়ীতে থাকাকালে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধাদি আনিয়া দিতেন বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আমার দেখা না হওয়ায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র স্মৃতি উদ্‌যাপন করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার অসীম কৃপা ও আশ্রিত বাৎসল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শোভা কলিকাতায় ১৯৪৪ সনে (১৩৫০ বাং সনে) বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে জ্বরাক্রান্ত হয়। তথা হইতে বাড়ীতে আসিয়া মাসেক চিকিৎসায়ও জ্বর উপশম না হওয়ায় ১৩৫১ সনের বৈশাখ মাসে আমার স্ত্রী, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যা সহ তাহাকে পুনঃ কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়া যায়। সেখানেও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন এবং ডাঃ অমল রায় চৌধুরী আদি বিখ্যাত ডাক্তারদের চিকিৎসায়ও রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়ায় তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাহারা সকলেই দেওঘর যায়। এদিকে আমি ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া তাহাদের সঙ্গী হইতে না পারায় উদ্বিগ্নচিত্তে স্কুলের ছাত্রী

আমার তিন কন্যা সহ নোয়াখালী সহরে ৺দুর্গাপূজার বন্ধের প্রতীক্ষায় রহিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ বন্ধ আরম্ভ হওয়ার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আমি ব্যবসাক্ষেত্রে অত্যধিক পরিশ্রম ও মেয়ের অসুখের দুশ্চিন্তার দরুণ কাম্‌লা (Jaundice) রোগে আক্রান্ত হই এবং রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমতঃ চক্ষু ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ হয়, পরে শরীরের ঘাম আদি পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হইয়া গেঞ্জি আদি ও হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল এবং ঔষধ পত্রে-ও কোনরূপ প্রতিকার হইতে ছিল না। পাহাড়তলী কৈবল্যধামে দূর্গাপূজা আরম্ভ হওয়া হইতে প্রতিবৎসরই পূজার সময় পরিবারের সকল সহ পরমানন্দে পূজা সমাপনান্তে দশমীদিন ঠাকুর যেখানেই থাকুন না কেন আমি তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতাম। ঐবার ভীষণ রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল দেহ ও তিন কন্যা নিয়া দেওঘরের পথে পূজার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে কৈবল্যধাম পৌঁছিলে মন অত্যন্ত বিষন্ন হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতি আমাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। কেবল মনে হইতে লাগিল যে ঐবার বন্ধে ঠাকুরের সঙ্গ করা দূরে থাকুক, দশমীর পর যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত হইব। কারণ তাঁহার তৎকালীন ঠিকানা জানিলেও তিন কন্যা সঙ্গে লইয়া ও ঐ রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া আবার দেওঘর যাওয়া সম্ভব হইবে না। এই সকল চিন্তা আমাকে খুবই উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং আশ্রমে উপস্থিত বন্ধুগণও আমার রোগক্লিষ্ট চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ আশ্রমে পত্র আসিল যে, ঠাকুর সপ্তমী পূজার দিন প্রাতের গাড়ীতে চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া পূজার সময় গুরুভ্রাতা ৺বিধুভূষণ বসুর বাড়ীতে

থাকিবেন। এই সংবাদে আশ্রমস্থ সকলেই পুলকিত হইল এবং আমিও যথেষ্ট শান্তি পাইলাম। ঐ দিন প্রাতের গাড়ীতে চট্টগ্রাম যাইতে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতেও পাইয়াছিল।

খুব সম্ভবতঃ অষ্টমী পূজার দিন আশ্রমে পূজা উপলক্ষে আগত কয়েকজন ভক্ত চট্টগ্রাম সহরে বিধুবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ স্পর্শ করেন। তাহাতে ঠাকুর একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন "পূজার মধ্যে মাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন ?" তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া এই কথা বলায়, আর কেহ দশমীর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে তথায় দেখা করিতে যায় নাই। ঠাকুরের এই মত আমার পূর্ব্বেই জানা থাকায় পূজা শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা হয় নাই এবং কাম্‌লা রোগে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে রোগের কথা জানাই নাই। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি সবই জানেন সুতরাং পত্রদ্বারা জানাইবার কোনও প্রয়োজন নাই, পূজার কয়দিন ঠাকুরের একনিষ্ঠ মুসলমান ভক্ত আমাদের শ্রদ্ধেয় চেরাগালী ভাই জঙ্গল হইতে আটক্ষীরা গাছের শিকড় আনিয়া অতি যত্নের সহিত বাটিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

বিজয়া দশমী দিন বিধুবাবুর বাসায় যাইয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে তিনি চিরন্তনভাবে 'কেমন আছেন' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিছুটা দুঃখ ও অভিমান মিশ্রিতভাবে বলিলাম 'আপনি ত সবই জানেন।' তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বে যেন কিছুই জানিতেন না এইরূপ বিস্ময়াপন্ন ভাব দেখাইয়া বলিলেন, 'এ আবার কি ?' আবার তখনই বলিলেন—'এ ত কিছুই নয়। একদিন আটক্ষীরা গাছের শিকড়ের ছাল একসের খাঁটি গরুর দুধে

ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আর কিছু না খাইয়া কেবল ঐ দুধের দধি খাইলেই সারিয়া যাইবে। রাত্রে যাহা ইচ্ছা খাইতে পারেন।' তিনি কথা প্রসঙ্গে আমার মেয়ে তখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই জানিয়া তাহাকে "কুমারেশ" সেবন করাইতে ও তাহার পেটে "ক্ষতারী" মালিশ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি আশ্রমে আসিয়া ঐ নির্দ্দেশই যথাসাধ্য পালন করিয়া প্লেনে মেয়েদের নিয়া দেওঘরের পথে কলিকাতায় পৌঁছিলে আমার নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার পরম স্নেহাস্পদ নিকট আত্মীয় শ্রীমান অরুণচন্দ্র রায় (যে এখন কলিকাতায় জুনিয়ার হিসেবে খ্যাতির সহিত ব্যারিষ্টারী করিতেছে) খুব জেদ করিয়া আমার রোগ তথাকার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন দ্বারায় পরীক্ষা করায়। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'এইরূপ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াও আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে কিরূপে অত সবল আছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।' আমি মনে মনে ভাবিলাম ঠাকুরই আমাকে সারাইয়া দিয়াছেন, আপনাকে দেখান ত সম্পূর্ণ নিরর্থক। তৎপর আমি খুব শান্তির সহিত দেওঘরে পূজার ছুটির বাকী কয়দিন কাটাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে নোয়াখালী ফিরিয়া যাই। কামলা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বহুলোকে হয়ত ভবিষ্যতে অনেক দিন ভুগিয়া চিরতরে আমার স্বাস্থ্যহানি হইবে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরম দয়াল শ্রীগুরুর কৃপায় অতি সহজেই বিষম ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। অন্য কোনও বৎসরই ঠাকুর এইভাবে পূজার সময় চট্টগ্রামে আসেন নাই। আমাকে শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক নানাপ্রকার দুশ্চিন্তার কবল হইতে উদ্ধার করার জন্যই তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে

হঠাৎ চট্টগ্রাম আসিয়া আমাকে শ্রীচরণ স্পর্শের সুযোগ দিয়াছিলেন তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই, কারণ ঐ সময় ঐরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কেহই খুঁজিয়া পায় নাই। তিনি এভাবে না আসিলে নানা দুশ্চিন্তায় আমার যে কি শোচনীয় অবস্থা হইত তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

আম দেওঘরে পৌছিয়া জানিলাম যে আমার মেয়ে শোভার ঐ সময়েও একটু একটু জ্বর হয়। আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তারের ও দেওঘরের অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন, যিনি আমার মেয়েকে তথায় চিকিৎসা করিতেন, তাহাদের ঔষধ বন্ধ করিয়া দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশানুযায়ী "কুমারেশ" সেবন ও পেটে "ক্ষতারি মালিশের ব্যবস্থা করিলাম। তাঁহার অপার কৃপায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়া আমার কন্যা সম্পূর্ণ নিরাময় হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সময় সময় কথা প্রসঙ্গে বলিতেন যে, ভক্তিভরে ফটো (চিত্রপট) পূজা করিয়া ভোগ নিবেদন করিলে ঐ চিত্রপটই ভোগ গ্রহণ করেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত আমি ও আমার বাড়ীর কোন কোন লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

আমরা প্রায় ৩৫ বৎসর যাবৎ আমাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে চিত্রপট পূজা করিতেছি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম যে ঐ চিত্রপটে শ্রীশ্রীঠাকুরেব মুখের পাশে যেন খাওয়ার কি জিনিষ লাগিয়া আছে। আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিয়াও ঐ চিত্রপটের আয়নার উপরে বা নীচে ঐরূপ বেশ একটু বড় চিহ্ন হওয়ার কোন কারণই লক্ষ্য করিতে পারি নাই, কিছুক্ষণ পরে ঐ চিহ্ন আপনা আপনিই মিশিয়া গেল, পরে আর

কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার দ্বারা আমাদিগকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে চিত্রপটও ভোগ গ্রহণ করেন।

ঐ চিত্রপট সম্বন্ধে আমরা আরও দুই একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ করি।

আমার বড় মেয়ে অতি মারাত্মক টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইলে সেদিন ভাগলপুর হইতে আমাদের যাওয়ার জন্য টেলিগ্রাম পাইলাম, ঐদিন প্রাতে আমি পূজা করিতে বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট আপনা আপনি বসা হইতে আস্তে আস্তে দুইবার আসনে শুইয়া গিয়াছিলেন, ঐরূপ পড়িতে তৎপূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই। ঐ দিন টেলিগ্রাম পাইয়াই আমি ভাগলপুর রওনা হইলাম। আমি তথায় যাওয়ার ১৫।১৬ ঘণ্টা পরেই আমার মেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

আর একবার আমি চৌমুহনী ষ্টেশন হইতে নোয়াখালী সহরে ফিরিবার কালে ঐ ষ্টেশনে আমার এক ভাগিনেয়কে হোটেল দেখাইতে চৌমুহনী ষ্টেশন ইয়ার্ডে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিবার সময় এক কয়লা ফেলার গভীর গর্ত্তে হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিলাম। তাহাতে আহত হইয়া আমার পরিধানের বস্ত্র একেবারে রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও অত বেশী রক্তপাত হইয়াছিল যে আমার ঐ কাপড়ের উল্টাদিক পরিয়া ট্রেনে উঠিতে হইয়াছিল তত্রাচ আমার শরীরে কোন ব্যথা পাইয়াছি বলিয়া মনে হইল না। বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম যে ঐদিন বিকাল বেলাও ঠাকুরের চিত্রপট ঐ ভাবেই আসনে শুইয়া পড়িয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, ঠাকুরের চিত্রপট ঘামাইতে আমার বাড়ীর লোক দুই,

তিন বারই প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং প্রতিবারই ঐ সময় আমাদের কিছু না কিছু বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে। ঐ ঐ বিষয় সঠিক মনে না থাকায় এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না। একবার আমার কন্যা শ্রীমতী মৃণ্ময়ী চৌমুহনীতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঐ ভাবে চিত্রপট ঘামাইবার বিষয় বলায় তিনি ঠাণ্ডা সরবৎ, ডাবের জল ইত্যাদি ঠাকুরের ভোগে বেশী করিয়া দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চারিটি আশ্রম

শ্রীশ্রীঠাকুরের চারিটি আশ্রমের মধ্যে তিনটি তাঁহারই নির্দ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অপরটি তিনি দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ অধিক ছয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্থানে বাস করিতেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রথমটি পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম সহরের উপকণ্ঠে পাহাড়তলীতে "শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম" নামে প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়টি কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম নামেই অভিহিত। ঐটির প্রতিষ্ঠার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে ঐটি পাহাড়তলী কৈবল্য-ধামের শাখা স্বরূপই থাকিবে। তৃতীয়টি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান পূর্ব্ব-বঙ্গের ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ডিঙ্গামাণিক গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বসত বাটীতে 'শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ সেবামন্দির নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থ আশ্রমটি নোয়াখালী জিলার চৌমুহনী নামক স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে নির্ম্মিত হওয়ায় উহা 'সমাধি আশ্রম' নামে পরিচিত। এই চারিটী আশ্রমেরই বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান আধনায়ক পাহাড়তলী

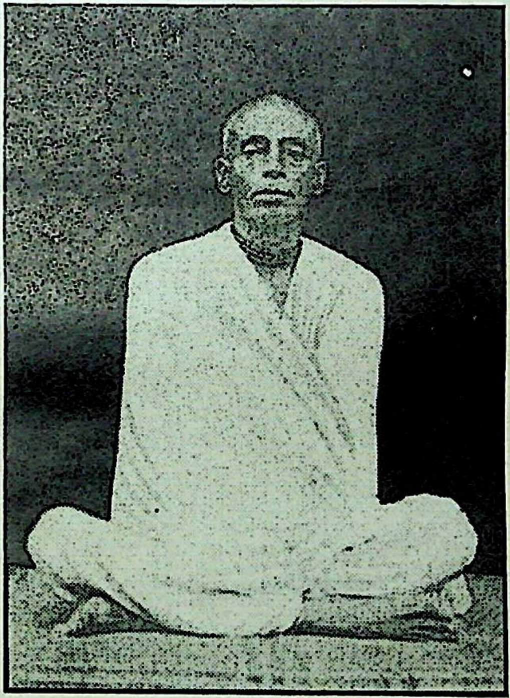

কৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী সকল আশ্রমেরই কাজ কর্ম্ম চলিতেছে। প্রত্যেকটি আশ্রমের সহিতই ঠাকুর প্রথম হইতেই দয়া করিয়া আমাকে সংশ্লিষ্ট রাখায় আমি সংক্ষেপে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটির প্রতিষ্ঠা হইতে ক্রমোন্নতি ও বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রম—পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

প্রথম আশ্রম পরিকল্পনা হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৩৩৭ বাং সনের ১০ই শ্রাবণ ছোট একটি পাহাড়ের উপর ঘন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের মধ্যে একখানা টিনের ঘরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং ঐ সনের ১৫ই ফাল্গুন দুই কোঠা বিশিষ্ট পাকা ঠাকুর মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ এবং ১৩৩৮ বাং সনে ঐ আশ্রমে প্রথম দুর্গাপূজা হওয়ার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ঐ সনে শ্রীমান অখিল চন্দ্র রায়, শ্রীমণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত, আমার দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত প্রমুখ ভক্তগণের উদ্যোগে এবং তৎকালীন চট্টগ্রাম পোর্টের সুপারভাইজার শ্রীসুরেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে নাটমন্দির ও তৎপূর্ব্বদিকের পুরুষ ও মহিলাদের লম্বা যাত্রীনিবাস ও তৎপূর্ব্ব ধারের Retaining Wall (দেওয়াল) প্রস্তুত হয়। সেই সময় ঐ পাহাড়ের চারিধারের জঙ্গলাদি কাটিয়াও রাস্তা করিয়া অনেকটা পরিষ্কার করা হয়। ঐ বৎসরই আশ্রমের পাহাড় সংলগ্ন উপরের পাহাড়ের হিংস্র জন্তুর বাসস্থান ঘন জঙ্গল পরিস্কার করিয়া এবং কর্ণেলের কুঠী নামে পরিচিত তৎকালে বৃহৎ বৃক্ষাদিদ্বারা ঢাকা খুব পুরাতন একখানা

দালানের ভগ্নাবশেষ অতিকষ্টে পরিষ্কার করাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট এখন যে দোতলা বাড়ীটি অবস্থিত আছে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। এই পাহাড় দুইটীর তিনদিকেই সেই সময়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ এবং কিছু দূরে দূরে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ ছোট ছোট পাহাড় ছিল যাহা তৎকালে বাঘ, বরাহ, বানর ও হরিণ আদির স্বচ্ছন্দে বিচরণের স্থান ছিল। কেবল দক্ষিণ দিকে অতি নিকটে বড় বড় গর্জ্জন তালসর বৃক্ষ ও ঘন জঙ্গলাবৃত একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের উপর চট্টগ্রামের উকিল ৺রজনী সেন মহাশয়ের একখানা খুব ছোট টিনের বাংলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক তাহা খরিদ করিয়া উপরোক্ত ছোট ঘরখানা এবং ঐ পাহাড়ের সমস্ত বৃক্ষাদি অপসারিত করিয়া উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছেন। আশ্রমের পাহাড়ের পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি পার হইয়া গেলে একটী বেশ বড় আঁকা বাঁকা হ্রদ আছে যাহাকে চট্টগ্রামের ভাষায় ঢেবা বলে। আমরা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া অতি সরুপথে সদল বলে হাঁটিয়া ঐ হ্রদ প্রথম অবস্থায় কয়েকবার দেখিয়া আসিয়াছি। এখনও কেহ কেহ তাহা দেখিতে যায়। আশ্রমের পশ্চিম দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের দৃশ্য অতি মনোরম। উপরের পাহাড়ের বাড়ীর বারান্দায় এমন কি সমস্ত দরজা খুলিয়া দিলে যে কোনও কামরায় বসিয়া অসীম সমুদ্রের নীল জলের এবং মাঝে মাঝে জাহাজ ও নৌকাচলাচলের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া আস্তে আস্তে সূর্য্যদেবের অতল সমুদ্রে অবগাহন ও নিমজ্জনের দৃশ্য বর্ণণাতীত ও মনোমুগ্ধকর। তখন আপনা হইতেই অপ্রত্যক্ষভাবে কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ভগবৎচরণে

মন প্রাণ ঢলিয়া পড়ে। নির্ম্মল চন্দ্রালোক রাত্রে সমুদ্রের স্নিগ্ধ মধুর দৃশ্যও বর্ণাতীত। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সূর্য্যালোক পূর্ব্বধারের পাহাড়গুলির অন্ধকার স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ রশ্মি আস্তে আস্তে বিকীর্ণ করিতে থাকে তখন চতুর্দ্দিকের বিশেষতঃ পূর্ব্বদিকের নানাবর্ণে রঞ্জিত অসীম আকাশের স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্যে ভগবৎ ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হয়। আশ্রমের পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানের সবুজ মাঠ ও গ্রামগুলির সবুজ পাতায় ঢাকা বৃক্ষরাজি ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। উভয় পাহাড়ই খুব সতেজ বহু নিম, বেল; আম, কাঁঠাল, হরিতকী, জাম, কদম্ব, কুল, পেয়ারা, লিচু, আদি নানাফল এবং অসংখ্য প্রকারের ফুলের বাগানে সুসজ্জিত থাকায় এবং মাঝে মাঝে অতি বৃহৎ গর্জ্জন, তেলসর, ইউক্যালিপ্‌টাস বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত হওয়ায় এই স্থানটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, অতি স্নিগ্ধ, মধুর নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে। আশ্রমের পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ঐরূপ উচ্চ এবং অতি বিরাট বৃক্ষরাজি সমন্বিত পাহাড় না থাকায় এবং পশু পক্ষীর প্রতি অনর্থক হিংসাত্মক কার্য্য হওয়ার কোনও আশঙ্কা না থাকায় উহা ছোট বড় নানারকমের পাখীর আবাস-স্থল হইয়াছে। উহারা সারাদিন বিশেষতঃ ভোরে ও সন্ধ্যায় মধুর কলরবে চারিদিক মুখরিত করে। 'স্পেনসার কম্পেনির' পূর্ব্ব বঙ্গের ম্যানেজার, Mr. J. F. Lambert যিনি উপরের পাহাড়ের বাড়ী আংশিক ভাড়া করিয়া উহাকে রক্ষা করিতেছেন তিনি হিংসা করা দূরে থাকুক, কেহ পশু পক্ষীকে হিংসা করিতে দেখিলে পাগলের মত তাহাকে আক্রমণ করেন। নিজে অনেকগুলি গরু, ছাগল, ভেড়া হাঁস, মুরগী কবুতর পালেন, কিন্তু তাহাদিগকে কাটিয়া খাওয়া দূরের কথা

গরু এবং বাছুরের কষ্ট হইবে বলিয়া গরুর দুধ দোহন করিতে দেন না, পরন্তু প্রতিদিন দুধ কিনিয়া খান।'

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ঐ পাহাড়ের চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার কোনও রাস্তা ছিল না, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় এবং তৎপর Refugee (বাস্তুহারা) দের স্থান দেওয়ার পরিকল্পনায় আশ্রমের চারিদিকে খুব প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হইয়া ক্রমশঃ তাহার উন্নতি হইতেছে এবং শীঘ্রই তাহা পীচ অথবা reinforced concrete রাস্তায় পরিণত হইবে বলিয়া শুনিতেছি। সম্প্রতি ঐ রাস্তার পার্শ্বে ও অনতিদূরে পাকিস্থান সরকার অনেকগুলি একতালা, দোতলা ও তেতলা দালান প্রস্তুত করায় নির্ভয়ে ভোরে ও সন্ধ্যায় আশ্রম পরিক্রমণের সুযোগ হইয়াছে।

কৈবল্যধাম আশ্রম পাহাড়তলী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র ১¼ মাইল দূরে অবস্থিত এবং রেলরাস্তা আশ্রমের জমির সংলগ্ন পশ্চিম দিক্ দিয়া উত্তর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনুমান ২০০ হাত পশ্চিমদিক দিয়া সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র সাহা-সুজা নির্ম্মিত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড্ (Grand Trunk Road) ঠিক রেলরাস্তার সমান্তরাল ভাবে চলিয়া গিয়াছে। ঐ রাস্তা এখন অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের সময় Cocrete Roadএ পরিণত হইয়াছে এবং তাতে বহু passenger Bus ও নানাপ্রকারের যানবাহন চলিয়া থাকে। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পরে ৩১-৮-৩৭ ইং (১৩৪৪ সনের ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে) কৈবল্যধামে একটি ষ্টেশন করার জন্য আমরা নোয়াখালী হইতে তদানীন্তন A. B. Railwayএর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পাঠাই। তাহার ফলে দুর্গাপূজা উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা ৪।৫ দিনের জন্য

উভয়দিকের গাড়ী কৈবল্যধামে থামাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে যথেষ্ট যাত্রী গমনাগমন করিয়াছে দেখিয়া কয়েক বৎসর 'কৈবল্যধাম নামে অস্থায়ী ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ঐ ষ্টেশন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৮ ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশীসংখ্যক যাত্রী ঐ ষ্টেশন হইতে যাতায়াতের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

আশ্রমের "কৈবল্যশক্তি" নামক বৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিমদিকে "কৈবল্যকুণ্ড" নামক পুষ্করিণীতে বহুসহস্রলোক অবগাহন করা সত্ত্বেও ইহার জল এখনও ভালই আছে। কৈবল্যশক্তি বৃক্ষের ক্রমবর্দ্ধমান শাখাগুলি কৈবল্যকুণ্ডের পুরুষগণের ব্যবহার্য্য সিমেন্ট বাঁধান সুবৃহৎ ঘাট অতিক্রম করিয়া, উহার উপরও সামান্য পরিমাণ গিয়াছে। ঐ কুণ্ডের উত্তর পাড়ে মেয়েদের স্নানের জন্যও বৃহৎ সিমিণ্টের বাধান ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ কুণ্ডের পূর্ব্ব উত্তর কোণে 'গোপালস্মৃতি' নামে পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি কার্য্যের জন্য একখানা পাকা ভিটি বিশিষ্ট আংশিক দেয়ালে ঘেরা টিনের শ্বেত পাথরের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিশিষ্ট অতি মনোহর পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ঐ পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানেরই ফল হইবে। ঐ স্থানে বহু লোক প্রতিমাসে শ্রাদ্ধ তর্পনাদি করিয়া শান্তি পাইতেছে। ঐ গৃহের উত্তর দিকে কামধেনু মাতার ও ভক্ত ময়নার সমাধির উপরে অতি সুন্দর একখানা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ কামধেনুটিকে অতি ছোট অবস্থায় নোয়াখালী জিলার মাইজদি গ্রাম হইতে খরিদ করিয়া কিছুকাল আমার নোয়াখালী বাসা বাড়ীতে রাখিয়াছিলাম। উহা যে কামধেনু সে বিষয়ে

সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়ায় উহাকে কৈবল্যধাম আশ্রমে পাঠান হয়। তথায় মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আশ্রমবাসিগণের যত্নে ইহা ক্রমশঃই খুব হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। উহার শরীরের রং ও অতি সুন্দর লালবর্ণ ছিল এবং কপালে সাদা চাঁদ ছিল। প্রথমতঃ দৈনিক এক পোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাহার পরিণত বয়সে সাড়ে তিন সের পর্য্যন্ত দুধ পাওয়া যাইত। প্রায় বার বৎসর আশ্রমবাসী ও যাত্রীদের নানাভাবে আনন্দ দিয়া কামধেনু মাতা দেহত্যাগ করেন।

উপরোক্ত ময়নাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের চট্টগ্রামের বাসাবাড়ীতে ছিল। সে প্রায় সময়ই 'রাম রাম কও, রাম রাম কও' এই শব্দ করিত, যোগেশবাবু চট্টগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা যাওয়ার সময় ঐ ময়নাটি আশ্রমে দিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সে ঐ বুলিই অনবরত বলিত।

উক্ত সমাধি মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি অতি সুন্দর কদম্ব গাছ আছে। তাহার চারিদিকেও সিমেণ্ট বাঁধাইয়া দেওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভক্তগণ ফুল জল ইত্যাদি অর্পণ করেন। ঐ কদম্ব গাছের পূর্বধারে অতি নিকটে আমাদের স্নেহাস্পদ ভাই অখিলচন্দ্র রায়ের মাতার শ্মশানের উপর চারিধারে বারান্দাবিশিষ্ট একটি মন্দির আছে। ঐ কদম্ব বৃক্ষেরই সোজা দক্ষিণে কৈবল্যকুণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে আর একটি ঠিক ঐরূপই কদম্ব গাছ আছে। তাহারও চারিদিক্ সিমেণ্টে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতেও ভক্তগণ ফুল জল অর্পণ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছেন ঐকদম্ব বৃক্ষমূলই রাধা-কৃষ্ণের লীলাস্থান।

উপরোক্ত কামধেনু ও ময়নার সমাধি মন্দিরের উত্তর ধারে প্রকাণ্ড একটি ফুলের বাগান সমতল ভূমিতে অবস্থিত আছে। তথায় আড়াই শত গোলাপ ফুলের গাছ ও অন্যান্য নানা প্রকারের অগণ্য ফুল গাছ আছে। তাহা ছাড়াও আশ্রমের নানাস্থানেই অনেক পুষ্প শোভিত বৃক্ষ-লতাদিতে আশ্রমটি সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

ফুল বাগানের উত্তর দিকে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার করিয়া উহাতে সুবৃহৎ বাঁধান ঘাট তৈরী করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহাতে বাসনাদি ধোয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকায়, পূর্ব্বোক্ত কৈবল্য-কুণ্ডের পবিত্রতা রক্ষার সুবিধা হইয়াছে।

বাগানটির পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের গায়ে পাকা গোশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে ১০।১২টি গরু রাখা হয়। ঐ স্থানেরই উপরে 'শিবশক্তির' দোতলা মন্দির অবস্থিত। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ই একটি বেল গাছ ঐ স্থানে ছিল। বৎসরেক পরে তাহার গায়ে একটি অতি ছোট অশ্বখ বৃক্ষ উঠিতে দেখিয়া আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়ে ঐ বেল গাছটি খুব বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ স্থানে প্রতিদিনই পূজা ভোগাদি হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বেই দুই কোঠা বিশিষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুর মন্দির প্রস্তুত হওয়ার কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কয়েক বৎসর পর ৺বিধুভূষণ বসু মহাশয় ঐ মন্দিরের পশ্চিম ধারে আর একটি কোঠা নিজের খরচে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৩৪১ সনের ফাল্গুন মাসে আশ্রমের প্রথম মোহন্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৩৪৭ সনে "হর গৌরী" নামে একটি দোতলা বাড়ী নাটমন্দিরের

দক্ষিণ ধারে নির্ম্মাণ করা হয়। ঐ দোতলার এক কামরায় উক্ত মোহন্ত মহারাজের একখানা চিত্রপট বসাইয়া তথায় নিত্য ভোগ দেওয়া হয়। ঐ কোঠার পার্শ্বে অপর কোঠায় বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ বাস করেন। ঐ বাড়ীর একতালার মধ্য দিয়া ঠাকুর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকৈবল্য-নাথের চিত্রপটের ঠিক সোজা খুব বিস্তৃত দুই ধারে অনুচ্চ সুন্দর 'কারুকার্য্যময়' concrete এর রেলিং বিশিষ্ট সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। তৎপর ঐরূপ প্রশস্তই একটি রাস্তা একটু সামান্য বাঁক দিয়া রেলরাস্তা ও ষ্টেশন কম্পাউণ্ড অতিক্রম করিয়া অনতিদূরে পশ্চিমদিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ রাস্তাই আবার আশ্রমের উপরের পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব ও উত্তর দিক ঘিরিয়া ভক্তগণকে পরমানন্দে আশ্রম পরিক্রমণের সুযোগ দিতেছে। আমি কয়েক মাস যাবত প্রায় প্রত্যহই ভোরে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ রাস্তায় প্রায় নির্জ্জনে ভ্রমণ করিয়াছি। চতুর্দ্দিকের বিশেষতঃ নানা-প্রকারের সতেজ বৃক্ষ ও লতাপাতায় সুশোভিত আশ্রম পাহাড়ের অতুলনীয় শোভা দর্শন করিয়া প্রভূত আনন্দ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই অপার করুণায় অভিভূত হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে আপন হইতেই তাঁহার সান্নিধ্যের অনেক পূর্ব্বস্মৃতিই জাগিয়া উঠিয়া আমাকে বিমল আনন্দে আপ্লুত করিয়াছে। উক্ত 'হরগৌরী' মন্দির হইতে প্রশস্ত সিঁড়িগুলি সোজাভাবে নামিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেই স্থানের ঠিক দক্ষিণদিকে পাকা ভিত্তি ও দেওয়াল ও দুইদিকে বারান্দা বিশিষ্ট ঢেউটিনের ছাদে ঢাকা খুব লম্বা যাত্রীনিবাস ১৩৫০ সনে উপরের পাহাড়ের গায়ে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ঐ যাত্রীবাসের সর্ব্ব দক্ষিণ কামরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত অক্লান্তকর্ম্মী রায়সাহেব ডাক্তার

অনাথবন্ধু সেন সস্ত্রীক কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। তিনি অধ্যবসায়ের দরুণ ডাক্তারী ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করা সত্ত্বেও প্রকৃতিগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ও ফুলবাগানের সেবায় প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেন। নানাদিক দিয়া তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ও নৈপুণ্য আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। এ, বি, রেলওয়ে কোং এর ডাক্তার থাকা কালেও তিনি সময় করিয়া আশ্রমের বাড়ী, রাস্তা, দেওয়াল ইত্যাদি নির্ম্মাণের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ১৩৫৩ সনে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দ্দেশে কৈবল্যধামে থাকিয়া তাহার সর্ব্বপ্রকারের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনিই এই কৈবল্যধামের সম্পাদকের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ১৩৬৪ সনে আর একটি বৃহত্তর যাত্রী নিবাস এই যাত্রীনিবাসের দক্ষিণ দিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উভয় যাত্রীনিবাসের সম্মুখস্থ অতি মনোরম ফুলবাগানাদি সম্পূর্ণ তাঁহারি চেষ্টায় হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আশ্রমে আসার পূর্ব্ব হইতেই ঐ যাত্রীনিবাসগুলির নিম্নস্তরে পাহাড়ের গায়ে আরও কয়েকখানা টিনের ঘর প্রস্তুত হইয়া আশ্রমের কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বাসস্থান ও চায়ের দোকান আদি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

উহার নিম্নভাগে মহোৎসবাদিতে ভোগ রান্না ও প্রসাদ বিতরণের জন্য খুব বিস্তীর্ণ বাঁধান স্থান এবং তাহার পশ্চিমে দাতব্য ঔষধালয় প্রস্তুত হওয়ার পরিকল্পনা, আশা করি অতি শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করা হইবে। গত আশ্বিন মাস হইতে ভোগ রান্নার বৃহৎ পাকাঘর প্রস্তুত হইতেছে। ঐ স্থানটি বেশ উচ্চ দেওয়াল দ্বারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ঘেরা হইয়াছে।

উপরোক্ত 'হরগৌরী' মন্দির হইতে উপরের পাহাড়ে উঠিবার প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বেল, বকুল, চাঁপাফুল, নিম, আমলকি, আমরুজ, তেলসর, কাঁঠাল ও নানা সতেজ সুন্দর বন্য বৃক্ষরাজিতে সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। উপরের পাহাড়ে উঠিবার সময় রাস্তার বামপার্শ্বে পাহাড়ের পাদদেশে নীচ হইতে উত্থিত ঝরনার জলে পূর্ণ শ্রীকামশ্রীকুণ্ড অবস্থিত। ইহার জল খুবই পবিত্র ও সুস্বাদু। বৎসরেক পূর্ব্বে প্রায় বার হাজার টাকা ব্যয়ে 'হরগৌরী' মন্দিরের পশ্চিমে টিউবওয়েল এবং ইলেকট্রিক পাম্প আদি বসাইবার পূর্ব্বে হ্যাণ্ড্ পাম্পের সাহায্যে এই কামশ্রীকুণ্ডের জলই পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হইত। একবৎসর ৺দুর্গাপূজা উৎসবের সময় ঐ জলে কর্পূরের গন্ধ পাইয়াছিলাম। ঐ কুণ্ডের জলে স্নানে বিশেষ উপকারিতার বিষয় ঠাকুর স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন। উৎসবাদিতে মহিলারা ঐ জলেই মঙ্গল ঘট পূর্ণ করেন। ঐ পাহাড়ে উঠিলেই তাহার উপরের দ্বিতল অট্টালিকার সামনের অর্থাৎ পশ্চিমদিকে তাকাইলে অসীম সমুদ্রের ও তাহার মধ্যবর্ত্তী ঠিক সোজা প্রায় একমাইল ব্যপ্ত সবুজ সমতল ভূমি ও মাঝে মাঝে খুব বৃহৎ নানাগাছের সবুজ মাথায় ঢাকা বাড়ীগুলির দৃশ্য অতি মনোহর। ঐ স্থান হইতে সন্ধ্যার সময় দক্ষিণদিকে কয়েক মাইল দূরে কর্ণফুলী নদী তীরস্থ চট্টগ্রাম জেটির জাহাজগুলির, পতেঙ্গা এরোড্রোমের ও তন্নিকটস্থ কটনমিল আদির অলো জ্বলিতে দেখা যায়। তখন ঐ দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। বাড়ীটির দক্ষিণ দিক দিয়া সিমেন্ট বাঁধান খুব সুন্দর সিঁড়ি হেলিয়া দুলিয়া সমতলভূমি পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। ঐ পাহাড়টির উপরে ও গায়ে চতুর্দিকে নানা ফল গাছ ও খুব বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস্, নিম, বন্য গর্জন, তালসর, ও অন্যান্য সতেজ বৃক্ষ খুব ফাঁকা ফাঁকা ভাবে

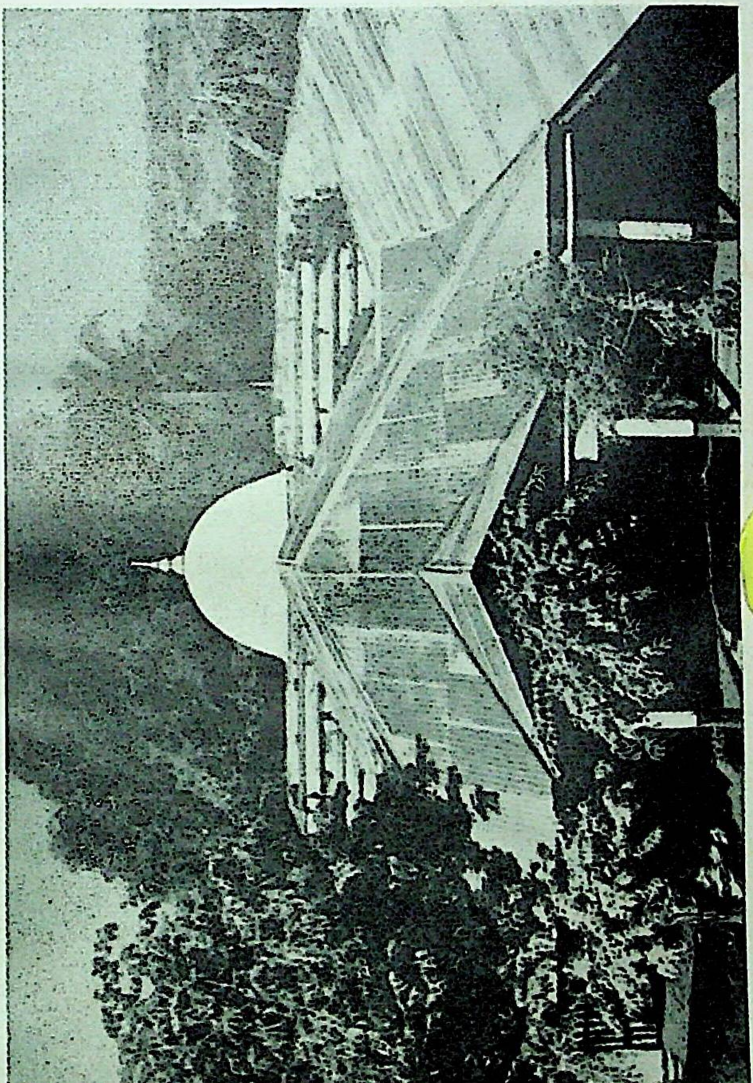

দাঁড়াইয়া কল্পনাতীতভাবে উহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ঐ পাহাড়ের উত্তর ধারে, নিম্নভাগে উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা শশ্মান ক্ষেত্র। তাহার মধ্যস্থলে একখানা ছোট সুন্দর মন্দির আমার শ্বশুর ৺কৃষ্ণসুন্দর বসু মহাশয়ের শ্মশানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার বর্ণনাকালে তাহার প্রথম মোহন্ত ৺হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জিলায়। কার্য্যোপলক্ষে তিনি বহু বৎসর আসামের নানা স্থানে কাটাইয়াছেন। ১৩৩৭ বাং সনের শ্রাবণমাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে আসাম প্রদেশের লিডু নামক স্থানে আসাম রেলওয়ে অ্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর ডিপো ক্লার্কের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অতি গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। নিস্তব্ধ সময় তানপুরা বাজাইয়া গান করিয়া আনন্দ উপভোগ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ শক্তি। কিছুর ভালমন্দের ধার ধারিতেন না। কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যসত্ত্বেও সময় সময় কোন কোন গুরুভ্রাতার সঙ্গে বিমল হাস্যরসাত্মক আলাপেও বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার কখনও উচ্চৈঃস্বরের কথা আমি শুনি নাই। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। পরমার্থ তত্ত্ব আলোচনাতেই তাঁহার পরমানন্দ দৃষ্ট হইত। খুব সম্ভবতঃ তিনি যোগ অভ্যাস করিতেন। তাঁহার চেহারাও ছিল শিবপ্রতিম। তাঁহার গায়ের রং ছিল ফর্সা এবং তিনি কিছুটা স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার সৌজন্য বর্ণনাতীত।

তিনি ১৩৩৭ সনের ১০ই শ্রাবণ হইতে ১৩৪১ সনের ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অতি ভক্তিভাবে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের নিয়মিত সেবা পূজা সম্পন্ন

করিয়া প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। পূজায় বসিতে সময় সময় মাথায় কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিয়া বসিতেন। আরতি করার সময় মাঝে মাঝে আসন হইতে শরীরের পিছনের অংশ অনেকদূর উঠিয়া যাইত যদিও পাছুখানা আসন হইতে বিচ্যুত হইত না।

প্রসঙ্গক্রমে ১৩৩৯ সনের দুর্গাপূজার দিন আশ্রমবাসীদের উপর যে এক আকস্মিক ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উৎপাত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি। তখন পূজার সময় আশ্রমে যাত্রীসংখ্যা খুব কমই ছিল, তত্রাচ স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীদের ঘর পূর্ণ হইয়া যাওয়াতে অনেক যাত্রীকে নাটমন্দিরে মশারী খাটাইয়া রাত্রে শুইতে হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় দুইজন মিলিটারী সাহেব এবং আর একজন সাহেব যাহাকে পরে চট্টগ্রামের পুলিশ সাহেব বলিয়া জানিতে পারিয়াছি হাঠাৎ অনেক গুর্খা সৈন্য ও চট্টগ্রাম থানার মুসলমান দারোগা সহ আশ্রম পাহাড়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আমি, আমার দাদা সুধাময় দত্ত, শ্রীঅখিল রায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু ইত্যাদি আমরা যাহারা নাটমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বের পানের ও ফলের দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "Hands up"— আমরা সকলেই হতভম্ব হইয়া দুই হাত উচু করিয়া দাঁড়াইলাম। নাটমন্দিরে নিদ্রিত ভদ্রলোকদের মশারী সৈন্যগণ ছিঁড়িয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া তাহাদিগকে অতি রূঢ়ভাবে জাগাইয়া তুলিল। কয়েকজন সৈন্য ঠাকুর মন্দিরের পূর্ব্ব কোঠায়, নিদ্রিত মোহন্ত হরিদাদাকে তুলিয়া আমাদের নিকট নিয়া আসিল। তিনি তখন ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। দুই এক মিনিটের মধ্যে আশ্রম প্রাঙ্গণে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। মেয়েদের ঘর হইতেও সকলকে বাহির হইতে আদেশ দেওয়ায় দুই একজন

মহিলা অতি বিষণ্ণ বদনে ভয়বিহ্বল চিত্তে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমি ঐ দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে, একটী মিলিটারী সাহেব আমার বুক সোজা হাত-খানেক দূরে তাহার রিভলভার ধরিয়া সজোরে বলিয়া উঠিল Where are you going ? (তুমি কোথায় যাইতেছ ?) আমি থতমতভাবে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "Ladies are there, I am going to see them. (মেয়েরা যেখানে আছে, আমি তাহাদের দেখিতে যাইতেছি) সে তৎক্ষণাৎ আবার ধমক দিয়া বলিল—"Stop. Don't proceed further" They would be coming here" (থাম, আর অগ্রসর হইও না, তাহারা এখানেই আসিবে) ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল ব্যানার্জী ও অন্যান্য অনেকে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেনবাবুকে দেখিয়া পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট্ মিঃ ক্যাম্প (Mr Kamp) বলিয়া উঠিলেন 'Hallo Suren, why are you here ?' (সুরেন, তুমি এখানে কেন ?)

সুরেনবাবু বলিলেন, This is the Asram of my Spiritual guide'. (ইহা আমার গুরুদেবের আশ্রম)' তখন পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন 'who are they ?' (এরা কারা ?)' তিনি উত্তর না দিতেই থানার দারোগা বলিয়া ফেলিলেন—'They are clerks of Railway Company (এঁরা রেল কোম্পানীর কেরাণী)। কিন্তু সুরেনবাবু আমাকে নোয়াখালী জিলার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার, রাজেনবাবুকে গভর্ণমেণ্ট সারভে স্কুল এর প্রিন্সিপ্যাল (Principal of Government Survey

School) ইত্যাদি বলিতেই পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট এর ইঙ্গিতে মিলিটারীদের ধরপাকড় থামিয়া গেল, মেয়েদের ঘর হইতে আর কাহারও বাহির হইতে হইল না এবং যে দুই একজন বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পুনঃ ঘরে প্রবেশ করিলেন। পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের সঙ্গে সুরেনবাবুর কথোপকথনে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা এখানে রাজবিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের খবর পাইয়াছিলেন। আমি তখন উপরের পাহাড়ের বাড়ীর দিকে দেখাইয়া বলিলাম 'Apart from my position as Govt. Pleader, do you think I am constructing this building at a huge expense to be forfeited by Govt ? (সরকারী উকীল হিসাবে আমার দায়িত্ব ছাড়াও, তোমার কি মনে হয় যে, এত খরচ করিয়া সরকারের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হওয়ার জন্য আমি এই বাড়ী তৈয়ার করিতেছি ?) এইরূপ রাজেনবাবু আদিও কিছু কিছু বলিলেন। তাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে ভদ্রভাবেই আলাপ করিতে লাগিল। আমরা তাহাদিগকে ডাবের জল ও ফল, মূলাদি খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। পরে জানিলাম যে গুর্খা সৈন্যগণ উভয় পাহাড়ই রাত্রে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং প্রাতে উপরের পাহাড়ের দালানের এক কামরার মেজেতে নরম সিমেণ্টের উপর বুটের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। তখন একতালার সকল কামরার মেজেতে ভালরূপে সিমেণ্টের কাজ শেষ হয় নাই।

কোনও দুষ্ট প্রকৃতির সরকারী গোয়েন্দার মিথ্যা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের উপর ঐ হামলা পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ মিলিটারীর সাহায্যে করিয়াছিল বলিয়া আমরা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।

ঐ ঘটনার পরে আর কখনও ব্রিটিশ কি পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট হইতে আশ্রমে কোন উপদ্রব হয় নাই। বরং সরকার পক্ষ হইতে আমরা সকল প্রকারের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছি। পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক মিলিটারী উপদ্রবের কয়েক দিন পরে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন 'এবার পূজায় বুঝি একটু গোলমাল হইয়াছিল ! আর একটু বাড়াবাড়ি করিলেই বুঝা যাইত কি হয়। জয়ন্তী মা ঐ আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।' শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময় বহু দূরে থাকা সত্ত্বেও তিনি যে ঐ সময়েই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ থাকায় আমি তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে বিস্তারিত আর কিছুই জানাই নাই।

ঐ বৎসরই শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী মোহন্ত হরিদাদার নেতৃত্বে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথেব চিত্রপট সহ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা উপরের পাহাড়ের নূতন দালানে প্রবেশ করি এবং মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ হলে পূজা কীর্ত্তনাদি সমাপনান্তে পুনঃ ঐভাবে আমরা সকলে ঠাকুর মন্দিরে ফিরিয়া আসি।

১৩৪১ সনে চাঁদপুরে ও ফেনীতে গুরুভ্রাতা রায় সাহেব শচীন্দ্র মালাকার মহাশয়ের বাড়ীতে দোল-পূর্ণিমায় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময় ফেনীতে তাঁহার বাড়ীতেই ছিলেন। আমি চাঁদপুরে দোল-পূর্ণিমা দিন দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইয়া বর্ত্তমান মোহন্ত শ্যামদাদা সহ ফেনীতে আসিয়া রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ স্পর্শ করি। তিনি সেই সময় খুব অসুস্থ ছিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সংবাদ আসে যে প্রফেসর প্রমথ দাদার বাসায় মোহন্ত হরিদাদা জ্বরে অত্যন্ত কাতর হইয়া সময় সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়

নানাকথা বলিতেছেন। তখনই ঠাকুর, শ্যামদাদা, আমি ও আরও দুই একজন প্রমথ দাদার বাসায় আসিয়া হরিদাদার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন বলিয়া অনুভব করি। ঠাকুর তাঁহার নিকটে গেলে তিনি শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। অল্পক্ষণ তথায় থাকিয়া ঠাকুর তৎকালে ফেনীর সাব্‌ডেপুটি ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় চলিয়া আসেন এবং আমিও তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া পুনঃ হরিদাদার নিকট ফিরিয়া আসি। ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া ঠাকুরকে ঐ সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন 'আজ হইতে শ্যামই আশ্রমের মোহন্ত হইলেন, এই সংবাদ সকলকে জানাইয়া দিবেন।' আমি তৎক্ষণাৎ হরিদাদার মৃতদেহের নিকট সম্মিলিত সকলের সমক্ষে ঐ সংবাদ প্রচার করিলাম। ঠাকুরেরই নির্দ্দেশানুযায়ী ফেনীর শ্মশান ভূমিতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

তাঁহার চাকুরীর সময়ে সঞ্চিত কিঞ্চিৎ অধিক ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা তিনি রেজিষ্টারী কৃত দলিল (Trust deed) মূলে পাহাড়তলী আশ্রমে শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

এই আশ্রমের দ্বিতীয় মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৩৪১ সনের চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান করিতেছেন। ভবিষ্যতে ও যাহাতে আশ্রমের কোনও অভাব না হয় তিনি দিবানিশি এই চিন্তায়ই ব্যাপৃত থাকেন। গত কয়েক বৎসরে তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় এই আশ্রমের ও যাদবপুর আশ্রমাদির জন্য আশাতীত অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এই আশ্রমের ঠাকুর মন্দির, নাটমন্দির ও তৎপূর্ব্ব পার্শ্বস্থ

পুরুষ ও মেয়েদের বাসগৃহ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত নির্ম্মাণের কাজ, আশ্রমের চারিদিকে বেষ্টিত উচ্চ দেওয়াল আদি তাঁহারই চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। গো সেবায় ও শ্রীনাম কীর্ত্তনে তাঁহার পরমানন্দ। তাঁহারই উৎসাহে এই আশ্রমে মহোৎসব প্রায় লাগিয়াই আছে। প্রতিদিনই কিছু কিছু খিচুড়ী প্রসাদ কাঙ্গালীরা পাইয়া থাকে। প্রতি রবিবারেই প্রায় তুই তিন শত লোক পেট ভরিয়া প্রসাদ পাইতেছে। এই আশ্রম, প্রতিবেশী অনাহারক্লিষ্টদের প্রধান আশ্রয়স্থল। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবা করাও ইহার প্রধান উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির বহুলোক প্রায় প্রত্যহই এই আশ্রমে আসিয়া শান্তি পান বলিয়া প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, ঠিক ৪টার সময় প্রত্যহ কয়েক মিনিট ঘড়ি বাজাইয়া আশ্রম বাসীদের জাগাইয়া দেওয়া হয়। ৪৷৷৹টা হইতে ৫৷৷৹টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের মঙ্গলারতি কীর্ত্তন ও পূজা স্তবাদি চলিতে থাকে। ৬টার পূর্ব্বেই সকলে নিজ নিজ কাজে চলিয়া যায়।

তাহার পর প্রায় ৯৷৷৹টার সময় পূজা আরম্ভ হইয়া সাধারণতঃ ১২টার মধ্যে ভোগ দেওয়া ও কীর্ত্তনাদি শেষ হয়। সন্ধ্যা বেলা পূজা, আরতি কীর্ত্তন, বেদবাণী পাঠ ইত্যাদি প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

অশীতিপর বৃদ্ধ মোহন্ত মহারাজ ব্যতীত রাত্রি ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত স্থায়ী আশ্রমবাসী পুরুষদের প্রায় সকলেই ১ ঘণ্টা কি ২ ঘণ্টা করিয়া পাহারা দেন। ৭৬ বৎসর বয়স্ক আশ্রমের কেরাণী শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার ও (মাষ্টার মহাশয়) সাগ্রহে এই কর্ত্তব্য পালন করেন। অশীতিপর বৃদ্ধা প্রফেসার প্রমথদাদার 'মা' যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশানুযায়ী আশ্রমে বাস করিতেছেন এবং যাঁহাকে সকলে আশ্রমের 'মা'

বলিয়াই অভিহিত করে। তিনি বর্ত্তমানে চলৎশক্তি রহিত হইলেও সকল সময় স্নেহ ভরে পরিচিত যাত্রী মাত্রেরই থাকার ও প্রসাদ পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁহার স্নেহের তুলনা নাই। ঠাকুর মন্দিরের সমস্ত কাজ অতি বৃদ্ধা কুলদি, সরোজিনী দিদি ও প্রিয়ভাষিণী দিদি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তাঁহাদের একেবারেই বিশ্রাম নাই বাললেও অত্যুক্তি হয় না।

আশ্রমের পুরুষ সেবাইতদের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ১৯৫৩ সনের জুলাই মাসে এই আশ্রম সেবায় যোগ দিয়াছেন। পূজা ও কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার পরমানন্দ। যদিও এখন তিনি ৭১ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন, আশ্রমের হিসাব পর্য্যবেক্ষণ, পত্রাদি লেখা, কর্ম্মচারীদের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকিয়াও রাত্রে প্রায়ই কিছু সময় পাহারাও দেন। মোহন্ত মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নাম দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়ায়, তিনি নানা-স্থানে বহুলোককে 'নাম' দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

অন্যদের মধ্যে শ্রীমান স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তি, শ্রীসূর্য্যলাল সাহা, কীর্ত্তনীয়া শ্রীমান ইন্দ্র, যোগেন্দ্রবাবু, শ্রীনগেন্দ্র সরকার, শ্রীমান আবু আদির সেবা-পরায়ণতা, আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশ্রমবাসী মাত্রই সারাদিন নানাকাজে ব্যস্ত থাকে। অলস ভাবে কাহারও বসিয়া থাকার জো নাই। মোহন্ত মহারাজের সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল সময়ই থাকে।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পর হইতেই, অনন্যমনা আশ্রম সেবক এবং আশ্রমাগত ভক্ত মাত্রেরই অতি প্রিয়, অক্লান্ত

পরিশ্রমী নরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী আর ইহ জগতে নাই। গত ২৮শে শ্রাবণ (১৩৬৬) অন্যান্যদিনের ন্যায়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া শ্রীশ্রীকৈবল্য নাথের মঙ্গলারতি সমাপনান্তে বাল্যভোগের প্রসাদ গ্রহণান্তে পূজার জন্য ফুল, তুলসীপাতা, দুর্ব্বাদি তুলিয়া ফুলের সাজি ঠাকুর মন্দিরে রাখিয়া বলেন যে, তাঁহার মাথা ও বুক কেমন করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার থাকার ঘরের দরজায় বসিয়া পড়েন। তাহার ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই পরমশান্তিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। সারাজীবন যাঁহার সেবা করিয়াছেন তাঁহারই ক্রোড়ে এইভাবে মৃত্যু দেবতাদেরও দুর্লভ। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে মোহন্ত মহারাজ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, একটি কালবর্ণের লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের পেছনে পেছনে যাইতেছে। মোহন্ত মহারাজও তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিলে ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার এখন যাওয়া হইবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেহত্যাগ করার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে 'নাম' দেওয়ার শক্তি ও অনুমতি দিয়াছিলেন। আমি একটিবার তাঁহার শ্রীমুখে বলিতে শুনিয়াছি 'আমি ত শ্যামকে 'নাম' দেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছি। এখন আর লোক কষ্ট করিয়া আমার নিকট 'নাম' নিতে আসে কেন?' এই ভাবের কথা দ্বারা আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে নাম নেওয়ায় যে ফল, বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজের নিকট হইতে 'নাম' নেওয়ায়ও সমান ফলই পাওয়া যাইবে। মোহন্ত মহারাজও 'নাম' দেওয়ার সময় ঠাকুরই গুরু বলিয়া সকলকে নির্দ্দেশ করেন এবং ঠাকুরের চিত্রপটই পূজা করিতে উপদেশ দেন।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ জানিয়া তাঁহার দেহ ত্যাগের পূর্ব্বেও অনেক লোক বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজের নিকট হইতে নাম নিয়াছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর হইতে প্রতি বৎসরই হাজার হাজার লোক মোহন্ত মহারাজের নিকট হইতে "নাম" নিয়া ধন্য হইতেছেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসীদের মধ্যে দৃষ্টতঃ মাত্র দুইজন আশ্রিত ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল জিলা অপেক্ষা ঐ জিলায় তাঁহার ভক্ত সংখ্যা অনেক বেশী। নানা স্থানের লোকের ঐকান্তিক অনুরোধে মোহন্ত মহারাজ অতি বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ শরীর লইয়াও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের নানাস্থানে বারংবার ঘুরিয়া "নাম" বিলাইয়া বহু হাজার লোকের ঐহিক ও পারত্রিক শান্তির পথ উন্মুক্ত করিতেছেন।

তিনি এই আশ্রমে আসার পূর্ব্বে কিছুকাল শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। ঐ সময় খুব সম্ভবতঃ ১৩৩৯ সনে ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাশীর বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। তথায় প্রভাতবাবুর সঙ্গে আলাপে জানিলাম যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত এবং শীঘ্রই কয়েকজন সাধুর সঙ্গে কৈলাস তীর্থে যাওয়ার মনস্থ করিয়াছেন। তখনই আমার মনে হইয়াছিল যে পাহাড়-তলী কৈবল্যধামেই তাঁহার স্থান হইবে। কার্য্যতঃও তাহাই হইল। ঐ দেখা হওয়ার কয়েকমাস পরই ঠাকুর তাঁহাকে এই আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

যতদূর মনে হয় ঐ সময়েই আমি প্রভাতবাবুকে লইয়া গঙ্গার তীরে যাই এবং তথায় বসিয়া অনেকক্ষণ আশ্রম ও ঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করি। ঠাকুর ক্রোধভরে গোলপাতায় নির্ম্মিত প্রস্তাবিত ঢাকুরিয়া

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনই হঠাৎ চিরতরে ত্যাগ করায় প্রভাত দা ঐ সময় কিছুকাল খুবই মনঃকষ্টে কাটাইতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে পাহাড়তলী আশ্রমে পূর্ব্বেও দুর্গাপূজা করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার নিজ বাড়ীতে পূজা করিতে হয়। এই কারণ দেখাইয়া তিনি ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এবারও সেই অনুরোধ করায় এবং অন্ততপক্ষে একবার পাহাড়তলী আশ্রমে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলিলেন—'দাদা তুমি সোজা মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না, আর সেইরকম একজন প্রমথ চাকী (প্রফেসর প্রমথবাবু) তোমার সঙ্গে জুটিয়াছে। আমি ত' খুব ছেলে বেলা হইতেই জানি যে সে কত বোকা। যাহারা এখন ঠাকুরের ভক্ত সাজিতেছে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের মতলবে ঠাকুরের কাছে যায়। তুমিও শীঘ্রই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আমি তাহাদের সংশ্রবে যাইব না।' আমি তদুত্তরে বলিলাম দুর্গাপূজার সময় তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমি যে আনন্দ পাই তাহাত আর কোথাও পাই না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ঐ আলোচনাতে ও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না এবং তাঁহার আশ্রমে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই বলবৎ রহিল।

১৩৪১ বাং সনের শেষভাগে অথবা ১৩৪২ সনের একেবারে প্রথম ভাগে একদিন পাহাড়তলী আশ্রমে আসিয়া প্রভাত বাবুকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত হই। কিছুক্ষণ আলাপের পর আমি বলিলাম "এখন দাদা বৎসরে অন্ততঃপক্ষে একবার এই আশ্রমে আসিবেন ত?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন "একবার নয় তিনবার আসিব"। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই আলাপের কয়েক

মাস পূর্ব্বেই ১৩৪২ বাং সনের ১৬ই ভাদ্র তিনি কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাটিতে ইহ-লীলা সম্বরণ করেন।

১৯৪৯ বাং সনের বৈশাখ মাসে জাপানীরা যখন এরোপ্লেন হইতে চট্টগ্রাম সহরে ও জেটিতে বোমা নিক্ষেপ করে তখন এই আশ্রমের এক বিষম সংকটের সময় গিয়াছে। ঐ বোমা বিস্ফোরণের ফলে ঠাকুর মন্দির আদিও কাঁপিয়া উঠায় আশ্রমবাসী মাত্রই স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ সেই সময় উপরের পাহাড়ের দালান আমাদের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও সরকার রিকুইজিসন করিয়া মিলিটারী ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্বাসবাণী পাওয়াতেই স্ত্রীলোকদের কয়েকজন ছাড়া আশ্রমবাসী কেহই ঐরূপ মারাত্মক আশঙ্কা সত্ত্বেও আশ্রম ত্যাগ করেন নাই। স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরমশ্রদ্ধেয়া সরোজিনী দিদি আশ্রমেই থাকিয়া গেলেন।

'যাদবপুরে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম'

১৩৪৩ সনের মাঘমাসে শ্রীশ্রীঠাকুর পত্রদ্বারা আমাকে জানান যে কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে ঐ সনের ১৩ই ফাল্গুন আর একখানা আশ্রম আমাদের পাহাড়তলী আশ্রমের শাখা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যেন কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়াই তথাকার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হই। এই সংবাদে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিলাম, কিন্তু আমি ঐ তারিখের বেশী দিন পূর্ব্বে যাইয়া যে কি করিব তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ কর্ম্মপটুতা আমার মোটেই নাই।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

বাল্যকাল হইতে সারাজীবনই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের অহৈতুকী স্নেহের সৌজন্যের সাহায্যে কাজকর্ম্ম চালাইয়া আসিয়াছি। ঐ সময় কলিকাতায় দৃষ্টতঃ আমার সহায়তাকারী কেহই ছিল না। যাহা হউক তাঁহার আদেশ স্মরণ করিয়া প্রতিষ্ঠার ৩।৪ দিন পূর্ব্বেই কলিকাতা যাইয়া আমার আত্মীয় শ্রীমান অরুণ চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে আমিও আমার স্ত্রী, ৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান রামময় ও ভ্রাতস্পুত্রী শ্রীমতী ননী সহ উঠিলাম। যতদূর মনে হয় নোয়াখালী হইতে আমাদের সঙ্গে শ্রীমান দিগিন্দ্র কুমার মজুমদার এবং পরলোকগত বন্ধু সুরেশচন্দ্র ঘোষও কলিকাতা আসিয়াছিল। তথায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে কিছুদিন যাবৎ ঠাকুর এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে কেহ যেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে না আসে, তৎপর অবগত হইলাম যে ঐ আদেশ আমার প্রতি প্রযোজ্য নহে। ইহা জানিতে পারিয়া আমি একাই যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলাম। তিনি সহাস্য বদনে আশ্রমের কাজে লাগিতে উপদেশ দিলেন।

যাদবপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্থানে যাইয়া দেখিলাম তথায় একখানা ছোট দোতলা বাড়ী উঠিয়াছে। আগন্তুক যাত্রীদের থাকার জন্য ঐ স্থানের অল্প দূরে একখানা বারান্দাবিশিষ্ট একতালা বাড়ী ও তথায় রান্নাঘর আদি ভাড়া করা হইয়াছে। ঐ বাড়ীতে চট্টগ্রাম হইতে আগত পাহাড়তলী কৈবল্যধামের মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভুবন মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযামিনীভূষণ আদিত্য, শ্রীজয়কালী দিদি, ফেনী হইতে আগত পরলোকগত বন্ধু যামিনী কুমার সাহা, তাঁহার স্ত্রী এবং আরও দুই একজন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিবাসের দিন প্রাতে আমার স্ত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ননী ও পুত্র শ্রীমান রামময় আসিয়াও

তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন গুরুভ্রাতা ডাক্তার শ্রীকৈলাস চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী ও আরও কয়েকজন আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীটির চতুর্দ্দিকেই খালি মাঠ ছিল। আশ্রমের স্থানের কিছুদূরে ঐ স্থান যিনি দান করিয়াছিলেন, পরলোকগত পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ডাক্তার ক্ষিতিভূষণ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার একখানা বাড়ী ছিল। তাহাতেও কোনও কোনও আগন্তুক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় যাদবপুর প্রায় নির্জ্জন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন যে স্থানে বহু হাজার ছোট বড় বাড়ী দেখা যায় সে স্থানে তখন বিরাট মাঠ এবং বহু দূরে দূরে দুই একখানা বাড়ী দেখা যাইত। আশ্রমের নিকটে দোকান কি হাট বাজার কিছুই ছিল না।

ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠা উৎসবের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আপ্রাণ চেষ্টায় উৎসব সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কীর্ত্তন আদিতেও যথেষ্ট আনন্দ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের তুলনায়, তৎকালে প্রায় নির্জ্জন সেই স্থানে মহোৎসবে লোক সংখ্যা অনেক কম হইলেও সেবারের অন্নপ্রসাদ ও সত্যনারায়ণের প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল তাহারা আজ পর্য্যন্ত তাহা ভুলিতে পারে নাই। ফেনীর গুরুভ্রাতা যামিনী কুমার সাহা মহোৎসব রান্না আদিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হওয়ায় পরস্পর আলাপ পরিচয়ে এবং একযোগে একই ভাবের উদ্দীপনায় সকলেই আনন্দ অনুভব করিলেও একটী বিষয়ে সকলেই একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী বহুদূর হইতে আগত ভক্তগণও তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করে নাই, তিনি ঐ সময় ১১নং আল´ ষ্ট্রীটে তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত পরলোকগত ৺কুঞ্জলাল মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। প্রতিনিয়ত সেবাকারী অপর ভক্ত শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার মহাশয় ও কুঞ্জবাবু ছাড়া স্থানীয় কি বহিরাগত কোনও ভক্তকে আমি সেইবার কলিকাতা পৌঁছিয়া উৎসব শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট যাইতে দেখি নাই। ঠাকুর স্বয়ং মহোৎসবের দিন পর্য্যন্তও আশ্রমে পদার্পণ না করায় পুরুষ ও মহিলা বালবৃদ্ধ বনিতা সকল শ্রেণীর ভক্তগণের মুখে ভীষণ বৈরাগ্যের ছায়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে ঠাকুরের দর্শন পাইব না জানিলে অতদূর হইতে এই উৎসবে আসাই হইত না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উৎসবের অধিবাস দিন হইতেই কুঞ্জ বাবু ও অক্ষয় বাবুকে ঠাকুর যেন অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য উৎসব প্রাঙ্গণে যাইয়া সকলকে দেখা দেন এই প্রার্থনা করার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা সকল সময়েই আমাকে ঐ বিষয়ে পাল্টা অনুরোধ করিয়া নিবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা সাহস পাইতেছেন না দেখিয়া আমার অনুরোধ করার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ফুটিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে সাহস করিলাম না।

মহোৎসবের পরদিন আমি, আমার স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ননীকে লইয়া উৎসবের স্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীমান অরুণের বাড়ীতে আসার পথে কুঞ্জবাবুর বাড়ীতে ঠাকুর দর্শন করার মানসে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ আমি উপরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া সঙ্গীগণকেও তাঁহার সান্নিধ্যে নিলে তিনি সকলকেই সহাস্য বদনে আশীর্বাদ

করিলেন। আমরা উৎসবের স্থান ছাড়িয়া আসার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে কোনও কোনও ভদ্রমহিলার নৈরাশ্যব্যঞ্জক মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলাম। এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক সাদর সম্ভাষণ পাইয়া সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে বলিলাম একবার যদি অন্ততঃপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য তিনি উৎসব স্থানে যান তাহা হইলে সকলেই যথেষ্ট আনন্দ পাইবে, নচেৎ সকলেই গভীর নৈরাশ্যের ভাব নিয়া নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইবে। এই কথায় ঠাকুর তথায় যাইতে সম্মত হইলেন এবং ত্রেরাত্র বাস করাই সঙ্গত বলিয়া আমাদিগকেও তথায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাইয়া ঠাকুর শীঘ্রই আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দিলে তথায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর একখানা মোটরগাড়ীতে উৎসবের স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে উপস্থিত সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইল। জানি না কি কারণে তিনি রাস্তায় দাঁড়ান মোটর হইতে না নামিয়াই পুনঃ তৎকালীন বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উপস্থিত ভক্তগণও সেইদিন তথায় প্রসাদ গ্রহণান্তে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

এই আশ্রমও শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম নামে অভিহিত হইল। ঠাকুর উপরোক্ত ডাক্তার দা, মণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরলোকগত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আশ্রমের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, বাল্যকাল হইতে তাঁহার সেবক শ্রীমান যামিনীরঞ্জন আদিত্যকে ঠাকুর ঐ আশ্রমের সেবাইত নিযুক্ত করিলেন। তৎপূর্ব্বে সে বহু বৎসর পাহাড়তলী আশ্রমে থাকিয়া যথাসাধ্য

শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবা করিয়াছিল। এখানে তৎকালীন অতি অল্প সংখ্যক ভক্তের সাহায্যে ও আনুকূল্যে সে কয়েক বৎসর অতি সুচারুরূপেই সেবাইতের করণীয় পূজা অর্চ্চনা ও অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা আদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, যদিও অনেক সময় রন্ধনাদিও তাহাকে নিজ হস্তেই করিতে হইত। পরে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বা প্রারব্ধানুযায়ী সে মাঝে মাঝে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া কিছুদিন হাসপাতালেও ছিল।

এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় সামান্য জমি এবং তাঁহার বাসের জন্য নির্ম্মিত ছোট বাড়ীটি ক্ষিতিবাবু আশ্রমের জন্য দান করিয়াছিলেন। আশ্রম হওয়ার পরে ভক্তমাত্রই আশ্রমের জন্য আরও অনেক বেশী স্থানের প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল। শ্রীমান যামিনীর চেষ্টায় ক্রমে আরও কিছু আশ্রম সংলগ্ন জমি আশ্রমভুক্ত হইতে লাগিল।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বহুবৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুর মন্দিরের দোতলার এক কোঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্যনারায়ণের মূর্ত্তির চিত্রপট সিংহাসনে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইত এবং তাহার পার্শ্বস্থ কোঠায় সেবাইত ও অন্য দুই একজনও শয়ন করিত। মন্দিরের নীচের তলায় অফিসাদি ও তাহার পিছনে ভোগ রান্নার ঘর ছিল। মন্দিরের সম্মুখে তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার উপরে একখানা টীনের বৃহৎ অটচালা নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট উপরোক্ত তিন জন ভক্ত ও শ্রীমান অখিল চন্দ্র রায় এবং বর্ত্তমান সময় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রফেসর শ্রীমান লোকেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহারা আশ্রমের লোকাল কমিটির সভ্য ছিলেন। কালক্রমে সময়ের

দোষে ঐ কমিটির কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের সহিত সেবাইত শ্রীমান যামিনীর মতান্তর হওয়ায়, সে তাঁহাদের কয়েকজনের বিরাগভাজন হইল। এই আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের সংবাদ শ্রীশ্রীঠাকুরেরও কর্ণগোচর হইল। তিনি স্থানীয় কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী আশ্রমের সেবাইতকে চলিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া সকলকে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার জন্য উপদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর, ১৩৫৬ সনে পাহাড়তলী কৈবল্যধামের বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাদবপুর আশ্রমে যাইয়া অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে শ্রীমান যামিনীকে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিতে বলিয়া শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়কে তথায় সেবাইত নিযুক্ত করিলেন। যামিনী তাহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে মনে করিয়া ঐ আশ্রম ত্যাগ করিয়া তৎসন্নিকটে একস্থানে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্রমে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করিল। তাহার সমর্থনকারীও অনেক জুটিল, যদিও তাহাদের সংখ্যা অপরপক্ষের তুলনায় খুবই কম। দুই চার জন নিরপেক্ষ ভক্ত এই অশান্তিকর পরিস্থিতির ও মনোমালিন্য দূর করার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ সফলকাম হন নাই। আমি নিজেও এই সমস্যার শান্তি ও প্রীতিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি। যাহা হউক ইহা কালচক্রেরই খেলা এবং কালেই তাহার সমাধান করিবে। সময়ের দোষে অনেক দৃষ্টতঃ অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার এক ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেম—'সময়গতিকে বন্ধুবান্ধবও অসমতা হইয়া থাকে। তাহা সকলই উদয় অস্তশীল," (বেদবাণী দ্বিতীয় খণ্ড—১৬৫নং পত্রাংশ)।

এই আশ্রমেরও ক্রমশঃ সর্ব্বদিকেই উন্নতি হইতেছে। দেশ বিভাগের পর বহুসহস্র পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু আসিয়া যাদবপুরে আশ্রয় গ্রহণ করার পর জঙ্গলাকীর্ণ স্থানও মাঠগুলি সুন্দর স্কুল, কলেজ, বাজার ও বাসস্থানাদিতে পরিপূর্ণ হওয়ায় তথাকার জমির মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিমধ্যে আশ্রমসংলগ্ন আরও কিছু জমি আশ্রমের জন্য খরিদ করা হইয়াছে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান ভক্তগণের সমাবেশ ও মহোৎসবাদির সময় বহুসহস্র লোককে প্রসাদ বিতরণের জন্য আরও অনেক জমির প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসবে ৩০।৭০ হাজার লোক সমবেত হয় এবং উত্তরোত্তর এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

১৩৬৩ বাং সনের ১৩ই ফাল্গুন এক বিরাট নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট পূর্ব্ব মন্দির হইতে আনিয়া মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মন্দিরের কার্য্য প্রায় তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই মন্দিরের প্ল্যান করা হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য অবসর প্রাপ্ত একজি-কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রায় প্রত্যহ রৌদ্র বৃষ্টি আদির সকল উপদ্রব সানন্দে সহ্য করিয়া এই নীরব কর্মী ভগবৎ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভক্তমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছেন। এই প্রকারের একনিষ্ঠ ভগবৎ সেবার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

এই আশ্রমের একটি কার্য্যকরী সমিতি আছে। সভ্যগণের সংখ্যা খুবই কম। ঐ সমিতির বিশিষ্টষ্ঠু সভ্যগণ সুভাবেই কার্য্য পরিচালনা

করেন। ১৩ই ফাল্গুন প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে বাৎসরিক আয় ব্যয় ইত্যাদি ভক্তগণের সাধারণ সভায় আলোচিত হইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কার্য্যকরী সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত এবং সম্পাদক শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার অপরাহ্নে মহিলা ভক্তগণের ভগিনী-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা, বেদবাণী পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হয়। তাহাতে শ্রীমতী বীণা সেনই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও গায়িকা, তাহার কীর্ত্তন খুব মনোমুগ্ধকর এবং ভক্তিরস উদ্বোধক।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় কোনও ভক্তের বাড়ীতে অথবা আশ্রমে গুরুচক্রের অধিবেশন হয়। তাহাতে গুরুর বন্দনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত রামায়ণ ও বেদবাণী পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ ও কীর্ত্তনাদির পর সির্ন্নি ও ফল প্রাসাদ আদি বিতরণ করা হয়।

অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় এই আশ্রমেও খুব ভোরে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পূজা, আরতি ও কীর্ত্তন ও সত্যনারায়ণের সেবা প্রত্যহই সম্পন্ন হয়।

এই আশ্রমের বর্ত্তমান সেবাইত চিরকুমার শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় বি, এল নানা রোগাক্রান্ত হইয়াও বহুবৎসর পাহাড়তলী কৈবল্যধামে ও এই আশ্রমে আপ্রাণ খাটিয়া আশ্রমের সেবা করিয়াছেন। চিরকুমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা, আশ্রমের হিসাবাদি রাখা ও অন্যান্য কাজে ব্যাপৃত থাকেন। নিয়মিত পূজক শ্রীপ্রিয়লাল চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ও ধীর, স্থির, বিনয়ী এবং গম্ভীর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি। আশ্রমের অন্যান্য কর্ম্মীগণও ইহার উন্নতি কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

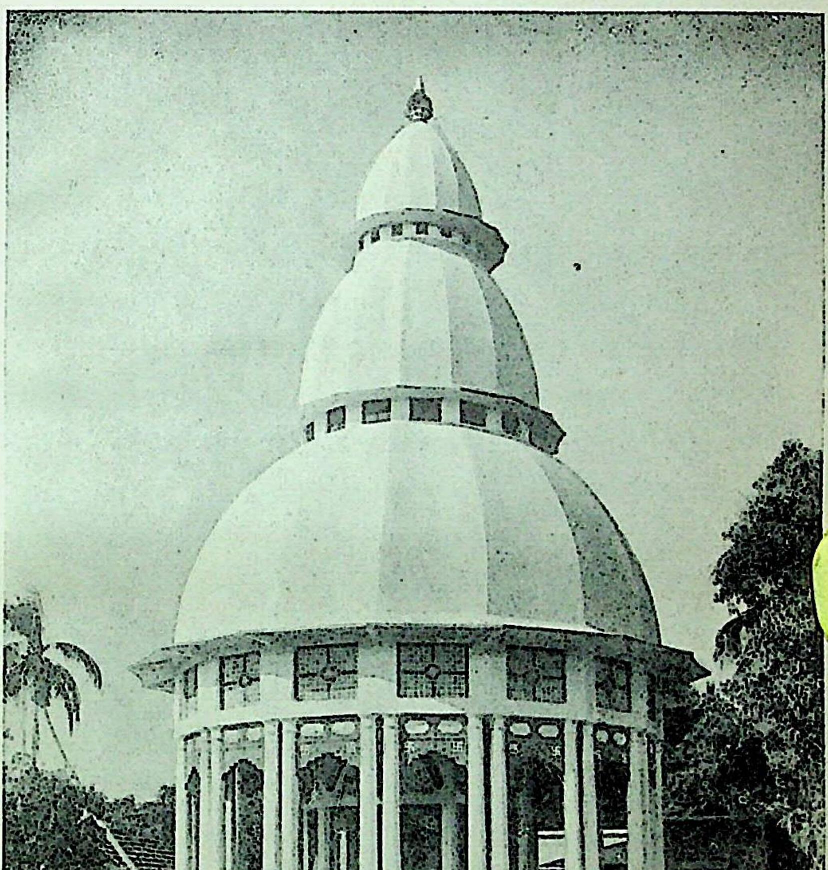

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের সেবামন্দির
ভিঙ্গামাণিক, জিলা ফরিদপুর।

যে মহাপবিত্র স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বাড়ীরই পূর্ব্বাংশে বহির্ব্বাটীতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমতঃ একখানা টালির ছাউনির ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া এই আশ্রম ১৩৪৯ সনের গুরুপূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং কলিকাতা হইতে তাঁহারই জ্যেষ্ঠভ্রাতার পৌত্র শ্রীমান কালাচাঁদের মারফতে দুইখানা চিত্রপট, যাহার একখানা বর্ত্তমান সময়ে এই সেবা মন্দিরে পূজিত হইতেছে। আর অন্যখানা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই সত্যপীরের মূর্ত্তি, খুব ভালভাবে একটি পুরাতন ওয়াটার প্রুফের দ্বারা ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'ওরা যেখান ইচ্ছা সেখান যেন বসায়।' তদনুসারেই বর্ত্তমান চিত্রপটটি স্থাপন করা হয়। শ্রীমান কালাচাঁদ কলিকাতা ফিরিয়া গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই চিত্রপটখানা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানাইলে ঠাকুর বলিলেন যে তিনি পূর্ব্বেই মনে করিয়াছিলেন যে দুইখানা চিত্রপটের মধ্যে ঐ খানাই বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করিবে। ইহার আনুমানিক দুই বৎসর পর এই স্থানে হাজার এক টাকা ব্যয়ে ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত এক বিরাট সত্যনারায়ণ সেবার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও ভক্তগণ আসিয়া যোগদান করায় উৎসব পরমানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবের পর হইতেই এই স্থানে যেন একটী সুন্দর সেবা মন্দির ও তৎ-আনুসঙ্গিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, সেই সম্বন্ধে ভক্তগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে। ঐ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি লইয়া

চৌমুহনীতে এক ভক্ত সম্মেলন আহুত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ সময় চৌমুহনীতে থাকায় বহু দূরবর্ত্তী কলিকাতা আদি স্থান হইতেও ভক্তগণ ঐ সভায় যোগদান করেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৺বিধুভূষণ বসু, প্রমুখ ভক্তগণের সভায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা আদি কার্য্য যাহাতে অতি শীঘ্র আরম্ভ হইতে পারে তজ্জন্য চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ সভাতেই কয়েক হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তৎপর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার একনিষ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া যেন এই কাজটী অতি সত্বর সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে ঠাকুর তাঁহাকে কোন বিষয়ে কিছু বলিবেন এই সংবাদ পাইয়া তিনি একটু ভীত হইয়াছিলেন। কারণ যদিও তিনি সময় সময় তৎপূর্ব্বে ঠাকুরের দর্শন ইচ্ছায় ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরকে কখনও কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া হাত জোড় করিয়া তিনি একটু কাঁপিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপরিউক্ত নির্দ্দেশ পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ঐ সময়ে একজন সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টার হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কার্য্য সম্পন্ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই।

কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত, রবিবাবু ও আমি ডিঙ্গামাণিক গ্রামে এই সেবা মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানে মিলিত হইয়া মন্দির ও আনুসাঙ্গিক গৃহাদি কিভাবে নির্ম্মিত হইবে

তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। ঐ আলোচনা কালে এই মন্দির নির্ম্মাণের সমস্ত খরচ রবিবাবু একাই বহন করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে অপত্তি করিয়া বলি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট কোন কাজই ব্যক্তি বিশেষ সম্পন্ন করুক ইহাই তাঁহার মত নহে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ এই নির্ম্মাণ কার্য্যে কোন ভক্ত এক পয়সা দিয়াও নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইতে পারে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকল সময়েই ইচ্ছা করেন যে তাঁহার ভক্তগণ সকলে মিলিয়া মিশিয়া যথাসম্ভব সাধ্যানুয়ায়ী সমবেত প্রচেষ্টায় আনন্দের সহিত যোগদান করুক। আমার এই কথার উপর রবীন্দ্রবাবু কি অন্য কেহ দ্বিরুক্তি না করায় সকলে মিলিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে ইহাই সাব্যস্ত হইল। মন্দিরটির প্ল্যান কে করিবে তাহা নিয়াও কিছু আলোচনা হইয়াছিল এবং পরিশেষে ইহাই স্থির হইল যে ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত এ, বি, রেলওয়ে কোম্পানীর অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তদনুযায়ী বর্ত্তমান মন্দিরের প্ল্যান তিনিই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই মন্দিরটি অতি সত্বর নির্ম্মাণের জন্য রবিবাবুকে বলিলে ও দেশ বিভাগ হওয়ার পর সিমেণ্ট ও লোহাদি অনেক জিনিষ পত্রই তৎকালে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় টাকাপয়সার কোন অভাব না থাকা এবং রবিবাবুর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ নির্ম্মাণ কার্য্য মাঝে মাঝে স্থগিত রাখিতে বাধ্য হওয়ায় ঐ মন্দির নির্ম্মাণে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এইভাবে গৌণ হইতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর একবার

বলিয়া ফেলিলেন যে পূর্ব্বকালে যখন সিমেণ্টের ব্যবস্থা ছিল না তখন কি প্যাকা বাড়ী মন্দির আদি প্রস্তুত হইত না? চূন সুরকী দিয়া ভাল করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিলেই ত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বাপর সকল সময়ে সকল স্থানে সর্ব্বাবস্থায় ধীর স্থির ভাবের মধ্যে এই প্রকার আকস্মিক ব্যস্ততার দরুণ অথবা যে কোন কারণেই হউক, পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবশ্যকীয় জিনিষ পত্রাদি সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান অতি সুরমা বিরাট উচ্চ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক গৃহাদিও প্রস্তুত হইয়াছে। পদ্মা নদীর কোন কোন অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এই মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এই মন্দিরেরই পশ্চিম দিকে মাত্র কয়েক হাত দূরে এই আশ্রমের মোহন্ত ও আগন্তুক যাত্রীগণের বাসস্থানের জন্য এবং ভোগরান্নাদি কার্য্যের জন্য বিস্তীর্ণ বারান্দা বিশিষ্ট "এল্ সেইপের" একখানা একতালা দালানও নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ দালানের এক কামরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কনিষ্ঠ যমজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ঠাকুরের একখানা চিত্রপট বসাইয়া পূজা অর্চ্চনাদি হইতেছে, লক্ষ্মণ ঠাকুরও চিরকুমার অবস্থায় ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিনামেই সকল সময় মত্ত থাকিতেন। কেহ হরিণাম সংকীর্ত্তন করিতেছে শুনিলে তিনি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনে সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া অনেক সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিতেন, তাঁহার বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতে আরও একটু বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে একটী প্রকাণ্ড জলাশয় আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহার পঙ্ক উদ্ধার করিয়া এবং দক্ষিণ

পাড়ে মন্দিরের নিকটে সিমেণ্টের সুন্দর বাঁধান সুবৃহৎ ঘাট তৈরী করায় উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ সময়েই ঐ জলাশয়ের পশ্চিম পাড়েও একখানা বৃহত্তর পাকা ঘাট প্রস্তুত করা হয়। এই ঘাট দুইখানি হওয়ায় দূরাগত যাত্রীদের ও ঐ আশ্রমের বাসিন্দাদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে।

উপরোক্ত পশ্চিম পাড়ের ঘাটের পশ্চিম দিকে বহির্বাটীর প্রাঙ্গন অবস্থিত। তাহারই পাশ্চমে সাবেক কালের পাতলা ইট নির্ম্মিত সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকাটি কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ছাদের দুই পার্শ্বে সাবেকী ডোমবিশিষ্ট মন্দির আকারের দুইটী কোঠা ছিল। তাহার উত্তরটীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ পূজিত হইতেন এবং দক্ষিণের কোঠায় একটী দোলমঞ্চ ছিল, শেষোক্ত কোঠার উপরের ডোমটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু মঞ্চটী এখনও বিদ্যমান আছে, উত্তরের মন্দিরের সুদৃশ্য কোঠাটি এখনও ঠিক পূর্ব্বাবস্থায়ই আছে। ঐ বাড়ীর লোকের মুখে শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম অবস্থায় ঐ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিতেন। আমি নিজে একাধিক বার ঐ মন্দিরের উপরের তলা পর্য্যন্ত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। ঐ ত্রিতল দালানটি সংস্কার অভাবে বর্ত্তমান সময়ে একটু মলিন দেখাইলেও দর্শক মাত্রেরই মনে উহার পূর্ব্ব গৌরবের স্নিগ্ধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মধুর ছবি ফুটিয়া উঠে। ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ তাঁহাদের ভিতর বাড়ীর বড় ঘরের পূর্ব্বাংশে নিয়মিত ভাবে পূজিত হইতেছে। উক্ত বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণের উত্তরের ভিটাতে দূর্গামণ্ডপ ও দক্ষিণের ভিটাতে বৈঠকখানা অবস্থিত। ঐ দূর্গামণ্ডপের পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মণ ঠাকুরের রোপিত একটি সুন্দর তমাল বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

ঐ বৃক্ষের তলাতেই প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গোৎসবের বোধন হইয়া থাকে, ঐ বাড়ীর উত্তর অংশে নানা ফলের বাগান বহির্ব্বাটীর প্রকাণ্ড জলাশয়ের উত্তর পাড় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে। ঐ জলাশয়ের দক্ষিণ পাড় দিয়া প্রশস্ত রাস্তা পূর্ব্বদিকের বিস্তীর্ণ মাঠ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। যেখানে বাড়ীর দরজার রাস্তা শেষ হইয়াছে তাহার উত্তর পার্শ্বে সামান্য উঁচু জায়গায় একটী বহু শাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড অতি সুন্দর অশোক বৃক্ষ ঐ স্থানটিকে ঢাকিয়া অতি মনোরম নিভৃত ধ্যানের স্থানে পরিণত করিয়াছে। ঐ স্থানে যাইলে আপনা হইতেই মন ধীর, স্থির ভাবাপন্ন হইতে থাকে। ঠাকুরবাড়ীর লোকদের মুখে শুনিয়াছি যে ঐ স্থানেই ঠাকুরের পিতা ৺রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে প্রতি বৎসর শ্মশান কালীর পূজা হইত, বর্ত্তমান সময়ে সত্য-নারায়ণের সেবা মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবের দিন ঐ শ্মশান কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহই ঐ বেদীতে ফুল জল এবং সন্ধ্যায় ধূপধূনা প্রদীপ আদি দেওয়া হয় এবং প্রতি অমাবস্যায় ঐ স্থানে অন্নভোগ দেওয়া হয়।

ঐ স্থানের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার রাস্তার দুইপার্শ্বে দুইটী বহুশাখা বিশিষ্ট অতি সুন্দর প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে, জানিতে পারিলাম ঠাকুরের পিতা ঐ দুইটী বৃক্ষই স্বহস্তে রোপন করিয়াছিলেন। ঐ দুইটী বৃক্ষ প্রহরীরূপে বাড়ীর দুইধারে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবামন্দির ও ঐ বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ স্থানের সামান্য পশ্চিমে বাড়ীর দক্ষিণ ধারে একটী পুকুর বর্ত্তমান আছে। ঐ পুকুরটীকে শ্রীশ্রীঠাকুর 'অমৃতকুণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাড়ীর ভিতরের পুকুরটীকে 'মায়াকুণ্ড' ও বহির্বাটির প্রকাণ্ড জলাশয়কে তিনি 'শ্রীকুণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উক্ত সেবা মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বধারে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট সোজা সিঁড়ির দুইধারে দুইটী অতি সুন্দর কামিনী ফুলের বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। তৎপর বৃহৎ প্রাঙ্গণ খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহাতে একখানা সুন্দর নাটমন্দির প্রস্তুত হওয়ার পরিকল্পনা কয়েক বৎসর যাবৎ চলিতেছে। তাঁহার কৃপায় উহা নির্ম্মিত হইলে উৎসব আদিতে কীর্ত্তন ও পাঠ আদির সুব্যবস্থা হইতে পারে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানা লম্বা টিনের ঘর আছে—তাহা উৎসবের সময় আগন্তুক যাত্রীদের বাসস্থান হয়।

মন্দিরের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে প্রকাণ্ড ফুলের বাগান নানা বর্ণের ফুলে সুশোভিত হইয়া থাকে এবং তাহারই দক্ষিণ ধারে একটি লম্বা পুষ্করিণী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খনন করিয়া মন্দিরের চারিধারের জমি উঁচু করা হইয়াছে।

ঠাকুর বাড়ীর চারিদিকে অনেক মাঠ ও খোলা জায়গা পড়িয়া থাকায় সকল সময়ই ঐ বাড়ীতে আলো বাতাসের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। বাড়ীটার চতুষ্পার্শ্বেই সবুজ পাতায় ঢাকা আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি বৃক্ষে বাড়ীটিকে বস্তুতই অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

ঠাকুর বাড়ী হইতে রাস্তা একটু উত্তর মুখে গিয়া পশ্চিম দিকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জলপথেই নৌকা, লঞ্চ এবং ষ্টীমারে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া ঠাকুর বাড়ী যাতায়াতের সুবিধা আছে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহোদয় মোহন্ত ভাবে এই আশ্রমের অধিনায়ক স্বরূপ বর্ত্তমান

আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি ধীর, স্থির, কর্ম্মকুশল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া তিনি এই আশ্রমের মোহন্ত নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশীতি বৎসর বয়স্ক পূজনীয় শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে এই সেবা কার্য্যে সকল সময় সকল বিষয়ে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। মোহন্ত দাদার সহ-ধর্ম্মিনী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরীর নামও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা অর্চ্চনায় তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতার ভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশ্রমে আগন্তুক ভক্তমাত্রেই তাঁহাদের সকলের অনন্য সাধারণ সৌজন্য, প্রীতি ও স্নেহে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। ঠাকুর বাড়ীর ব্যক্তিমাত্রই অতি মধুর স্নেহমাখা প্রীতি সম্ভাষণ আদির বিষয় আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট প্রথম দুই বৎসরের তাঁহার সকল স্থানের ভক্তগণের জন্মোৎসব বর্ণনা উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছি। এখানকার মোহন্ত মহারাজ ৮৪ বৎসর বয়সে যে কর্ম্মপটুতা, বিনয় ও সৌজন্যের পরিচয় দিতেছেন, তাহা অত্যন্ত বিরল। তাঁহার দুইটি সন্তান শ্রীমান প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তীর পূজা অর্চ্চনা দর্শন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। শ্রীমান সুনীল বেশ ভাল বেতনের চাকুরী করিতেছিল, কিন্তু বিবেকের তাড়নায় তাহা সানন্দে ত্যাগ করিয়া এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাতেই বাকী জীবন যাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহার প্রায় সকল সময়েই নামকীর্ত্তন ও ধ্যানধারণার ভাব ভক্তমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। তাহারই উদ্‌যোগে বাগানের ফুল গাছগুলি এবং নানা প্রকারের তরিতরকারী শাক শব্জী উৎপন্ন হইয়া ঠাকুর সেবায় লাগিয়া থাকে। তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতার শেষ বয়সে সেবাশুশ্রূষা করাও তাহার চাকুরী ছাড়ার

অন্যতম কারণ বলিয়া জানিয়াছি। প্রাতে সাড়ে আটটা—নটায় স্নান পর্য্যন্ত সে মৌনী থাকে। তারপর প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূজা, আরতি ও কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকে।

এই আশ্রমের নিয়ত সেবায় নিযুক্ত আরও কয়েকজনের মধ্যে শ্রীযুক্তা শিশুবালা দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মামাত ভাই এর বালবিধবা কন্যা। অতি অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় প্রায় সারাজীবনই তিনি পিত্রালয়ে অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীতেই আছেন এবং দিবানিশি তথাকার আশ্রমের সর্ব্বপ্রকার সেবায় ব্যস্ত থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দে, শ্রীকানাইলাল কুণ্ড ও গো-পালনে নিযুক্ত মুসলমান বালকটী সহ সকলেই আনন্দে আশ্রমের নানা কাজ করিয়া আশ্রমের কর্ম্ম সম্পাদনে সাহায্য করিতেছে।

দেশ বিভাগের পর হইতে বহু হিন্দু নানা স্থানে চলিয়া যাওয়ায় এই সমৃদ্ধিশালী গ্রামখানা নানা কারণে শ্রীভ্রষ্ট ও নির্জ্জন প্রতীয়মান হইলেও কয়েকজন প্রতিবেশী প্রায়দিনই সন্ধ্যায় ঐ আশ্রমে আসিয়া কীর্ত্তনাদিতে যোগ দেয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায়, এই প্রায় জনশূন্য চারিদিকে নদীতে ঘেরা গ্রামের আশ্রমে নানা অভাব হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই আশ্রমবাসী কাহারও মুখে কোনও অভাব বা নৈরাশ্যের বাণী কখনও শুনিতে পাই নাই। তাঁহাদিগকে ঠাকুর যে অবস্থায় রাখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন। ঠাকুরও নাকি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে শাক তরকারী ভাল যাহা যখন জোটে, তাহা দিয়া ভোগ দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা

যেন কোনই কারণেই বিচলিত না হন। বস্তুতঃপক্ষে ঠাকুরের কৃপায় তাঁহারা কখনও আশ্রম পরিচালনে কোনও অভাবের তাড়না সহ্য করেন নাই এবং প্রয়োজন অনুসারে সকলই যথাসময়ে জুটিয়া যায় বলিয়া তথাকার মোহন্ত মহারাজ ও আশ্রমবাসী স্ত্রী পুরুষ প্রায় সকলের মুখেই শুনিয়াছি। দৃষ্টতঃ শ্রীগুরুর কৃপায় ঐ অভাব বোধ না করায় পরম শান্তিতেই তাঁহারা কাল কাটাইতেছেন। আশ্রমবাসিগণের মধ্যেও পরস্পর মৈত্রীভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রসাদপ্রার্থী মাত্রই কিছু না কিছু প্রসাদ পাইয়া প্রত্যহই পরিতৃপ্ত হয়। এই স্থানের মুসলমানগণ এবং কার্ত্তিকপুরের প্রসিদ্ধ স্থানীয় মুসলমান জমিদার বংশের লোকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও আশ্রমের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ মুসলমান ভক্ত ৺চেরাগালী ভাই এই গ্রামে তাঁহার নিজ বাড়ীতে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও ছোটভাই ঠাকুরেরই আশ্রিত এবং এখনও তাহারা ঐ আশ্রম রক্ষা করিতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিমন্দির ও আশ্রম

যে স্থানে এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা চৌমুহনী হাটের দক্ষিণদিকের মাঠের অংশ বিশেষ, নোয়াখালী জিলার চারিদিক হইতে খালগুলি আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানকে চৌমুহনী বলে। অবস্থানুযায়ী এই স্থানটী ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ অনুকূল। এই খাল সম্মিলনের স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য একটি সুপরিসর উঁচু রাস্তা নোয়াখাবী জিলার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যান্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। উপরোক্ত চতুর্দ্দিকের খালগুলির সঙ্গমস্থলে একটি বড় পুল প্রথমতঃ লোক চলাচলের এবং পরে যানবাহন আদি চলাচলের অসুবিধা দূর করিয়াছে।

এই চৌমুহনী হাটখানা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও অতি নগণ্য ছোট হাট ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাও একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। যখন পাটের ব্যবসা খুব লাভজনক হইয়া উঠিতেছিল তখন 'চিটাগাং কম্পেনী' নামক একটি বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পাট আমদানী ও রপ্তানীর জন্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ কোম্পানীর সাহেবদের বাসস্থানের জন্য প্রথমতঃ উপরোক্ত মাঠের একস্থান ভরাট করিয়া বাঙ্গলো প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ কোম্পানী উঠিয়া যাওয়ায় দুই বৎসর তাহা খালি অবস্থায় পড়িয়াছিল।

এই সময় অর্থাৎ ১৩৪৯ সনের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় শ্রীমান উপেন্দ্র সাহাকে জানাইলেন যে তাঁহার কিছুদিন খুব নিরিবিলি থাকার প্রয়োজন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমান

উপেন তাঁহাকে জানাইল যে তাহাদের উপরোক্ত বাঙ্গলোটি খালি পড়িয়া আছে। তিনি দয়া করিয়া তথায় থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা অবিলম্বে তথায় তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে। এই কথায় ঠাকুর তাঁহার সম্মতি জানাইলে উপেন তৎক্ষণাৎ পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা নরেন ভূঞাকে অবিলম্বে থাকার কামরার সঙ্গে সেনিটারি পায়খানা আদি প্রস্তুত করাইয়া এবং টিউবওয়েল বসাইয়া সংবাদ দিতে লিখিল। নরেন ৩।৪ দিনের মধ্যেই আবশ্যকীয় সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিয়া সংবাদ দিলে, উপেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেই সময় হইতে প্রায় সাত বৎসর অর্থাৎ ১৩২৬ বাং সনের ১৮ই বৈশাখ তাঁহার তিরোধানের দিন পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ই তিনি ঐ স্থানেই বাস করিয়াছেন, যদিও অল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি এ জেলার ও অন্যান্য জেলার কোনও কোনও স্থানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই স্থানে পদার্পণ করার পর কয়েক মাস ঐ বাঙ্গলোর ও কম্পাউণ্ডের দরজা প্রায় সকল সময়ই বন্ধ থাকিত। নেহাৎ সেবাকারী ছাড়া অন্য সকলেরই বাঙ্গলোতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ঠাকুর ঐ সময়ে কাহাকেও দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন না জানিয়া ভক্তগণও অবনত মস্তকে তাঁহার নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন ও অমৃতোপম বাণী শ্রবণের প্রবল ইচ্ছার বেগ সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ক্রমে বহুদূরাগত ভক্তদের মনোবাসনা পূরণের জন্য অথবা অন্য কারণে যাহা একমাত্র ঠাকুরই জানেন ঐ রুদ্ধদ্বার মাঝে মাঝে খুলিতে লাগিল। দুই এক বৎসর পর অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে কোনও

কোনও ভক্ত আসার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন আসিল না এই প্রকার প্রশ্নে তাঁহার নিত্যসেবক উপেন ও নরেন ভায়াকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের না আসার কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদ্রষ্টা ঠাকুরের নিশ্চয়ই অবিদিত ছিল না। কিন্তু এই প্রকার প্রশ্নের দ্বারা তাঁহার স্বভাব সুলভ প্রচ্ছন্ন থাকার চেষ্টাই সূচীত হইত এবং যাহাদের উপস্থিতির জন্য এইরূপ অহৈতুকী ও অস্বাভাবিক ব্যগ্রভাব দেখাইতেন, তাহাদের অশেষ মঙ্গলের জন্য তাহারা যেন একদিনও অনর্থক অনুপস্থিত না থাকে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইস্থানে থাকাকালে ঠাকুর ভোরে উঠিয়া হাতমুখ ধোওয়ার পর কিছুকাল ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেন। তৎপর একখানা বাংলা সংবাদপত্র পড়িতেন। কেহ তাঁহার দর্শন অথবা উপদেশবাণী শ্রবণ করিবার জন্য আসিলে অনতিবিলম্বে ঐ পত্রিকা পড়া বন্ধ করিয়া তাহাকে তাহার প্রার্থনানুযায়ী উপদেশ দিতেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শুনিতে যখনই উৎসুক হইয়া আসিয়াছি তখনই তাঁহাকে প্রণাম করা মাত্র হাতের পত্রিকার কাগজখানা ফেলিয়া রাখিয়া অনবরতঃ আমরা বুঝি আর না-ই বুঝি সর্ব্বোচ্চতম আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে থাকিতেন। আমরা অত্যন্ত নিম্নাধিকারী বলিয়া তাহা প্রায় কিছুই না বুঝিয়া হ্যাঁ করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম, কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতাম এবং ঐ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা হইত না।

নোয়াখালী সহর ঐ স্থান হইতে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত থাকায় এবং উভয় স্থানের মধ্যে রেলগাড়ীর চলাচল থাকায় আমরা দুই ভাই প্রতি রবিবারে এবং যে কোনও কারণে অফিস বন্ধ হইলেই

যথাসাধ্য ঠাকুরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ছাড়িতাম না। কারণ তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ ছাড়াও তাঁহার অতি স্নিগ্ধ পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন ও শ্রীচরণ স্পর্শ করার প্রবল ইচ্ছা আমাদিগকে সজোরে টানিয়া নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিত।

তিনি আমাদিগকে সৎপথে চালিত করার ও বিবেক বুদ্ধি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য সকল সময় খুব অসুস্থ অবস্থায়ও এত বেশী কথা বলিতেন যে আমাদের প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিত; কিন্তু তাঁহার অনর্গল কথা বলিতে থাকা অবস্থায় ঐ কথা বন্ধ করার জন্য ইঙ্গিত দিতেও সাহস করিতাম না। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে শ্রোতাদের মধ্যে সময় সময় এমনও দেখা যাইত যে ঠাকুর প্রাণ দিয়া নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সেইদিকে লক্ষ্য না করিয়া কেহ কেহ পরস্পর কথা বলিতে ব্যস্ত আছেন। ইহাতে আমার ন্যায় দুর্ব্বলদের পক্ষে ধৈর্য্য ধরা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিত।

আমি তাঁহার অতি উচ্চস্তরের উপদেশাবলী খুব কমই বুঝিতে পারিতাম, তৎসঙ্গে কাহারও মনোযোগের সহিত শুনার ও অবহেলা দেখিলে মনে খুবই কষ্ট হইত, সেইজন্য একদিন ঠাকুর খুব ক্লান্ত অবস্থায়ও অনেকক্ষণ কথা বলার পর শ্রোতাগণ সকল চলিয়া গেলে আমি ঠাকুরকে বলিলাম "অত কাতর অবস্থায় অত কথা বলিতে আপনার কষ্ট হয় না?" তদুত্তরে তিনি মৃদুহাসিয়া বলিলেন—"না, কষ্ট হয় না, এই ত আমার কাজ।"

নেহাৎ অসুস্থ না হইলে প্রাতে প্রায় এগারটার সময় কথা বন্ধ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণকে আহার করার জন্য শ্রীমান উপেন অথবা নরেনের বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সময় সময় ইহাও

বলিতেন যে ঐ বাড়ীও আপনাদেরই। সুতরাং সংকোচের কোনও কারণ নাই, ভক্তগণও ঐ নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহাদের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিত। তথায় মৎস্যাদি আহারে কোন বিধিনিষেধ ছিল না।

ঐ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরান্না স্নেহাস্পদ নরেন ভায়ার দ্বারাই প্রায় দিনই সুসম্পন্ন হইত। শ্রীমান উপেন ও নরেন তাহাদের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা পরিচালনের ভার কর্ম্মচারীগণের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রায় সকল সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঐ বাঙ্গলোতেই অবস্থান করিত। রাত্রেও অন্ততপক্ষে তাহাদের মধ্যে একজন, তথায় থাকিত। ঐ সময় তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে নানাপ্রকারের ব্যঞ্জন ও মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীও শিখিয়াছিল। ঠাকুর উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রকেই কিছু না কিছু প্রসাদ দেওয়ার জন্য সকল সময় অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু নিজে একপ্রকার অনাহারী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, নানাপ্রকারের তরীতরকারী লবণ ছাড়া সিদ্ধ, তাহাও অতি সামান্য পরিমাণেই, তিনি সাধারণতঃ গ্রহণ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম যখন এই বাঙ্গলোতে আসিয়াছিলেন তখন ঐ স্থানে ফুলাদির বৃক্ষ প্রায় কিছুই ছিল না। তাঁহার অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ঐ আশ্রমের আয়তন ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং নানা জাতীয় ফুলবৃক্ষে সুশোভিত হইতে লাগিল।

সময় সময় ঐ বাঙ্গলোর কম্পাউণ্ডের দ্বার বন্ধ রাখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভ নিষিদ্ধ বলিয়া সেবকেরা প্রচার করিলেও বহুদূর হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কাহাকেও দর্শনে বঞ্চিত করিতেন না। কেহ কেহ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দর্শন

লাভ করিয়া ধন্য হইত এবং তাঁহার সুমধুর বচনে পরম তৃপ্তিলাভ করিত।

ঠাকুর ছিলেন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। তাহার একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িল, এক বৎসর, আমার দাদা সুধাময় দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা হইল যে তাঁহার নিজহাতে করা তাঁহার বাগানের ফুলকপি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগে দিয়া কৃতার্থ হন। শাক সব্জি বা ফুল বাগান করার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা বা 'hobby' আমার দাদার বরাবরই ছিল, ১৯৪২ সনের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম জেটী অফিসের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আমাদের নোয়াখালীর বাড়ীতে আসিয়াও তিনি সুন্দর বাগান করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে থাকিতে "আশ্রম" হওয়ার পর নিজ বাগানের ফুল কপি ইত্যাদি প্রথমেই তিনি শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবার জন্য আশ্রমে লইয়া যাইতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে কখনও কখনও পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বাসায় আসিলে, তাঁহার ভোগে দিয়া কৃতার্থ হইতেন। নোয়াখালীর বাগানে কপি হওয়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন ভ্রাতা শ্রীমান উপেনের চৌমুহনীর বাঙ্গলোতে কিছুটা নিভৃতেই থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমি ও দাদা দুই, তিন রবিবার চৌমুহনীতে গিয়া তাঁহার দর্শন পাইয়া আসাতে কেহ কেহ নাকি বলিয়াছিলেন যে রায় বাহাদুর ও তাঁহার দাদা আসিলে বাধা হয় না, আর অন্যকে উপেন বাবু ও নরেন বাবু যাইতে দেন না ইত্যাদি। আমরা গেলে অনর্থক ইহারা বিব্রত হইবে মনে করিয়া, আমরা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে যাওয়া বন্ধ করিলাম। আমার বউদির এবং দাদার একান্ত প্রাণের ইচ্ছা ছিল যে—বাগানের দুই,

একটা ফুল কপি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য চৌমুহনীতে দেওয়া হয, কিন্তু সামান্য কয়েকটা ফুলকপি লইয়া উপরোক্ত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতে আমার দাদা অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিতেছিলেন। ক্রমে বাগানের সব ফুলকপি ফুড়াইয়া আসিতে লাগিল। দাদা বউদিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে চৌমুহনীতে বহু ভাল ফুলকপি পাওয়া যায়—সেখানে সামান্য কয়েকটা কপি লইয়া যাইতে তাহার লজ্জা হয় কারণ কেহ মনে করিতে পারেন যে ঐ অজুহাতে তিনি ঠাকুর দর্শন করিয়া গেলেন ইত্যাদি। শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষে সেবার চৌমুহনীর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার মজুমদার ও ৺উপেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়দের বাসা বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে আমরা চৌমুহনীতে গিয়াছিলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বাঙ্গলোর দরজাতে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে সেখানে স্নেহাস্পদ উপেন আমার দাদাকে ডাকিয়া বলিল—'দাদা একটা কথা আপনাকে বলিতে বড়ই দ্বিধা ও ভয় হইতেছে। কারণ একটি ব্যাপারে আমরা বড়ই মনস্তাপ ভোগ করিতেছি আবার আপনিও না দুঃখ পান। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা যে ভোগে ফুলকপি দেওয়া হয়। জানেন ত' চৌমুহনীর হাটে শত শত কপি আসে। সেখান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কপি আনিয়াছি—। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন—সেগুলি ভাল নয়—'ফুটিয়া গিয়াছে'। পরে কুমিল্লা ও ঢাকা হইতেও কপি আনানো হইয়াছে। ঠাকুর সেগুলিও পছন্দ করিলেন না,—কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। জন্মোৎসবের সময় যখন আপনাদের বাসায় গিয়াছিলাম, আপনার বাগানে বড়ই সুন্দর ফুলকপি দেখিয়া আসিয়াছি।—তাহা বোধ হয় এতদিনে শেষ

হইয়া গিয়াছে। দাদা আনন্দে জানাইলেন যে তখনও দুই, চারিটি কপি বাগানে আছে এবং তিনি বাড়ী ফিরিয়াই রাত্রের ট্রেণে একটি ফুলকপি ও গোটা দুয়েক ওল কপি পাঠাইয়া দিলেন। ঐ একটি ফুলকপিই বাগানে তখন ভাল অবস্থায় ছিল। পরে উপেনের নিকট হইতে জানিয়াছিলাম সে যখন কপিটি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিয়া গেল, তাহা হাতে নিয়া তিনি বলিলেন—'এই ত' ঠিক ফুলকপি, ইহা আপনারা কোথায় পাইলেন ?'—আরও ২।১ দিন পূর্ব্বে হইলে আরও ভাল থাকিত। উপেন তাহার দাদার বাগানের কপি বলায়, শ্রীশ্রীঠাকুর নাকি বলিয়াছিলেন, 'সুধাবাবু বাগান করিতে জানেন, তাঁহার উপদেশ নিয়াই বাগান করিবেন। অর্দ্ধেক কপি আজ ভোগে দিবেন। বাকীটা কাল দিবেন। ভোগে দেওয়ার পর আমাদের প্রাণের ঠাকুর সাধারণতঃ যাহা গ্রহণ করিতেন—তাহার চেয়ে অনেকটা বেশীই গ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। ভক্তবাঞ্ছা কল্পগুরু, আমাদের ঠাকুর কিভাবে আমাদের প্রাণের আকুল বাসনা পূর্ণ করিতেন এবং আমাদের আনন্দ দিয়া ধন্য করিতেন, ইহা তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম ধৈর্য্য ও করুণার একটি দৃষ্টান্ত :—

ঐ আশ্রমে বাস করার কালে একজন যুবক বৈষ্ণব ভক্ত কিছুদিন যাবত বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ হইতে নানা কথা উত্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর দিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া অনেক সময় কাটাইত। ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ থাকিলেও সে তাহার ঐ কার্য্য বন্ধ করিত না। ঠাকুর ঐ অবস্থায়ও কোন বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন না এবং প্রত্যহই সে বিদায় লওয়ার সময়

তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে নানাপ্রকারের ফল ও সময় সময় টাকা পয়সাও দিতেন। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমান নরেন ভায়া ঠাকুরের অসুস্থ অবস্থায়ও অনবরত ঐ লোকটী কষ্ট দিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের নিকটে তাহার আসা বন্ধ করিয়া দিল। বেচারী কয়েকবার ঠাকুর দর্শনলাভে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া একদিন অপরের হস্তে গোপনে পত্রদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁহার দর্শন পাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে ঠাকুর আমার সমক্ষেই নরেন ভায়াকে খুব মৃদুস্বরে বলিলেন যে, সে আসিতে চাহিলে তাহাকে যেন বাধা না দেন। ইহাতে নরেন সক্রোধে বলিল, 'না বাবা, এ গুণ্ডা, ভাল মানুষ নয়।' কিন্তু দয়াল ঠাকুর অতি নম্রভাবে পূর্ব্ব আদেশই বলবৎ রাখায় নরেন আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না। সুতরাং ঐ বৈষ্ণব ভক্তটি পুনরায় ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহত্যাগ

১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ আমি পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে উৎসব সমাপনান্তে ২রা বৈশাখ সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনেচ্ছায় ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন বিলনিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঠাকুর ঐ সময় অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার আশ্রিত আমাদের সহৃদয় বন্ধু রায়সাহেব শচীন্দ্র মালাকার মহাশয়দের তথাকার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া ঠাকুর খুবই প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং আমরাও তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন "আমার এই দেহ নিয়া আর লোকালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমাকে গঙ্গার ধারে কোনও জঙ্গলে রাখিয়া আসিতে পারেন? স্বভাবতঃ খুবই অগভীর (Superficial) আমি, এই কথার অর্থ তখন কিছুই বুঝিলাম না, তিনি ঐ সময় ঐ ভাবের আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা স্পষ্ট মনে না থাকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলাম বটে কিন্তু কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না এবং কথাগুলি আমার মনের উপরও বিশেষ কোনও রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

ঐস্থান হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ কালে ঠাকুর আমাকে বলিলেন যে তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে নিয়া যাওয়ার জন্য আমি যেন উপেন ও নরেনকে খবর দিই, আমি একজন খুব বিশ্বস্ত বন্ধুর মারফতে ঐ সংবাদ তাহাদিগকে দিলে শ্রীমান উপেন আসিয়া ঠাকুরকে তথা হইতে চৌমুহনী নিয়া যায়।

যতদূর মনে হয় তার পরের রবিবারেও ঠাকুর সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার চিরন্তন প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া ও অমৃতবাণী শ্রবণে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এবং প্রাতে প্রায় ১১টার সময় প্রসাদ পাওয়ার জন্য যাইতে অতি স্নেহভরে তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ দিন, কি ২রা বৈশাখ বিলনিয়ায় তাঁহার শারিরীক অবস্থা আদি দৃষ্টে ঘুণাক্ষরেও অনুভব করিতে পারি নাই যে সাত দিন পরে আমাদের এক অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয় হৃদয় বিদারক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। ঐদিন শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বিদায় গ্রহণকালেও তিনি চিরন্তন মৃদু মধুর হাস্যপূর্ণ বদনে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

১৮ই বৈশাখ রবিবার ভোরেব গাড়ীতে আমি ও দাদা শ্রীসুধাময় দত্ত চৌমুহনী আশ্রমে আসিয়া শ্রীমান উপেন ও নরেনের নিকট জানিতে পারিলাম যে ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি যে কামরায় ছিলেন তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন এবং তাঁহার পরিধানের কৌপীন, বহির্বাস, কোমরের তাগা আদি কিছুই নাই। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ভয় বিহ্বল চিত্তে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই না বলায় আমরা উদ্বিগ্ন হইলাম। তাঁহার নানাপ্রকারের অসুস্থতা বহুবার দেখিয়া এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হয়ত দুই তিন ঘণ্টা পরেই আবার উঠিয়া বসিয়া আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলাপ করিবেন। এই ভরসাতেই মনকে অনেকটা সান্ত্বনা দিলাম এবং সেই দিন প্রাতে অপর কোন ব্যক্তি যেন ঐ কামরাতে প্রবেশ না করে ইহা সাব্যস্ত করিয়া সেবাকারী ২।১ জন ছাড়া আমরা সকলে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে বরিশালের ঠাকুর ষ্টেটের ম্যানেজার আরও পাঁচ ছয় জন সঙ্গীসহ আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর অত্যন্ত অসুস্থ বিধায় আমি তাঁহাদিগকে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম।

বরিশালের ভদ্রলোকদিগের নিকট জানিতে পারিলাম ম্যানেজার বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত এবং কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তিনি নানাপ্রকারের আবোল তাবোল কথা কিছুদিন যাবৎ বলিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে হয়ত তাঁহার এই আকস্মিক বিকারের প্রতিকার হইবে মনে করিয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে ঐখানে নিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে ঠাকুর মাঝে মাঝে

এইরূপ অসুস্থ হন, আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্বাভাবিক ভাবেই আলাপাদি করেন। সম্ভবতঃ বিকাল বেলায়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। তখন একটু দূরে সরিয়া ঐ বাঙ্গলোর বারান্দার দক্ষিণ-কোণে বসিয়া ঐ ভদ্রলোকগণ কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি যথাসাধ্য কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিনি যন্ত্রনায় বিছানার উপর চরকির মত চারিদিকে ঘুরিতেছেন। ইহাতে আমি অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারি প্রদত্ত "নাম" মনে মনে জপ করিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। একটু পরেই তিনি আমার হাতখানা ধরিয়া আস্তে. সরাইয়া দিলেন। আম সামান্য একটু অপেক্ষা করিয়া আবার ঐভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম, তিনি আবার হাতখানা ধরিয়া ঐভাবে সরাইয়া দিলেন। তারপর আর আমি হাত বুলাইতে সাহস করিলাম না। কেমন একটা ভীষণ আতঙ্কে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরে বারান্দায় আসিয়া শ্রীমান উপেনের কথা শুনিয়া ঐ আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইল। উপেন বলিল যে পূর্ব্বরাত্রে সে যখন ঠাকুরের বিছানার মশারীর নীচে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ঠাকুর বলিলেন, তিনি দেখিলেন সূর্য্য ও চন্দ্র রথ নিয়া তাঁহাকে নিতে আসি-আসিয়াছেন। উপেন ইহাও বলিল যে "দাদা অন্যান্য দিন অসুস্থ হইলেও দেখিয়াছেন ত, প্রায় এগারটার সময় আপনাদিগকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিতেন, আজ ত সেরূপ কিছুই বলিতেছেন না।" আমি তাহাতে সায় দিয়া বলিলাম, কলিকাতায় ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত দাদাকে টেলিগ্রাম করা সঙ্গত। উপেন নেহাৎ ভয়বিহ্বল-

চিত্তে নীরব হইয়া রহিল। একটু পূর্ব্বে আমি ঘরের বারান্দায় থাকাকালে ঠাকুর উপেনকে ডুস্ দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া ডুস্ দিতে সাহস পাইতেছিল না, এমন সময় ঠাকুর একটু জোর করিয়া বলিলেন, "ডুস্ দেয় না কেন ?" ইহাতে উপেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ঠাকুর যখন বলিয়াছেন তখন ডুস্ দিতে ইতস্তত: করিও না।" এই কথার পর ডাক্তার ডুস্ দিল এবং তাহাতে জলের মত কিছুটা মল বাহির হইয়া গেল।

বেলা প্রায় এগারটার সময় উপেন বলিল, 'নরেনদার গদীতে আজ ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আপনারা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আসুন। আমি ও অখিল (উপেনের পিসতুত ভাই) এখানে থাকিব। আমরা খুব তাড়াতাড়ি অতি নিকটস্থ নরেনের গদীতে আহার করিয়া আবার ঠাকুরের নিকটে আসিতেছি ; এমন সময় বরিশালের ভদ্রলোকেরা যাঁহারা একটু পূর্ব্বে আহার করিয়া সেই গদীতেই অন্য কামরায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা আমাকে বলিলেন "প্রাতে আপনার কথা শুনিয়া ম্যানেজার বাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ ঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। এই কথা শুনিয়া আমি মাত্র তাহাদের নিকট যাইয়া বসিয়াছি এমন সময় চৌমুহনীর ব্যবসায়ী শ্রীমান সূর্য্য ভৌমিক অতি সন্ত্রস্তভাবে আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "দাদা, দাদা দেখিয়া যান ঠাকুর কি করিতেছেন ?" এই কথা বলিয়া সে আবার ফিরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে ভয়ানক বিপর্য্যয় আসন্ন মনে করিয়া আমি ও

এইরূপ অসুস্থ হন, আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্বাভাবিক ভাবেই আলাপাদি করেন। সম্ভবতঃ বিকাল বেলায়ই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন। তখন একটু দূরে সরিয়া ঐ বাঙ্গলোর বারান্দার দক্ষিণ-কোণে বসিয়া ঐ ভদ্রলোকগণ কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি যথাসাধ্য কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিনি যন্ত্রনায় বিছানার উপর চরকির মত চারিদিকে ঘুরিতেছেন। ইহাতে আমি অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহারি প্রদত্ত "নাম" মনে মনে জপ করিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। একটু পরেই তিনি আমার হাতখানা ধরিয়া আস্তে সরাইয়া দিলেন। আম সামান্য একটু অপেক্ষা করিয়া আবার ঐভাবে হাত বুলাইতে লাগিলাম, তিনি আবার হাতখানা ধরিয়া ঐভাবে সরাইয়া দিলেন। তারপর আর আমি হাত বুলাইতে সাহস করিলাম না। কেমন একটা ভীষণ আতঙ্কে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পরে বারান্দায় আসিয়া শ্রীমান উপেনের কথা শুনিয়া ঐ আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইল। উপেন বলিল যে পূর্ব্বরাত্রে সে যখন ঠাকুরের বিছানার মশারীর নীচে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় ঠাকুর বলিলেন, তিনি দেখিলেন সূর্য্য ও চন্দ্র রথ নিয়া তাঁহাকে নিতে আসি-আসিয়াছেন। উপেন ইহাও বলিল যে "দাদা অন্যান্য দিন অসুস্থ হইলেও দেখিয়াছেন ত, প্রায় এগারটার সময় আপনাদিগকে প্রসাদ পাইতে যাইতে বলিতেন, আজ ত সেরূপ কিছুই বলিতেছেন না।" আমি তাহাতে সায় দিয়া বলিলাম, কলিকাতায় ডাক্তার জে, এম, দাশগুপ্ত দাদাকে টেলিগ্রাম করা সঙ্গত। উপেন নেহাৎ ভয়বিহ্বল-

চিত্তে নীরব হইয়া রহিল। একটু পূর্ব্বে আমি ঘরের বারান্দায় থাকাকালে ঠাকুর উপেনকে ডুস্ দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া ডুস্ দিতে সাহস পাইতেছিল না, এমন সময় ঠাকুর একটু জোর করিয়া বলিলেন, "ডুস্ দেয় না কেন ?" ইহাতে উপেন একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। আমি বলিলাম, "ঠাকুর যখন বলিয়াছেন তখন ডুস্ দিতে ইতস্ততঃ করিও না।" এই কথার পর ডাক্তার ডুস্ দিল এবং তাহাতে জলের মত কিছুটা মল বাহির হইয়া গেল।

বেলা প্রায় এগারটার সময় উপেন বলিল, 'নরেনদার গদীতে আজ ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আপনারা তাড়াতাড়ি আহার করিয়া আসুন। আমি ও অখিল (উপেনের পিসতুত ভাই) এখানে থাকিব। আমরা খুব তাড়াতাড়ি অতি নিকটস্থ নরেনের গদীতে আহার করিয়া আবার ঠাকুরের নিকটে আসিতেছি ; এমন সময় বরিশালের ভদ্রলোকেরা যাঁহারা একটু পূর্ব্বে আহার করিয়া সেই গদীতেই অন্য কামরায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা আমাকে বলিলেন "প্রাতে আপনার কথা শুনিয়া ম্যানেজার বাবু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ ঠাকুর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। এই কথা শুনিয়া আমি মাত্র তাহাদের নিকট যাইয়া বসিয়াছি এমন সময় চৌমুহনীর ব্যবসায়ী শ্রীমান সূর্য্য ভৌমিক অতি সন্ত্রস্তভাবে আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "দাদা, দাদা দেখিয়া যান ঠাকুর কি করিতেছেন ?" এই কথা বলিয়া সে আবার ফিরিয়া দৌড়াইতে লাগিল। ইহাতে ভয়ানক বিপর্য্যয় আসন্ন মনে করিয়া আমি ও

দাদা তাহার পিছনে দৌড়াইয়া গেলাম। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে তিনি উত্তর শিয়র হইয়া লম্বা হইয়া চক্ষু বুঝিয়া স্থির ভাবে শুইয়া আছেন। আমি তাঁহার বুকে হাত দিলাম এবং একটু গরম বোধ করিয়া বলিলাম "এখনও প্রাণ আছে।" দুই মিনিট পরেই একজন ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল যে হৃদ্‌যন্ত্রের একটু তির্‌তির্‌ ভাব মনে হয়। কিন্তু বাঁচিবার কোনও আশা নাই। আমি এই অবস্থায়ও মনে করিতেছিলাম যে ঠাকুর নিশ্চয়ই আবার উঠিয়া বসিবেন। ইহার মিনিট পাঁচেক পরেই উমেশচন্দ্র চৌধুরী এম, বি, ঠাকুরের হৃদ্‌যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে "আপনারা অনর্থক আশা করিতেছেন। ঠাকুর দেহে নাই।" এই কথা শুনিয়া আমাদের সকলেরি শোকোচ্ছ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। কিন্তু একটু পরেই পরম দয়াল ঠাকুরের কৃপায় মনে হইতে লাগিল ঠাকুর ত স্বয়ংই অনেকবার বলিয়াছেন যে তিনি সকল সময় আমাদের সঙ্গেই আছেন। সুতরাং দেহত্যাগে আমাদের বিশেষ দুঃখের কি কারণ আছে, তিনি ত অনেক সময় বলিতেন যে আমার দেহটাকে নিয়া কেন টানাটানি করিতে চায়। আমি ত সকলের সঙ্গেই আছি। এই রকম নানা সময়ে তাঁহার নানা উক্তিও আচরণাদি মনে হইয়া মন স্বতঃই সান্ত্বনা পাইতে লাগিল। নানাস্থানে টেলিগ্রামের ব্যবস্থা করা হইল। আমি তাড়াতাড়ি নোয়াখালী শহরে গিয়া সকলকে চৌমুহনী আশ্রমে আসিতে বলিয়া পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিলাম।

ঐ দিন ফেনীতে পরলোকগত ৺যামিনী কুমার সাহা মহাশয়ের

বাসাবাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব করিতেছিল। তথায় শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজ, শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবের পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তথায় ভক্তগণ এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া বাসে ট্রেনে সন্ধ্যার কিছুপরেই চৌমুহনী আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীমান উপেনের নিকট পরে জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার শ্রীদেহ ত্যাগের পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর বলিতেছিলেন যে গঙ্গার ধারে কিংবা কোন জঙ্গলে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়। ঠিক এই ভাবের কথা ঠাকুর ২রা বৈশাখ বিলনিয়াতে আমাকে বলিয়াছিলেন। দেহত্যাগের দুই তিন দিন পূর্ব্বে উপেন ও নরেসকে তিনি খুব ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাহারা মনে যথেষ্ট ব্যথা পাইয়াছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ তৎপরদিনই তিনি তাহাদিগকে মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া এমন কি চিবুক ধরিয়া ও এমন স্নেহমাখা বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন যে তাহারা পূর্ব্বের ভৎর্সনার ব্যাথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া সাময়িকভাবে হইলেও পরমানন্দে ডুবিয়াছিল। তখন তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এই অচিন্ত্যনীয় স্নেহ বর্ষণের পরেই তিনি আকস্মিকভাবে অন্তর্দ্ধান করিবেন।

উপেন পরে আমাকে ইহাও বলিয়াছে যে সেদিন আমরা আহার করিতে যাওয়ার পর ঠাকুর অস্ফুষ্ট স্বরে দুই তিন বার বলিয়াছিলেন 'ঘুমাই, ঘুমাই'। তাহাতে তাঁহার ঘুমাইবার ইচ্ছা হইয়াছে মনে করিয়া উপেন অবিলম্বে ঘুম হওয়ার বড়ি আনাইয়া খলে মাড়িতেছিল, এমন সময় সূর্য্য ভৌমিক ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া একটু জোরে বলিয়া উঠিল "দেখুন ঠাকুর কি রকম করেন"। ঐ শব্দে ঠাকুরের

ঘুমের ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া উপেন বিরক্তির ভাবে সূর্য্যকে জোরে ধাক্কা মারিয়া বিছানা হইতে ফেলিয়া দিল। সে অতি ব্যস্ত ভাবে দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে ডাকিয়া আনিল, এই বিষয় পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আমার নিজের কথা বলিতে প্যারি যে আমি কখনও ভাবি নাই অত শীঘ্র আমাদের এই অবস্থায় ফেলিয়া ঠাকুর চলিয়া যাইবেন। যদি কেহ তাঁহার শ্রীদেহ সম্পর্কে কোন কথা তুলিত আমি জোর করিয়া বলিতাম যে আরও অনেক গৌণ আছে। এই কারণেই প্রথমতঃ খুবই বিষণ্ণ হইয়াছিলাম।

এই সম্পর্কে একটি বৈষ্ণব ভক্তের কথা অনেক সময় মনে পড়ে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরের দিন ৺সীতানাথ বৈষ্ণব আমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া আমাকে অশ্বাস দিয়া বলিল, 'দাদা! আপনার বিষণ্ণ হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই। দেখিতে পাইবেন যে প্রকট অবস্থা অপেক্ষা অপ্রকট অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদিগকে অনেক বেশী শক্তি দিবেন।' পরবর্ত্তী সময়ের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝিতেছি তাহার কথা খুবই সত্য। তিনি দেহে নাই বটে, কিন্তু সকল সময়, সকল অবস্থায় শান্তি দিতেছেন এবং কোন অভাবই অপূর্ণ রাখেন না। ধৈর্য্যের অভাবেই আমরা সময় সময় অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ কোথায় দাহ কি সমাধিস্থ হইবে এই বিষয় নিয়া একটু মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছিল। চৌমুহনীর ভক্তগণ স্বভাবতঃই চৌমুহনীতেই উহা সম্পন্ন করা সঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। রায় সাহেব শচীন্দ্র মালাকার প্রমুখ ফেনীর ভক্তগণ ঠাকুরের প্রথম

জীবনের লীলাভূমি ফেনীতেই তাঁহার দেহ লইয়া যাওয়ার সপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ফেনীর জনৈক ভক্ত বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে এই পঞ্চভৌতিক দেহ একটা ত্যাজ্য পদার্থে পরিণত হয়। তখন ইচ্ছা হয় ইহাকে অগ্নিতে ভস্ম করেন, ইচ্ছা হয় উহা মাটীতে পুঁতিয়া রাখেন, ইচ্ছা হয় নদীতে ভাসাইয়া দেন।" ঠাকুরের কথার ভাবে তথাকার ভক্তগণ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ ফেনীর মাটিতে রাখিবার ইঙ্গিত ছিল। আবার কেহ কেহ শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামেই তাঁহার দেহ লইয়া যাওয়ার পক্ষে মত দিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই যুক্তিও দিলেন যে, ঐ স্থানে শ্রীদেহ দাহ কি সমাধিস্থ হইলে দূরাগত ভক্তগণের দুইস্থানে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইবেনা। একই স্থানে আসিয়া উভয় তীর্থের ফল পাইবেন। এই প্রকার মতদ্বৈধ ও নানাভাবের জল্পনা কল্পনায় মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় একটা বিশেষ সমস্যায় পড়িলেন। এমন সময় শ্রীমান নরেন ভূইঞা আমাকে একপার্শ্বে ডাকিয়া নিয়া বলিল, "দাদা, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বেই ত, আমি, জ্ঞান দা ও ব্রজগোপাল বাবুর সমক্ষেই ঠাকুর এই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে এই চৌমুহনী আশ্রমেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে এবং সমাধিস্থান দৈর্ঘ্যে চার হাত, প্রস্থে চার হাত এবং গভীরতা চার হাত হইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি এই কথা শুনিয়া মোহন্ত মহারাজকে বলিলাম যে এবিষয়ে আর কোনও কথা হওয়ারই অবকাশ নাই, কারণ শ্রীমান নরেন

যখন তাঁহার শ্রীমুখে ঐ কথা স্বয়ং শুনিয়াছে, তখন তদনুযায়ী ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতেই হইবে, তাহার একবিন্দুও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। মোহন্ত মহারাজ ঐ কথায় সম্মতি দিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই ঐ বিষয়ে মতানৈক্যের অবসান হইল, প্রকৃত পক্ষে অল্প কয়েক দিন পরে নরেনের কথারই অনুরূপ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন সূচক ৺জ্ঞানাচার্য্য মহাশয়ের পত্রেও পাওয়া গিয়াছিল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থির হইল যে ঠাকুর বাঙ্গলোর যে কক্ষে বাস করিতেন সেই কক্ষেই তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইবে। কলিকাতা এবং অন্যান্য দূরবর্ত্তীস্থান হইতে ভক্তগণ যেন উপস্থিত হইতে পারে তজ্জন্য অন্ততপক্ষে একদিন শ্রীদেহ বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে আরও হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। পরে জনসংখ্যা এত অধিক হইল যে, বেশ একটু উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর উঠাইয়া তাঁহার শ্রীদেহ দর্শনের সুযোগ সকলকে দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় দেড়টার পর শ্রীদেহ যথারীতি স্নান করাইয়া অগুরুআদি নানা দ্রব্যসম্ভারে দেহ সিক্ত করা হইল। অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহারই কৃপায় চারি হাত দৈর্ঘ্য, চারি হাত প্রস্থ ও চারি হাত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া এবং তাহার চতুর্দ্দিক ও নিম্নভাগ ইট, সুরকী ও সিমেণ্ট ইত্যাদি দ্বারা বেশ শক্ত করিয়া বাঁধাইয়া ঠাকুর যে খাটে, যে শয্যায় এবং যে মশারীর নীচে শয়ন করিতেন সেই সব জিনিষ সহ এবং তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি জিনিষ পাশে রাখিয়া চির ভক্ত বাঞ্ছিত পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হইল। ভক্তগণ একদিকে

শোকাশ্রু অপর দিকে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হরিনাম কীর্ত্তন ও মুহুর্মুহু উলুধ্বনির মধ্যে সেই পরম পাবত্র, পরমবাঞ্ছিত, চির সেবিত দেহ সমাধিস্থ করিল। ঠাকুর ভক্তগণের লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন তাহা হইতে কখনই অন্তর্হিত হইতে পারিবেন না।

দেহরক্ষার একাদশ দিবসে ভক্তগণ সমাধিক্ষেত্রে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। নামযজ্ঞ, পূজা, আরতি, ভোগরাগাদি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। হিন্দু, মুসলমান জাতিবর্ণ নির্বিবশেষে সকলেই এই উৎসব সাফল্য মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাকিস্থান সরকার চাউল, তৈল, চিনি ইত্যাদি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি কণ্ট্রোল রেইটে সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দু, মুসলমান জাতিবর্ণ নির্বিবশেষে সমাধিস্থানের উপর এমন ভাবে টাকা পয়সা আদি নিক্ষেপ করিয়াছিল যে সময় সময় টাকা পয়সা বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। মহোৎসবে ঐ বিরাট জনতার প্রত্যেক ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীনাম সংকীর্ত্তনও বহুপ্রহর অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি যেই বাঙ্গলোতে প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন ঐ গৃহই যথাসম্ভব চিরকাল তদবস্থায় রাখা হইবে, না নূতন মন্দির প্রস্তুত করা হইবে, তৎ-সম্বন্ধে ভক্তগণ মধ্যে সামান্য মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যে গৃহে ছিলেন তাহা যথাসম্ভব তদবস্থায় রাখা যদিও সকলেরই বাঞ্ছিত ছিল, কিন্তু

বহু চিন্তার পর নূতন একটি সুরম্য ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করাই সাব্যস্ত হইল, কারণ ক্ষয়শীল টালির ছাদের ও বাঁশের বেড়ার ঘর খুব বেশীদিন ঠিক অবস্থায় রাখা অসম্ভব। সুতরাং উপস্থিত ভক্তমাত্রই নূতন পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করাই স্থির করিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত সুধীররঞ্জন সেন মহাশয়ের দ্বারা সুচিন্তিত একটী সুন্দর প্ল্যান (নক্সা) প্রস্তুত করাইয়া বর্ত্তমান সুরম্য মন্দিরের কাজ আরম্ভ করা হইল। ভক্তগণের আপ্রাণ চেষ্টায় ও শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের মোহন্ত মহারাজের ঐকান্তিক আগ্রহে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইল। ঐ মন্দিরটির চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া খোলা প্রশস্ত বারান্দা সমাধিস্থান প্রদক্ষিণ করার বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়াছে। সম্মুখের অর্থাৎ দক্ষিণদিকের বারান্দা এমনই প্রশস্ত যে, প্রায় একশত লোক তথায় বসিয়া পরমানন্দে কীর্ত্তনাদি করিতে পারে। তথায় প্রত্যহই সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় পূজা আরতি আদির সময় কীর্ত্তন হইয়া থাকে। মন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে সমাধি স্থানের উপরে চার ফুট উচ্চ সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত বাঁধান স্থানের উপরিভাগ বিভিন্ন সময়ে নানা নানা সুন্দর বর্ণের কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে। ঐ স্থান প্রথম দিনের সমাধি স্থান অপেক্ষা অনেক বড় করা হইয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীমান উপেন্দ্রের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, রাজমিস্ত্রীগণ পরবর্ত্তী উপরিভাগের নির্ম্মাণ কার্য্য করার সময় যখন নিম্নস্থ বাঁধান স্থান একটু ফাঁক হইয়াছিল তখন ঐ ফাঁক দিয়া ভিতর হইতে অতি মধুর সুঘ্রাণ পাওয়ায় আর ঐ স্থানে কাজ করা সঙ্গত হইবে না মনে করিয়া উপেনকে জানাইয়াছিল। সেও আসিয়া ঐরূপ অপূর্ব্ব সুগন্ধ পাওয়ায় তাড়াতাড়ি

ঐ ফাঁকা স্থান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছিল। এবং তদনুযায়ী ঐস্থান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ঐ মন্দির সর্ব্বোচ্চ গম্বুজ সহ ৭২।৭৩ ফিট উঁচু হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ গম্বুজের উপর ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট স্থাপন করায় তাহা বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয় এবং উৎসবাদির সময় মন্দিরের গায়ে নানা স্থানে ইলেকট্রিক্ বালব্ লাগাইয়া আলোকিত করিলে অতি মনোরম প্রতিভাত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে এবং বারান্দায় নানা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সুন্দরভাবে লেখা হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে "জয় গোবিন্দ" এমন সুন্দর বৃহদাকারে লেখা হইয়াছে যে, তাহা বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়, এবং শ্রী শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ ভক্তগণ স্পর্শ করিলে তিনি যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন সেই অতি পবিত্র মধুর আশীর্ব্বাদবাণীর স্মৃতি জাগ্রত হইয়া তাহাদিগকে আনন্দে আপ্লুত করে।

এই মন্দিরের সম্মুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বিস্তীর্ণ খালি স্থান পড়িয়াছিল। তথায় বাৎসরিক তিরোধান উৎসব আদি উপলক্ষে সাময়িক ভাবে প্যাণ্ডেল প্রস্তুত করিয়া কীর্ত্তনাদি করা হইত। দুই তিন বৎসরেই বৃষ্টি ও ঝড়ের দরুণ নানা প্রকারের অসুবিধা হওয়ায় তথায় একখানা পাকা নাট মন্দির নির্ম্মাণ করা স্থির হয়। তদনুযায়ী বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টক নির্ম্মিত অত্যন্ত বৃহৎ ও সুন্দর একখানা নাটমন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাতেও তারকব্রহ্ম নাম ও নানা শাস্ত্র বাক্য অতি সুন্দর ভাবে লেখা হওয়ায়, উহার সৌষ্ঠব অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঠিক ঐ প্রকারের সুন্দর নাটমন্দির বাংলা দেশে অতি বিরল।

উপরোক্ত মন্দির ও নাটমন্দিরের পার্শ্বে দুইখানা বৃহৎ পুষ্পোদ্যান

আছে। সেইগুলি বহু গোলাপ, জবা, গন্ধরাজ, পদ্ম আদি নানা প্রকার ফুলে সুশোভিত থাকে।

নাট মন্দিরের দক্ষিণে বৃহৎ প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত দুই ধারে দুই সারি বেলফুল গাছ এবং তাহার পার্শ্বে অন্যান্য ফল গাছ আদি ঐ স্থানের সৌন্দর্য্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়াছে। এই প্রবেশ দ্বারের পূর্ব্ব পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ যাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বে একটু দূরে টিউবওয়েল ও অনেকগুলি স্যানিটারী ল্যাট্রিন (পায়খানা) করা গিয়াছে।

সমাধি মন্দিরের উত্তরদিকেও বৃহৎ প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। তাহার পূর্ব্বধারে মহোৎসব আদির ভোগরন্ধনের ঘর এবং পশ্চিম ও উত্তর ধার ঘেরিয়া কতগুলি টিনের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের একখানা ঘরে সমাধি মন্দির সম্পর্কীয় অফিসের কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার ও মোহন্ত মহারাজ তথায় গেলে তাঁহার বাসের সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর এই আশ্রমের সেবার জন্য কয়েক-জন ভক্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমান স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রথম বৎসর অতি সুষ্ঠুভাবে এই আশ্রমের সেবায়েত এর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে। তাহারই চেষ্টায় ফুলের বাগান আদি ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য সে নিজ হস্তে মিষ্টদ্রব্যাদিও প্রস্তুত করিয়া সেবায় দিত। যাহাতে আগন্তুকমাত্রই বেশ আনন্দের সহিত আশ্রমে থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিত, কীর্ত্তনাদিও তাহার উৎসাহে সুসম্পন্ন হইত। কয়েক বৎসর পর মোহন্ত মহারাজের আদেশেই সে পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামে চলিয়া যায় এবং তথায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেবাব্রতে নিযুক্ত আছে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী সেবায়েত নিযুক্ত হওয়া অবধি আপ্রাণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে ঐ আশ্রমের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিছু না কিছু প্রসাদ না পাইয়া বা আশ্রম-বাসীদের ব্যবহারে আনন্দ না পাইয়া কেহ ঐ আশ্রম হইতে ফিরিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। সমাধি আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্তও শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র নামক একটি বালক গান বাজনা এবং আশ্রম সম্পর্কীয় যাত্রীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছে।

শ্রীমান উপেন্দ্রকুমার সাহার প্রাণ এই সমাধি-আশ্রমেই পড়িয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে তাহার নানা প্রকারের সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ের কার্য্য ছাড়িয়া প্রায় সকল সময়ই এই আশ্রমেই পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে এই আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠববৃদ্ধি তাহার অনন্য চেষ্টায় ক্রমশঃই উন্নতির পথে যাইতেছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে অতি শীঘ্রই বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তথাকার অক্লান্ত কর্ম্মী গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সাহাও আশ্রমের উন্নতি কল্পে পূর্ণোদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন। আশ্রমের ম্যানেজার স্বরূপ বিনা বেতনে স্নেহাস্পদ ভ্রাতা শ্রীমান দীনবন্ধু সাহা তাহার ব্যবসায়ের কার্য্য সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া সকল সময় আশ্রমের কার্য্যে ব্রতী আছে। উপরোক্ত ব্যক্তিদের ও চৌমুহনীর বহু ভক্তের প্রাণ এই আশ্রমেই পড়িয়া থাকায়, ইহা প্রকৃতই আনন্দধামে পরিণত হইয়াছে।

চৌমুহনী কলেজের বহু ছাত্র ও চৌমুহনীবাসী অন্যান্য ভদ্রলোকেরা বিকালে ও সন্ধ্যায় আশ্রম উদ্যানে ও নাটমন্দিরে বেড়াইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

এই আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তাগণমধ্যে কোন কার্য্যে মতদ্বৈধ বা দ্বন্দ্ব কখনও দেখা যায় নাই। এখানে কোন অর্থাভাবের কথাও শোনা যায় নাই। কর্ম্মকর্ত্তাগণ বলেন যে—শ্রীশ্রীঠাকুরই সকল সময় সমস্ত অভাব পূরণ করিতেছেন, সুতরাং অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। তাঁহার কৃপায় প্রতি বৎসর প্রায় ৪০।৫০ হাজার লোক সমাধি উৎসবে ৩।৪ দিন ব্যাপিয়া কীর্ত্তনাদি শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন বৎসরই উৎসবের পর অর্থের ঘাটতি দৃষ্ট হয় নাই।

নানাজাতীয় ফল ও ফুলে শোভিত এই আশ্রমখানা বস্তুতঃই মনোমুগ্ধকর ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শক্তির স্থান সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া ভক্তমাত্রকেই এখানে পরম আনন্দে আপ্লুত করে।

চিতোরের আশ্রম

উল্লিখিত আশ্রম চারিটি ছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজপুতনায় অবস্থান কালে চিতোরেও একখানা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ১৯৩১ সনের অক্টোবর মাসে সিমলা হইতে আমাকে লিখিত কয়েকখানা পত্রে-ও তিনি এই আশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৩১ ইং সনের ১২ই আগষ্ট (অর্থাৎ ১৩৩৮ বাং সনের শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে) শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী (৬২ নং সোনারপুরা, বেনারস সিটি) হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে লিখিয়াছিলেন—"চিতোরের আশ্রমে যাওয়ার জন্য গুরুর নিষেধ হইয়াছে বলিয়া সেখানে যাওয়া হইল না।" কিন্তু ঐ আশ্রমের বিষয় বিস্তারিত ভাবে তিনি কখনও কিছু বলেন নাই, এবং আমি নিজেও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। সম্প্রতি ঐ আশ্রম দেখার ইচ্ছা মনে জাগিলেও, নানা লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা চিতোরের কোন অংশে প্রতিষ্ঠিত না জানিতে পারায়—তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শুনিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজপুতনায় খুব ধনী ভদ্রলোকের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে ঐ ভদ্রলোকের একটি ছেলে কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিয়া দেশে ফিরার পর তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং হাত নাড়িয়া সে কি ভাবে করমর্দ্দন করিতে চাহিয়াছিল দেখাইয়া খুব হাসিতেছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ যুবকের পিতা সাবধান করিয়া দেওয়ায়, সে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। ঠাকুর নিজ হইতে আর কিছু না বলায় আমি ঐ বিষয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

জয়ন্তী মা

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে এবং তাঁহার পত্রে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে শ্রীশ্রীজয়ন্তীমা পাহাড়তলী কৈবল্যধাম আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।

তিনি বস্তুতঃ কে তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার পত্র হইতে

এবং তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি জগৎ জননী মহাশক্তির সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া এখন সিদ্ধ দেহে, লোকনেত্রের অগোচরে জগৎ কল্যাণের মহাব্রতে ব্রতী আছেন। তিনি কৈবল্যধামের অধিষ্ঠাত্রীরূপা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত ধাম প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব হইতে তিনি পৃথিবীর নানা দুর্গম স্থান হইতে অলৌকিক হইয়াও লৌকিক উপায়ে ভাবাবেশে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন, ঐ সকল পত্র হইতে জানা যায় যে মার বহু সেবকবৃন্দ সম্ভবতঃ তাঁহারই ন্যায় সিদ্ধ দেহে ছদ্মবেশ ধারণপুর্ব্বক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচরণ করিতেছেন।

সূক্ষ্মদেহধারিণী শ্রীশ্রীজয়ন্তী মা "বিচ্ছেদানল নামক চিঠি "লিওপুল" "এ্যান্টার্কটিকা" দক্ষিণ মেরু (কুমেরু) হইতে ১২।৭।২১ ইং তারিখে লিখিত হইয়া U. S. A. Philadelphia তে Posted হইয়া পাহাড়তলী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ১০ বৎসর পূর্ব্বে পাহাড়তলী Looco Office এ Carr Supt. নামে পৌঁছে। ইহা ঐ পত্রের কভারের উপরের পোষ্টেল সিল (seal) হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত ডিঙ্গামাণিক গ্রামে ১২৬৬ বাং সনের ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দশমীতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র দেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার ও মাতা ৺কমলা দেবী উভয়েই অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন।

রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পৈতৃক বাসভবন ছিল ডিঙ্গামাণিক হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তর পশ্চিমে জপ্‌সা গ্রামে। বিদ্যালঙ্কার পরিবার তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেন। জপ্‌সা গ্রাম যখন কীর্ত্তিনাশা নদীর গর্ভে বিলীন হয়, তখন রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার ডিঙ্গামাণিক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই ডিঙ্গামাণিক গ্রামও এতদঞ্চলে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার পার্শ্ব দিয়া পদ্মার একটি নাতিপ্রশস্ত শাখা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহারাজ রাজবল্লভের বংশধরগণের বাড়ীর রাজ পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং প্রচুর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পিতার অবর্ত্তমানে ঐ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এক কন্যা ব্যতীত দ্বিতীয় সন্তান ছিল না। সেই কন্যাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যবতী মাতা কমলা দেবী। তিনি পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিনী হইয়া পিত্রালয়ে বাস

করিতেন। রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সেই গৃহেই বাস করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অপর দুই পুত্র গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ ও রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বংশধরগণ এখনও একবাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাধনক্ষেত্র এখনও তাঁহাদের বাড়ীর পূর্ব্বধারে বিদ্যামান আছে। ইহার দৃশ্য অতি মনোরম, গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা ব্যঞ্জক। তাঁহার নিজহস্তে রোপিত দুইটী বকুল গাছ বহু শাখা ও পল্লব বিশিষ্ট হইয়া ঐ সাধন ক্ষেত্রের নিকট দণ্ডায়-মান আছে। তিনি একবেলা কিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণে পরিতৃপ্ত থাকিতেন এবং কখনও মৎস্য বা মাংস আহার করেন নাই। তিনি শীতাতপ সহ্য করার অদ্ভুত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মাঘ মাসের ভয়ানক শীতের রাত্রিতেও তিনি আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া আহ্নিক করিতেন।

রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহরক্ষা কালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয় ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার শিষ্য রাধামাধবের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি কাছাড় অঞ্চলে যাইয়া তথা হইতে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। তৎপর গুরুদেব একদিন বিক্রমপুরে তাঁহার জনৈক শিষ্যের বাড়ী যাইবেন স্থির করিয়া চণ্ডিপুর ষ্টীমার স্টেশনে টিকেট কিনিয়াছিলেন। ষ্টীমারে উঠিবার জন্য সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, এমন সময় তিনি অনুভব করিলেন, কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ

হইতে টানিতেছে, তিনি চেষ্টা করিয়াও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

অন্যত্র না যাইয়া তিনি প্রিয় শিষ্য রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী রওনা হইলেন। ঐ সময়ে রাধামাধর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শেষ বয়সে কঠিন আমাশয় রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। গুরুদেব যেই মাত্র সেই গৃহের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনই শিষ্য পাশ ফিরিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। গুরুদেব আর কালবিলম্ব না করিয়া শিষ্যের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তদ্বয় যন্ত্র-চালিতবৎ গুরুর পদযুগল স্পর্শ করিল। গুরু শিষ্যের মস্তকে পদ-স্থাপন করা মাত্র তাঁহার আত্মা নশ্বর দেহমুক্ত হইয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী কমলা দেবী অতিশয় পুণ্যবতী, সরলা ও সদাশয়া মহিলা ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। কৃচ্ছ - সাধন ও ব্রতাদি উদযাপনে কখনও পরান্মুখ হইতেন না। নিজের সুখ সুবিধা অপেক্ষা পরের সুখ সুবিধার প্রতি তাঁহার অধিকতর লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার দেহরক্ষা সম্বন্ধেও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে বড়দিনের ছুটীর শেষে যে দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের ছেলে সতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ম্মস্থল ময়মনসিংহ রওনা হন, সেইদিন তিনি তাঁহাকে একটি তারিখ উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই দিন তিনি বাড়ী আসিতে পারিবেন কিনা। সতীন্দ্রবাবু কৌতূহলী হইয়া কারণ জানিতে চাহিলে কমলা দেবী বলিলেন, "অশ্বত্থ গাছের স্বপন, ঠিক বলা যায় না। সেইদিন শেষরাত্রে এক ব্রাহ্মণ আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার

আর কতদিন বাকী আছে, হাঁড়িতে আমার আর কত চাউল আছে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন 'আর ছয় মাস মাত্র, চাউল অল্পই আছে।' কি জানি যদি ব্রাহ্মণের কথাই সত্য হয়।" স্বপ্নের ব্রাহ্মণ যে তাঁহার স্বামী সে কথা তিনি প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিলেও সতীন্দ্রবাবু তাঁহার ইঙ্গিতে তাহাই বুঝিয়াছিলেন। সতীন্দ্রবাবু কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরেই কমলা দেবী উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। এদিকে ছয় মাসও পূর্ণ হইল। একদিন প্রাতে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। তাহার উনিশ দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্নেহময়ী জননীর অনুসরণ করেন, ধর্ম্মে তাঁহার গোঁড়ামী ছিলনা। যখন হিন্দুসমাজে প্রবল জাত্যাভিমান বর্ত্তমান ছিল, তখনও তাঁহার ঠাকুর ঘরে সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। দিবসের অধিকাংশ সময়েই পূজার্চ্চনা, ধ্যান ধারণায় তিনি নিবিষ্ট থাকিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও সরল উদার চরিত্র ছিলেন। তিনি ১৩৩৩ বাং সনের ২৪শে ভাদ্র তারিখে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার অন্তিমকালে ঠাকুর কৃপা করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টীক্রিয়ায় যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের যমজ কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ ও কতকটা তাঁহার ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার জীবনে মহাপুরুষের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তিনি সরল চরিত্র, কষ্টসহিষ্ণু, পরোপকারী ও প্রেমভক্তিপরায়ণ ছিলেন। হরিনাম শ্রবনে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইত, তিনি ভাবে গদগদ হইয়া যাইতেন, প্রায়ই আত্মসম্বরন করিতে পারিতেন

না। তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঠের মতন শক্ত, চক্ষু পলকহীন ও স্থির হইয়া যাইত। তিনি চিরকুমার ছিলেন। পীড়িতের সেবা ছিল তাঁর নিত্য কর্ম্ম, তিনি উৎসবে কি ব্যসনে প্রতিবেশীর সাহায্যার্থে ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহাকে সাধারনে "হরি বলা" ঠাকুর বলিত। ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সে তিনি কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু দিবসে ঠাকুর কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে ফিরিয়া তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন লক্ষ্মণকে ৺বিশ্বেশ্বরের পার্শ্বে দেখিলাম।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের একমাত্র সহোদরা ভগ্নী ৺কাশীমণি দেবী। তিনিও অত্যন্ত সরল ও মধুর স্বভাব বিশিষ্টা ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, তিনি এসময়ে অপর বালকদের মতই বালসুলভ খেলাধূলায় মত্ত থাকিতেন, কিন্তু বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি মৃত্তিকার দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাদের পূজা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্ট চিত্তে রামায়ণ গান শুনিতেন। এক দিন তিনি মাকে বলিয়াছিলেন, "মা রামায়ণ গানে কেবল আমার ও লক্ষ্মণের কথাই বলে।"

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মাতাপিতার যত্নের কোন ত্রুটী ছিল না। কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদার বাড়ীর বহির্ব্বাটিতে তৎকালে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। ঐ বিদ্যালয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য বালকের সঙ্গে তথায় যাতায়াত করিতেন বটে কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার তত মনোযোগ ছিল না। বেশীদিন তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভও করেন নাই।

তিনি অন্যান্য বালকের মত চঞ্চল ছিলেন না। খেলার মাঠেই হউক, বিদ্যালয়েই হউক বা গৃহাভ্যন্তরেই হউক তাঁহার চরিত্রের স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইত। ছোট বড় কি সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁহার মৃদুমন্দ আলাপ ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। কখনও তিনি কাহারও সঙ্গে কলহ করেন নাই বা কাহারও মনে ব্যথা দেন নাই। মাতাপিতা কি জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি তিনি একান্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ও অনুগত ছিলেন। চিত্ত তাঁহার অন্তরমুখীই ছিল। বাহিরের যাবতীয় কাজ তিনি করিতেন, কিন্তু মন যেন অন্তর্জগতের কাহারও অনুসন্ধানে ফিরিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঐ সকল গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কনিষ্ঠ সহোদরকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাল্যকাল হইতেই অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও একাগ্রচিত্ত ছিলেন। সংসারের কষ্টসাধ্য কাজ তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে করিয়া যাইতেন। তিনি শ্যামাসঙ্গীত ভাল বাসিতেন এবং শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। কখনও কখনও নিজেও একটু আধটু গান করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁহার পিতা রাধামাধব বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অকস্মাৎ স্বর্গারোহন করিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পরে তাঁহার গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় রোগাক্রান্ত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী কমলা দেবী তাঁহার গুরুদেবকে দেখিবার জন্য তাঁহার পুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া জপ্‌সা গ্রামে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব তাঁহাদের সমক্ষে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

যথাকালে তাঁহাকে সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করা হইল। তদবধি তিনি ত্রিসন্ধ্যা বন্দনাদিতে মনোনিবেশ করিলেন। তখন তিনি আরও ধীর, স্থির এবং চিন্তাশীল হইলেন। এই সময়ে তিনি স্বপ্নে অথবা কোন অপ্রকাশ্য অতীন্দ্রিয় উপায়ে সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। তখন হইতেই তাঁহার তুই, একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ হইতে থাকে। ১২ বৎসর বয়সেই তিনি একদিন গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

বহু বৎসর চলিয়া গেল, ঠাকুরের আর কোন সংবাদ নাই। কেহ কেহ বলিতেন তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, আর সংসারে ফিরিবেন না। জননী ইহাতে নিদারুণ তুঃখ পাইতেন। তিনি পুত্রের জন্য কাঁদিয়া দিন কাটাইতেন, গৃহের অপর সকলেই অনিশ্চিত আশঙ্কায় উদ্বেগ বোধ করিতেন। এমন সময় ঠাকুর অকস্মাৎ একদিন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অল্প কতক দিন পরেই কুলগুরুর অনুমতিক্রমে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে কৌলিক মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইলেন।

ঠাকুর নিরুদ্দেশ থাকাকালীন যাহা ঘটিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরিয়া আসিলে নিজমুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী হিমাদ্রি পত্রিকায় নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"তখন আসাম বেঙ্গল রেল লাইন ছিলনা। লোকে পদব্রজে বা নৌকায় আসাম অঞ্চলের তীর্থ দর্শনে যাতায়াত করিত। হাঁটিয়া যাইবার পথ ছিল গহন বন ও গিরিসঙ্কটের মধ্য

দিয়া। শ্বাপদসঙ্কুল সেই সব পথে যাতায়াত যেমন কষ্টকর তেমনই বিপদজনক ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য, মনোবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার বলে সেই দুর্গম পথে হাঁটিয়া বহুদিনে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র জপ করিতেছেন, হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন মন্দিরের বাহির হইতে "রাম রাম" বলিয়া ডাকিতেছে। ঠাকুর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক তেজোময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি চিনিতে পারিলেন এই মহাপুরুষই একদিন তাঁহাকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন—মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। ঠাকুর তখন নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, ইনিই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্তা। তাঁহারই কৃপায় তিনি এত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াও এত দূরবর্ত্তী পথ হাঁটিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার গুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জটা, উদর স্ফীত, নাভিদেশ গভীর, বাহুদ্বয় দীর্ঘ আজানুলম্বিত, কপাল প্রশস্ত, তিনি যেন শান্তি ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি। ঠাকুর বলিয়াছেন তিনি "অনন্তদেব" নামে পরিচিত।

হিমালয় ভ্রমণ ও সাধু দর্শন ঃ—

ঠাকুর বলিয়াছেন, তদীয় গুরুদেবের সঙ্গে বহু দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া তিনি হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে গুরুদেব তাঁহাকে পর্ব্বতের এক অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। ঠাকুর দেখিলেন সেখানে ছয়জন বিরাটকায় মহাপুরুষ ছয়খানা আসনে

ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি আরও দেখিলেন সেখানে আরও এক খানা আসন পাতিত আছে কিন্তু তাহাতে কেহ উপবিষ্ট নাই।" গুরুদেব ঠাকুরকে সে আসনে বসিতে বলিলেন কিন্তু তিনি সে আসনে বসিতে পারিলেন না। গুরুদেব তাঁহাকে পুনঃ লোকালয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন পথে কোথাও অপেক্ষা না করেন। কৌলিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেও তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপদেশ দিলেন।

হিমালয়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য উপভোগ ও সাধু মহাপুরুষগণের পবিত্র সঙ্গলাভ করার ইচ্ছায় শ্রীশ্রীঠাকুর কতিপয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে উহার নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এক বস্ত্রেই নাকি তিনি এই সময়টা কাটাইয়াছিলেন। "পরম শক্তিমান গুরুদেবের কৃপায় ঠাকুরের অগম্যস্থান, অদৃশ্য বস্তু ও অজ্ঞেয় বিষয় কিছুই ছিলনা। হিমালয়ে ভ্রমণ কালে অনেক আশ্চর্য্য বস্তু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সেই বিচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তের দুই একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মহাপুরুষ দর্শন"—

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন, পর্ব্বতের অতি দুর্গম স্থানে ধ্যান নিরত অনেক মহাপুরুষ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাঁহারা যে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধ্যানরত আছেন তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তাঁহাদের দেহ অসাড় প্রস্তরবৎ, নেত্র মুদ্রিত; স্পন্দনহীন, দেহগুলি অতি দীর্ঘ। যদিও তাঁহারা উপবিষ্ট তথাপি তিনি দাঁড়াইয়া তাঁহাদের মস্তক পর্য্যন্ত নাগাল পান নাই। ঠাকুর ও সঙ্গীগণ বনফুল আনিয়া তাঁহাদের পদে অর্ঘ্য দিতেন এবং নানাবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পাতার উপর রাখিয়া আসিতেন। পর দিন দেখা

যাইত পাতার উপর কোন ফল নাই মনে হইত মহাপুরুষেরাই তাহা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবে ঐ সব অতিকায় মহাপুরুষদের সেবা করিয়া তাঁহারা পরম আনন্দ পাইতেন। ঐ স্থান ত্যাগ করার পূর্ব্বে ঠাকুর ও তাঁহার সঙ্গীগণ যখন ধ্যান নিরত মহাপুরুষদিগকে প্রণাম করিলেন, তখন সেই জড়দেহগুলি হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।" আমি নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে এ সম্বন্ধে বলিতে শুনিয়াছি।

"শ্রীশ্রীঠাকুর তথা হইতে মহাপুরুষদের আশীর্ব্বাদ নিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণও যে যাহার পথে চলিয়া গেল। ঠাকুর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অকস্মাৎ প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন তিনি পরমদয়াল গুরুদেবের কোলে শুইয়া আছেন। গুরুদেব বলিলেন "আমি না তোমাকে পথে অপেক্ষা করিতে রারণ করিয়াছিলাম?" যাহা হউক, তিনি সর্ব্বশক্তিমান গুরুর কৃপায় অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন, গুদেবের অনুকম্পায় তিনি সেই সময় হইতেই ক্ষুধাতৃষ্ণার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইলেন।" পরে ঠাকুরকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

"কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা"—

"গুরুদেবের অনুমতি লইয়া ঠাকুর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পথপার্শ্বে এক কুষ্ঠ রোগী নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার শরীরটা যেন পচিয়া গিয়াছে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। পোকাগুলি তাহাতে কিলবিল করিতেছে। তখনও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। দয়াময় ঠাকুরের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল।

তিনি সেই গলিত পুতিগন্ধময় কুষ্ঠরোগীর পার্শ্বে বসিয়া একটি একটি করিয়া কীট তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। কিছু সময় পর আবার গুরুদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "একটী একটী করিয়া কীট কতদিনে ফেলিবে?" ঠাকুরের হাতে একটা গাছের পাতা দিয়া রোগীর গায়ে ঐ পাতার রস মালিশ করিতে বলিলেন। সেই রস মালিশ করা মাত্রই রোগীর সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হইয়া গেল। তৎপর গুরুদত্ত আর একটি পাতা গায়ে বুলাইয়া দেওয়ায় রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল, এমন কি একটু দাগ পর্য্যন্ত রহিল না। গুরুদেব তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইত্যবসরে রোগী অদৃশ্য হইয়া গেল।

'মহাপুরুষের কায়া পরিবর্ত্তন'—

শ্রীশ্রীঠাকুর যে স্থান হইতে পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে একটা চিম্‌টা ও একটি কমণ্ডলু। ঠাকুর সেখানে বসিলে কিছুক্ষণ পরে একটি সাপ আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সাপটীকে ধরিয়া আগুনে ফেলিয়া দিলেন। সাপটি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একটী পিণ্ডের আকারে পরিণত হইল। সন্ন্যাসী সেই পিণ্ডের দ্বারা সাতটী পিণ্ড তৈয়ার করিয়া চারিদিকে চারিটী, একটী উর্দ্ধদিকে ও একটী আগুনে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্টটি নিজে খাইয়া ফেলিলেন। তৎপর তিনি সটান মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দেহ স্ফীত হইতে হইতে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিল। অবশেষে উহা ফাটিয়া গেল এবং তাঁহার দেহ হইতে ষোড়শ বর্ষের এক যুবা পুরুষ নির্গত হইয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃত দেহটী আগুনে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চিম্‌টা,

কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়া চলিয়া গেলেন। যুবক চলিয়া গেলে তিনিও সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিলেন।

যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর অসীম শক্তি আহরণ করিয়া দেশে ফিরিলেন, তাঁহার বাক্যে বা আচরণে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইত না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও প্রায় সেইরূপ, যেন সংসারের লোক—সংসারের সুখ দুঃখের ভাগী।

সংসারে অর্থের অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জন মানসে গৃহ হইতে নোয়াখালী সহরে চলিয়া যান। তথায় এক ইঞ্জিনীয়ারের বাসায় পাচকের কাজে নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনে এইরূপ একটা বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, তিনি যখন যে কাজে নিযুক্ত হইতেন তাহা যতদূর সম্ভব সুন্দররূপেই সম্পন্ন করিতেন। একখানা পাক-প্রণালী কিনিয়া নিয়া তাহার সাহায্যে নানাবিধ মুখরোচক ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাসায় ঠাকুর যখন পাচকের কাজে রত ছিলেন, তখন কেহই তাঁহার স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই। সুতরাং গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে সাধারণ পাচক ব্রাহ্মণের মত মনে করিতেন এবং তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহারই করিতেন। কর্ত্তা আহার করিয়া অফিসে বা কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইতেন, গৃহকর্ত্রী আহারান্তে নিদ্রা যাইতেন। রান্নাঘরে কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন তাঁহাদের হইত না।

সকলের খাওয়া শেষ হইলে ঠাকুর নিজের খাওয়ার দ্রব্য থালায় রাখিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন। ফিরিয়া যখন পাকশালায়

আসিতেন, তখন আর কেহই সেখানে থাকিত না। তিনি তাঁহার আহার্য্য নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে ফেলিয়া দিতেন। দুইটী শেয়াল আসিয়া উহা খাইত, বাড়ীর সকলে জানিত পাচক রোজই আহার করিয়া থাকে। তিনি যে আহার করেন না, তাহা কাহারও বুঝিবার সুযোগ ছিলনা, থালা বাটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। অনাহারে থাকিলেও তাঁহার চেহারার কোন পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইত না। পূর্ব্ববৎ সবল ও পুষ্টই দেখাইত।

কিছুদিন পর প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল। গৃহকর্ত্তা চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। একজন অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা পাচকের কাজ করাইয়াছেন ভাবিয়া তিনি লজ্জিত ও শঙ্কিত হইলেন। তদবধি তিনি ঠাকুরকে আর পাচকের কাজ করিতে দেন নাই। তাঁহার এক ওভারসিয়ারের অধীনে সরকারের কাজে নিয়োগ করিয়া দিলেন। ঐ সময় তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা প্রায় সমস্তই মা, ভাই প্রভৃতির জন্য গৃহে পাঠাইতেন। অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিত পোষ্ট অফিসে জমা রাখিতেন।

নোয়াখালীতে আরও কয়েকটী ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচ্ছন্ন শক্তি বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে তিনি সহরের নিকটবর্ত্তী বনে যাইয়া প্রতি রাত্রিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন। সারারাত সেই বনেই কাটাইতেন। রাত্রিকালে তিনি ঐ বনে কি করিতেন তাহা জানিবার জন্য কাহারও কাহারও কৌতূহল হইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই বলিতেন না। একদিন ঐ কৌতূহলাক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন ঠাকুরকে বলিলেন যে,তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ঐ নিভৃত স্থানে যাইবেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ

করা সত্বেও তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। একটি পুল পার হইয়া ঐ বনে যাইতে হইত। ঠাকুর আগেই পুল পার হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুলের মধ্যস্থলে গেলে চারিদিক হইতে তাঁহাদের প্রতি ঢিল আসিতে লাগিল, কিন্তু একটী ঢিলও তাঁহাদের গায়ের উপর পড়ে নাই। তাঁহারা এমন সঙ্কটে পড়িলেন যে সম্মুখেও যাইতে পারেন না, পিছনেও ফিরিতে পারেন না। তখন তাঁহারা নিরূপায় হইয়া ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "রাম, আমাদের অপরাধ হইয়াছে আমরা এখনই ফিরিয়া যাইতেছি।" তখন ঢিল পড়া বন্ধ হইল এবং তাঁহারাও নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার বিষয় তাঁহাদেরই মধ্যে একজন বলার সময় ১৩১১ বাং সনে উত্তরপাড়ায় (পশ্চিম বঙ্গে) শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র মহেন্দ্রবাবু শুনিয়াছিলেন। উত্তরপাড়ার সেই ভদ্রলোক তখন আরও একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—"এক রাত্রিতে রামসাধু প্রমুখ কয়েকজন লোক নোয়াখালীতে কোন এক বাড়ীতে হরি সংকীর্ত্তন শুনিতে যাইতেছিলেন। একটা মাঠের মধ্য দিয়া তাহাদের পথ। রামসাধু ছিলেন সকলের অগ্রে। হঠাৎ তিনি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। কৌতূহলী হইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন যে একটা বিষধর কেউটে সাপ রামসাধুর একখানা পা জড়াইয়া হাঁটুর দিকে ফণা বিস্তার পূর্ব্বক ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছে। সকলে ভয়ে হত বুদ্ধি হইয়া গেলেন। রামসাধু কিন্তু নির্ভয়, অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ পা খানা একটু তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি না দেখিয়া ব্যথা দিয়াছি, ক্ষমা

কর।" সাপ ঐ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর ফণা গুটাইয়া আস্তে আস্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।"

নোয়াখালীতে অবিনাশচন্দ্র ময়রা নামে এক মিঠাইওয়ালা ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ছিল শান্তিপুরে। নোয়াখালী সহরে তাঁহার একখানা মিঠাইএর দোকান ছিল। অবিনাশের দোকান বড়বাজারের উত্তর দক্ষিণ মুখ রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ছিল। তাহারই পশ্চিমে নোয়াখালী বড়বাজারের প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ কালী বাড়ীতে যাইতে হইলে অবিনাশের দোকানের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইত। ঐ সময় ঠাকুর বামারচণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে তৎকালীন পি, ডব্লউ, ডি (P. W. D) এস, ডি, ওর বাড়ীতে পাচক রূপে ছিলেন। উক্ত বামাচরণ বাবু তাঁহার চাকর ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন ঐ কালী বাড়ীতে একটি পাঁঠা সহ পূজা দিতে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুর কালীবাড়ীতে আসিয়াই মন্দিরের মধ্যে আসন গ্রহণ করার পর ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। চাকর অপরাহ্ণ তিন, চারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কালীবাড়তে পাঁঠাটি বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। অবিনাশ ঐ নির্ম্মল ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হয় এবং রাত্রে উক্ত কালীবাড়ীর একখানা ঘরে বসিয়া রাত্র যতই গভীর হইতে লাগিল ততই মনোযোগের সহিত নির্ণিমেষ লোচনে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ শেষরাত্রে সে দেখিল যে, পাঁঠা বলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কী ভাবে বলি হইল, কে পাঁঠাটি ধরিল, বা বলি দিল ইত্যাদি কিছুই অনুধাবন করিতে পারিল না। তৎপর সে দেখিল যে, ঠাকুর পাঁঠাটির চারটী পা বাঁধিয়া তাহা এক হাতে এবং অপর হাতে নৈবেদ্যাদি বাঁধা গামছা লইয়া চলিয়া যাইতেছেন।

এই অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অবিনাশ স্বতঃই বিস্মিত হইল এবং ঠাকুর যে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই মনে করিয়া তাহার মুক্তির উদ্দেশ্যে ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিল। ঠাকুর তাহার করুণ ক্রন্দনে ও প্রার্থনায় তাহাকে নাম বা দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি বাল্যকাল হইতে নোয়াখালীতে এই ঘটনার বিষয় বহুলোকের মুখে সামান্য বিভিন্ন বিভিন্ন বর্ণনায় শুনিয়াছি। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে সমসাময়িক কালের শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও উক্ত অবিনাশের অতি স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র কাহিলী মহাশয়ের নিকট এই বিষয় বিস্তারিত ভাবে যথাসম্ভব সঠিক অবগত হইয়া উপরোক্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি ছিল অবিনাশের অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। ঠাকুরও তাঁহাকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এক রাত্রিতে অবিনাশ এবং তাহার স্ত্রী নিজ গৃহে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় অবিনাশ স্বপ্নে দেখিলেন যে এক চোর তাঁহার গহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব চুরি করিতে উদ্যত হইয়াছে ও তাঁহার ক্যাশ বাক্সটী লইয়া যাইতেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঠাকুর যেন তাঁহার কানে কানে বলিতেছেন, "অবিনাশ তুই এখনও ঘুমাইয়া আছিস্, চোর যে তোর সর্ব্বস্ব লইয়া গেল।" তৎক্ষণাৎ অবিনাশের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং চোখ মেলিয়া দেখিলেন সত্যই চোর তাঁহার ক্যাশ বাক্স বাহির করিতেছে। তৎক্ষণাৎ অবিনাশ চীৎকার করিয়া উঠিলে, চোর বাক্স ফেলিয়া পলায়ন করিল। অবিনাশ আলো জ্বালিয়া দেখিলেন চোর তাঁহার কিছুই নিতে পারে নাই।

নোয়াখালী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক ওভারসিয়ারের অধীনে

ওয়ার্ক সরকারের কাজে ফেনীতে বদলি হইয়া গেলেন। ডিঙ্গামাণিক গ্রামের ৮কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তখন ফেনীতে কাজ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঠাকুরের অলৌকিক কার্য্যকলাপ দর্শনে অনেকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তখন তথায় মহকুমা হাকিমের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সকলের প্রতি সমভাবের উল্লেখ করিতে গিয়া নবীনবাবুর লিখিত 'আমার জীবন' গ্রন্থ হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। যদিও ঐ গ্রন্থের চতুর্থভাগে "প্রচারক না প্রবঞ্চক" এই অধ্যায়ে তিনি বহু প্রচারক ও সাধু সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিয়াছেন, ঐ অধ্যায়েই ঠাকুরের অলৌকিক শক্তিতে ও আধ্যাত্মিকজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিতে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রাণভরা আন্তরিকতার সহিত বারংবার অর্পণ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে নোয়াখালীর ও ফেনীর কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"গল্প উঠিল যে একদিন সে (রামঠাকুর) আহ্নিকে বসিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—'আহা! অমুকের শিশুপুত্রটি মারা গেল, বাস্তবিক নোয়াখালী সহরের অন্যস্থানে ঠিক সেই সময়ে সেই শিশুটির দৈব ঘটনাতে মৃত্যু হইল। তাহার পর রামঠাকুর যখন ফেনীতে আসিল লোকে বলিতে লাগিল যে কখনও তাহাকে গৃহে আহ্নিকে দেখিয়াছে এবং পরের মুহূর্ত্তে রামঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছে। কেহ তাহাকে রাত্রি-শেষে রক্তচন্দন চর্চ্চিত অবস্থায় কোন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। সর্পদংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে আর রামঠাকুর বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে, নিজে কিছুই আহার করে

না। কদাচিৎ দুগ্ধ বা ফল আহার করে অথচ তাহার সবল সুস্থ শরীর, পরসেবায় তাহার পরম আনন্দ।"

"সেই সময় নোয়াখালী হইতে বহুদুর ভবানীগঞ্জে স্টিমারে উঠিতে হইত। রামঠাকুর একদিন একটি আত্মীয়কে স্টিমারে তুলিয়া দিয়া ফিরিতে রাত্রি হইলে একটি মস্‌জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গভীর রাত্রিতে রামঠাকুর দেখিল, মস্‌জিদ আলোকিত হইয়াছে এবং তাহার গুরুদেব আর দুইজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কৌশিকী পর্ব্বত হইতে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন!" পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন যে ঐ মসজিদে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"আর একটি গল্প বহুলোকের মুখে, সর্ব্বশেষে রামঠাকুরের নিজ-মুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাহার গুরুদেব প্রতিশ্রুত ছিলেন। রাম-ঠাকুর ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরি-দর্শনে আসিবেন বলিয়া ওভারসিয়ার ছুটী দিলেন না। রামঠাকুর শিবচতুর্দ্দশীর প্রাতে বড় মনোদুঃখে বসিয়া গুরুদেব তাহাকে কেন এই দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন ভাবিতেছে, এমন সময়ে টেলিগ্রাম আসিল যে সাহেব আসিবেন না। তাহার ছুটী মঞ্জুর হইল। রাম-ঠাকুর-আনন্দে আত্মহারা হইয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে ছুটিল কিন্তু অকস্মাৎ উত্তেজনায় ভ্রান্ত হইয়া দক্ষিণমুখে না গিয়া উত্তর মুখে চলিল। কিছু-দূর গেলে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল যে, রাম-ঠাকুর চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে যাইতেছে। তখন ভ্রম বুঝিয়া এক বৃক্ষতলায় বড় সন্তপ্ত হৃদয়ে বসিয়া আছে এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসী

আসিয়া উপস্থিত হইয়া রামঠাকুর কি চন্দ্রনাথ যাইবে জিজ্ঞাসা করিল। রামঠাকুর বলিল যে ভ্রমবশতঃ বিপরীত দিকে আসিয়াছে। অতএব সেদিন আর চন্দ্রনাথে পৌছিবার সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন এবং পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বত্য পথে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত করিলেন। সেই স্থান হইতে চন্দ্রনাথ চল্লিশ এবং ফেনী হইতে ত্রিশ মাইলের পথ। সেই রাত্রি সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত করিবার পর আবার সেইরূপ অজ্ঞাতভাবে তাহাকে আনিয়া ফেনীর উত্তরদিকে একটী স্থানে রাখিয়া গেলেন। সেখানে একজন পেয়াদার সঙ্গে রামঠাকুরের সাক্ষাৎ হইতেই সে লুকাইতেছিল। পেয়াদা তাহাকে পাকড়াও করিল এবং তাহার দ্বারা মহম্মদের এক রাত্রিতে বিশ্বভ্রমণের ন্যায় এই তীর্থদর্শন কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইল।"

"রামঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্তমূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না—কোন কথা কহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার আট হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য বাংলা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এমনকি প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম এবং পতিপত্নী মুগ্ধ চিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা সকল শুনিতাম। বলাবাহুল্য সে পেশাদারী হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে।"

"একদিন রাণাঘাটে উষাক্ষণে জাগিয়া স্ত্রী বলিলেন যে তিনি সেবার কালীদর্শন করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন রামঠাকুর কালীঘাটে

আসিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে কেন দেখা করিলনা—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, কেমন করিয়া বলিব। মুখ প্রক্ষালন করিয়া আমি আপিসকক্ষে সোফার উপর বসিয়া যেই বাহির দিকে দেখিতেছি, দেখি আমার সম্মুখে বারান্দায় অধোমুখে স্থিরভাবে রামঠাকুর দাঁড়াইয়া আছে। আমার বোধ হইল, যেন রামঠাকুর আকাশ হইতে সেইস্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যথা আমি তাহাকে আসিতে দেখিতে পাইতাম। তাহার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিয়াছি রামঠাকুর এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে।”

শ্রীশ্রীঠাকুর সকল সময়েই প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন। কখনও কোন অলৌকিক শক্তি স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা দূরে থাকুক, যদি কোন প্রকারে তাঁহার কোন ঐশ্বর্য্য কাহারও নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহা তিনি গোপন করার জন্য নানা প্রকার কথা বলিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ফেনীতে ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহার দর্শন লাভ কামনায় দলে দলে লোক আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্রই চাকুরী ত্যাগ করিয়া ফেনী হইতে বিদায় লইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার তৎকালীন কার্য্যস্থল নোয়াখালী হইতে আসিয়া বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর লোকদের নিকট জানিতে পারিলাম যে, তিনি তৎকালে তাঁহাদের বাড়ীর একখানা খড়ের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া অনেক সময় একাকী থাকিতেন। ঐ ঘরে এত সময় তিনি কি করেন তাহা জানিবার জন্য সময় সময় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেন যে “শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাসনে গভীর ধ্যানমগ্ন। তাঁহার সমস্ত দেহ নিস্পন্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের

গতি রুদ্ধ। রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে নিবদ্ধ। গ্রীবাদেশ স্ফীত কণ্ঠ হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটা অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হইত। এ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, তিনি ঐ অবস্থায়ই উপবিষ্ট থাকিতেন।"

তাঁহাদের বাড়ীতে যে একখানা পুরাতন দোতলা দালান আছে। তাহার উপরে এক কোঠায় তৎকালে এক শিব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠাকুর প্রতিদিন প্রাতে ফুল জল বিল্বপত্র লইয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিতেন ও বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঐ ঘরে কাটাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদ্বন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন রায়পুর থানায় কাজ করিতেন তখন তাঁহার স্ত্রী প্রসন্নকুমারী তাঁহার নিকট ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—এক দিবস সন্ধ্যার সময় তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিতে যাইয়া তিনি দেখেন শ্রীশ্রীঠাকুর পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতেছেন। তিনি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ভীত হইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন "সোনা ঠাকুর একি করিতেছেন?" তাঁহার একথা শ্রবণ মাত্র ঠাকুর সশব্দে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন 'আপনি যাহা দেখিলেন তাহা যেন আর, কাহাকে ও না বলেন।"

এইরূপ আর একটী ঘটনা পরমশ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ৺ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বেদবাণীর ২য় খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। সে ঘটনাটি তাঁহার ভাষাতেই নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

"বিক্রমপুর বেজগাঁও নিবাসী সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছিলাম যে তাঁহার যখন ৪।৫ বৎসর বয়স সেই সময় ঠাকুর কিছু-

কাল তাঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি ঠাকুরের অত্যন্ত নেওটা হইয়াছিলেন এবং অনেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহার স্নেহের অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া বাহির বাড়ীর একখানা টিনের ঘরে শুইয়াছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বালক ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে হঠাৎ কোন কারণে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়াই বালক দেখিল যে ঠাকুর পদ্মাসনে শূন্যে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মাথা ঘরের চালে যাইয়া ঠেকিয়াছে। বালক চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাড়াতাড়ী নামিয়া আসিলেন এবং নানা কথা বলিয়া বালককে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন।”

ঐ সময় ঠাকুর প্রায় কিছুই আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না। স্নান করিবার পর কোনদিন একটু বেলপাতা, কোনদিন হয়ত একটু বটের কশ খাইতেন। সময় সময় ২।১ ফোঁটা ঘৃতও জিহ্বায় দিতেন। এইরূপ একপ্রকার অনাহারে থাকিলেও তাঁহার দেহের কান্তি ও পুষ্টি বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নাই। শক্তির কোন অপচয়ও ঘটে নাই এবং উত্তরোত্তর তাঁহার দেহ আরও সবল এবং উজ্জ্বল হইয়াছিল। সেই সময় তিনি ব্যায়ামের চর্চ্চা করিতেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বুকডন, মুগুরভাজা প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ঠাকুর সময় সময় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহার মাকে খাইতে দিতেন, নিজে কিছুই খাইতেন না। ইহাতে স্নেহময়ী জননীর প্রাণ বড়ই কাঁদিত। তিনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে আহার করিয়া উঠিতেন। মা প্রথম প্রথম তাঁহাকে আহার করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে পুত্রকে অতি কষ্টেই তাঁহার

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে হয় তখন হইতে তিনি আর কিছু বলিতেন না। একদিন জননীর বিশেষ অনুরোধে একটু দুগ্ধ পান করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিছুদিন এইভাবে বাড়ী থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার নিরুদ্দেশ হইলেন এবং বহু বৎসর কেহই তাঁহার আর খোঁজখবর পায় নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন যে প্রায় ষাট কি ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে আনুমাণিক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, ১৩০৩ বঙ্গাব্দে যখন কলিকাতা থাকিয়া তিনি স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদিন কালীঘাটে কালীমাতার উদ্দেশ্যে একটী ছাগ বলিদান মানসে মন্দিরের ফটকে তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাত্রীদের ভীড় এত বেশী ছিল যে তিনি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "সতীন্দ্র"। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন যে বহুদিনের নিরুদ্দিষ্ট তাঁহার খুল্লতাত "রাম" তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেলেন। মনে করিলেন যেন স্বর্গ হইতে দেবতা তাঁহার অভীষ্ট পূরণের জন্য নামিয়া আসিয়াছেন। বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরণ হইতেছিল না। ঠাকুর তাঁহার স্বভাবসুলভ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে চল, পূজা ও বলির সব কিছু ঠিক করিয়া দিব।" ঠাকুরকে দেখিয়া পাণ্ডারা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, সতীন্দ্র বাবুও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। যথাবিহিত পূজা ও বলিদান হইল। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র জানিয়া হালদার পরিবার তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের অসামান্য যোগবলের পরিচয়

পাইয়া কালীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বয়স বোধ হয় ৩৭।৩৮ বৎসর ছিল। ঐ সমসাময়িক কালেই খুব সম্ভবতঃ কিষণলালের অত্যন্ত কাকুতি মিনতিতে দয়াল ঠাকুর অভিভূত হইয়া তাহাকে দীক্ষা দিয়া চিরতরে পুনঃ পুনঃ গতাগতিময় সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

ডিঙ্গামাণিক গ্রামের বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে কালীঘাটে থাকিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে ঐ সময় রামের হস্তস্পর্শে বহুপীড়িত ব্যক্তি কঠিন পীড়া হইতেও মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানেও অতি গোপন ভাবেই ছিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্য হইতে দূরে কোন নিভৃত স্থানে এক দরিদ্র বৈষ্ণবের কুটীর বাছিয়া লইয়া তাহাতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। আবার কালীঘাট হইতেও এক সময়ে তিনি অদৃশ্য হইলেন।

এই সাক্ষাৎ ঘটিবার ৬ মাস পর যে দিন সতীন্দ্রবাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করিবেন, সেদিন দেখিলেন ঠাকুর ঐ স্কুলের গেইটে দাঁড়াইয়া আছেন। সতীন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন ঠাকুর কেমন করিয়া জানিলেন যে আজ তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এবং সেই পরীক্ষার কেন্দ্র হেয়ার স্কুল। তিনি ঠাকুরের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর কিছুকাল শান্তিপুরে বাস করিয়া আবার কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। উক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি

বলিয়াছেন, ঠাকুর তখন সুক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতেন। একই সময় তাঁহাকে কলিকাতায় ও সিমলায় দেখা গিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঠাকুরের জন্মভূমিতে তাঁহার বাড়ীতেও আসিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সতীন্দ্রবাবু মৈমনসিংহ দেওয়ানী আদালতে কাজ করিতেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। চিকিৎসক গণের কোন চিকিৎসায় ফলোদয় না হওয়ায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার পিতৃদেব শ্রীশ্রীঠাকুরকে কালীঘাটের ঠিকানায় ডাকে এক পত্র পাঠাইলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই ঠাকুর স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনেই সুরেন বাবুকে রোগমুক্ত করিয়া দিলেন।

সতীন্দ্রবাবু বাড়ী হইতে যে দিন তাঁহার কার্য্যস্থলে রওনা হইবেন সেদিন ঠাকুরের স্নেহময়ী জননীর আদেশে তিনি ঠাকুরকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই ঠাকুর রাজী হইতেছেন না দেখিয়া তিনি ধর্ণা দিয়া ঠাকুরের পায়ের উপর পড়িয়াছিলেন এবং বিবাহের পক্ষে নানা যুক্তি দেখাইতে-ছিলেন। ঠাকুর প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। তত্রাচ তিনি কিছুতেই ঠাকুরের পা না ছাড়ায় এবং অনেক সাধ্যসাধনার পর ঠাকুর বিবাহের সম্মতি দিলেন। প্রথমতঃ তিনি সতীন্দ্রবাবুকেই কন্যা দেখিতে বলিলেন, কিন্তু পরক্ষণে সংশোধন করিয়া বলিলেন সম্বন্ধের খোঁজ করিতে হইবে না। কলিকাতার কৃষ্ণবাবু নামে এক ইঞ্জিনীয়ার আছেন তিনি ঠাকুরকে তাঁহার এক কন্যা দান করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ঠাকুর নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন যদি তাঁহার বিবাহ করিতেই হয় তবে

কৃষ্ণবাবুর সেই কন্যাকেই বিবাহ করিবেন। সেই রাত্রিতেই এক পত্র লিখিয়া পরদিন কৃষ্ণবাবুর নামে পত্রখানা ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উক্ত পত্রের কোন উত্তর আর আসিল না। কিছুদিন পরে তিনি আবার নিরুদ্দেশ হইলেন।

ঠাকুরের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার মাসেক কি ততোধিক সময় পরে কৃষ্ণবাবু সিমলা হইতে পত্রের জবাব পাঠাইলেন। সে সময় কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। কলিকাতাবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ইতঃস্তত পালাইতেছিল। কৃষ্ণবাবু সপরিবারে সিমলায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট পত্র পৌছিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি এক সুদীর্ঘ পত্রে জানাইলে যে, ঠাকুর তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন জানিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার বংশ পবিত্র হইবে এবং কলিকাতায় বিবাহ হইবে স্থির করিয়াছেন। তারিখ নির্দ্ধারণ করিয়া পরে জানাইবেন। পত্রের উত্তর আসিল বটে, কৃষ্ণবাবুও কন্যাদানে সম্মত হইলেন, কিন্তু ঠাকুর কোথায়? অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল না।

এই বিবাহ ব্যাপারে ঠাকুর যে একটু রসিকতার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সেই সময় বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। তিনি রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ বলিতেন এবং তাঁহার ছোট ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহার কথা অনন্যমনে শুনিত। প্রথমতঃ তিনি কৃষ্ণবাবুর কন্যার কথা বলিলেন। কন্যাটি অতি ধর্ম্মপরায়ণা, সৎচরিত্রা, সেও যোগাভ্যাস করে ইত্যাদি। তারপর বিবাহের কথা—তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বিবাহের বরযাত্রী হইয়া কলিকাতায় যাইবে। "কলিকাতা প্রকাণ্ড সহর, খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিতে হয়। কৃষ্ণবাবু

খুব বড়লোক। তাঁহারা নোংরা থাকেন না, সুতরাং বরযাত্রীদের সভ্যভব্য হইয়া চলিতে হইবে এবং বাড়ীর ঘর-দরজা পথ-ঘাট সব পরিষ্কার করিতে হইবে। একখানা নতুন ঘরও তৈয়ার করা আবশ্যক, ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। অতঃপর বহুদিন আর ঠাকুরের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৩১০ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯০৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীশ্রীঠাকুরের জননী স্বর্গারোহণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার খোঁজ করিয়া কলিকাতায় কালীঘাটে তাঁহাকে পাইলেন। তাঁহার শত অনুরোধেও ঠাকুর বাড়ীতে আসিলেন না। চাউলপূর্ণ একটী পিতলের ঘটী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে দিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন "সাবধানে এই ঘটীটি লইয়া যাও। সাবধানে খরচপত্র করিও, বিপদ আরও আসিতে পারে। মায়ের জন্য আমার যাহা করিবার আছে, তাহা আমি এখানেই করিব। পরে দেখা গেল ঐ ঘটীতে ৭৫৲ টাকা রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীর স্বর্গারোহনের উনিশ দিন পরে ঠাকুরের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও দেহরক্ষা করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক বৎসর কলিকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি এক দুঃস্থা বর্ষীয়সী মহিলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। এক রাত্রিতে উত্তরপাড়ার এক দরিদ্র পল্লীতে হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে আগুন ভীষণ আকার ধারণ করিল। দরিদ্রের কুটীর ভস্মীভূত হইতেছে দেখিয়া দয়াময় ঠাকুর আগুন নিভাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী গঙ্গা হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া আগুনে ঢালিতে লাগিলেন। তাঁহার

সাহায্যার্থে আরও লোক অগ্রসর হইল। সকলের চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু ঠাকুর পিচ্ছিল পথে আছাড় খাইয়া হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পাইলেন। তিনি একেবারে অচল হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। ঐ সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিকট যাইয়া কয়েকদিন সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের এবং উল্লিখিত মায়ের সেবা শুশ্রূষায় ওখানে কিছুদিন পর আরোগ্য লাভ করিলেন।

উত্তরপাড়ায় থাকাকালে এক গলিত কুষ্ঠ রোগী ঠাকুরের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করে। এইভাবে ঠাকুর পরসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আবার কিছু সময়ের জন্য নিরুদ্দেশ হইলেন।

একবার প্রয়াগধামে কুম্ভ মেলায় ডিঙ্গামানিকের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সাধু চরণকুড়ি মহাশয় ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলেন। ঠাকুর সাধু-সন্ন্যাসীদের ভীড়ের মধ্যে না যাইয়া অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে গুপ্তভাবেই থাকিতেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী বেশ কোনদিন ছিলনা। তথাপি অনেক বড় বড় সাধুসন্ন্যাসী তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার সেবার জন্য নানাবিধ ভোজ্যবস্তু আসিত। ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিতেন না। সাধু কুড়ি মহাশয় প্রভৃতি উহার রসাস্বাদন করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কোন এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাতে উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ঠাকুর কাশীধাম হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শোকসংবরণের জন্য উপদেশ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ বালকের

মৃত্যুসংবাদ তিনি কী ভাবে পাইলেন তাহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে আহ্নিক-জপ-তপ ইষ্টদেবের পূজা প্রভৃতিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, একদিন ইষ্টদেবের পূজা সমপনান্তে উঠিয়া দেখেন ঠাকুর এক খানা জপের মালা হাতে লইয়া ঘাটের উপর বসিয়া আছেন। সতীন্দ্রবাবু হঠাৎ ঠাকুরের এই ভাবে আবির্ভাবের দরুণ অবাক হইয়া মস্তকে পদধূলি লইলেন। ঠাকুর তাঁহার হাতে মালাখানা দিয়া বলিলেন, "জপ করিও।" সতীন্দ্র বাবুকে আর কথা বলার অবসর না দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি যেই-ভাবে আসিয়াছিলেন সেইভাবেই চলিয়া গেলেন, কেহ কিছু টের পাইতে পারিল না। সতীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন কতবার কত বিপদে পড়িয়াছেন, ঠাকুর যেন হাতে ধরিয়া সেই সমস্ত বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সকলের অলক্ষিতে ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে দেখেন নাই, মলিন বসন, রুক্ষ কেশ, অজ্ঞাত লোককে অন্দর মহলে সরাসরি প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এ যে আমাদের সোনা-ঠাকুর।" বাড়ীতে একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

এবার তিনি একপ্রকার নিষ্ক্রিয়। সন্ধ্যা বন্দনা, পূজা, ধ্যান-ধারণা এবং যোগ যাগ কিছুই আগের মত নাই। তিনি স্বভাবতঃই অল্প-ভাষী, কিন্তু এবার যেন আরও নীরব। মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী আত্মীয়-

স্বজনের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু কোথায়ও বেশীদিন থাকিতেন না। সে সময়েও তাঁহার খাদ্য ছিল যজ্ঞডুমুর ও কল্‌মীশাক। কখনও কখনও তিলের শাঁসও খাইতেন। যে যেই ভাব নিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিত ঠাকুর তাহার সঙ্গে সেই প্রসঙ্গেই আলাপ করিতেন। অধিকাংশ লোকই শারীরিক ব্যাধির ঔষধের জন্য আসিত। মানসিক ব্যাধির প্রতিকার কামনায় ধর্ম্মপিপাসু হইয়া অল্পলোকেই আসিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু দিন বিক্রমপুরের বেজগাঁও গ্রামের মুন্সী পরিবারে বাস করিয়াছিলেন। সেই পরিবারের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করিত। আবার আপনজন মনে করিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তন্মধ্যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন বিশেষ অনুগত ভক্ত। তিনি ঠাকুরকে 'রামভাই' বলিয়া ডাকিতেন ; তদবধি ঠাকুরের একনাম হইল "রামভাই।" অশোকবাবু ধনীর গৃহে জন্মিয়াছিলেন। নিজেও প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া তিনি সমস্ত পার্থিব সুখসম্পদ ছাড়িয়া ফকিরের বেশে ঠাকুরের সঙ্গে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। একবার তিনি ঠাকুরকে একখানা মূল্যবান শীতবস্ত্র কিনিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সমক্ষেই ঐ কাপড়খানা এক শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে দিয়া ফেলিলেন। ইহাতে অশোকবাবু দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন।

কিছুকাল বেজগাঁও থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিক্রমপুরস্থিত বাহেরক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, এখানে তিনি বাসস্থান বাছিয়া লইলেন এক দরিদ্রের কুটীরে। গৃহস্বামী দরিদ্র হইলেও উদার ও সরল চিত্ত

ছিলেন। ঠাকুর যখন যে পরিবারে বাস করিয়াছেন তখন সেই পরিবারকে নিজের মনে করিয়া উহার যাবতীয় কাজ যথাসম্ভব নিজের হাতে করিতেন। গৃহকর্ত্রীর বাতব্যাধি ছিল। তিনি শয্যাশায়ীই থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। গৃহস্থালীর হাটবাজার ইত্যাদি সকল কাজ নিজহস্তে করিতেন। তাঁহার এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তথাকার শ্রীযুক্ত মনোমেহেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সময় সময় তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বেহেরপাড়া গ্রামের শ্রীশচন্দ্র সারখেলের বাড়ীতে যাইয়া থাকিতেন, শ্রীশবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা সুধীর ঠাকুরকে 'সোনাদাদা, বলিয়া ডাকিতেন। এই বাড়ীতেও তিনি অনেক সময় সাংসারিক কাজ করিতেন।

উক্ত শ্রীশচন্দ্র সারখেল বলিয়াছেন যে, বেহেরপাড়া গ্রামে ঠাকুরের সহিত পণ্ডিতপ্রবর প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ, পি আর এস, পি এইচ ডি মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রভাতবাবুর পৈতৃক বাসভবন ছিল পার্শ্ববর্ত্তী ধানছত্র গ্রামে। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী একজন ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ঠাকুরকে অনেক সময় অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। একবার ক্রমাগত তিনদিন ব্যাপিয়া উভয়ের বাক্‌যুদ্ধ চলিল। অবশেষে প্রভাতবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। প্রভাতবাবু তখন বুঝিলেন, যে অগাধ মহাসমুদ্রের তীরে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাতে কোন তরঙ্গ নাই। তিনি যে স্তবে ঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জানাইয়াছেন, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা

যায় যে তাঁহার সম্মুখে স্বয়ং শ্রীভগবান সমগ্র বিভূতি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল। নিম্নে স্তোত্রটি লিপিবদ্ধ করা হইল—

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় ॥

শ্রীশ্রীরাম স্তোত্রম্

ওঁ

নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় নিত্যানন্দস্বরূপিণে।
কলিকল্মষনাশায় প্রেমামৃত প্রবর্ষিণে ॥১॥
শান্তায় শান্তিরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
দয়া প্রবণচিত্তায় স্থির প্রজ্ঞায় বৈ নমঃ ॥২॥
ত্যক্তসমস্ত কামায় জিতদ্বন্দ্বায় ধীমতে।
নিত্যমুক্তায় শুদ্ধায় ক্ষুতৃষ্ণা রহিতায় চ॥৩॥
গুরবে জ্ঞানরূপায় সংসারান্ধতমোনুদে।
শ্রীমদ্রাসরসোল্লাস রসিকায় রসাত্মনে ॥৪॥
ব্যক্তায়াব্যক্তরূপায় সূক্ষ্মায় স্থূলরূপিণে।
বিন্দুভূতায় নিত্যায় চিদাকাশস্থিতায় চ॥৫॥
অসুরাণাং বধার্থায় পুরা ত্রেতাযুগে ভুবি।
জাতো নারায়ণঃ সাক্ষাল্লক্ষ্মণশ্চানুজোঽভবৎ ॥৬॥
সোঽয়ং রঘূত্তমো রামো রামচন্দ্রেতিসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুরাসীৎ কুলে পুণ্যে কমলা-মধুযোগতঃ ॥৭॥
দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধা দ্বাপর সংযুগে।
চিক্রীড় গোপাবালৈশ্চ রেমে বৈ গোপীভিঃ সহ ॥৮॥

সোঽহয়ং লীলায়তে নিত্যং গোবিন্দো ভগবান হরিঃ।
নরেষু নররূপেণ হ্যাত্মারামো রিরংসয়া ॥৯॥

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাণাং বীক্ষ্য দুর্গতিম্।
গৌরচন্দ্রোঽহবতীর্য্যাথ শচীগর্ভমহার্ণবে ॥১০॥

গুহ্যং রাসরসং দিব্যং প্রতেনে প্রেমবিহ্বলঃ।
সোঽহয়ং বিচরতীদানীং জীবানাং ক্লেশমুদ্বহন্ ॥১১॥

ভ্রাতৃরূপেণ কেষাংচিদ্বন্ধুভাবেন চ ক্বচিৎ।
পালয়ন্ স্বগণং দুঃখাৎ সদা প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ॥১২॥

যবনোঽহপি হি যৎসঙ্গাল্লেভে বৈ পরমং পদম্।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥১৩॥

যৎকৃপালেশমাসাদ্য কিচনো মুক্ততাং গতঃ।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥১৪॥

অন্যেষাং ব্যাধিমাশ্রিত্য যো ভুঙ্‌ক্তে কৃপয়া মুদা।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥১৫॥

উপদেশং বিতনুতে 'চিত্তস্থৈর্য্যাবধারণম্'।
সন্ততং লোকশিক্ষার্থৈ মথিত্বা শাস্ত্রসাগরম্ ॥১৬॥

'প্রাণ এব পরো ধর্ম্মো গুরুরেবাশ্রয়ঃ পরঃ'।
'তদৈব লভতে শান্তিং নিরপেক্ষো ভবেদ্ যদা' ॥১৭॥

গিরা মধুরয়া চৈবং দেশ্যং দিশতি যঃ সদা।
তং নমামি গুরুং ভক্ত্যা রামচন্দ্রং দয়াময়ম্ ॥১৮॥

ধ্যেয়স্তু রামঃ প্রবিশুদ্ধমূর্ত্তি র্জপ্যং সদাস্তে
বিমলং হি নাম।
সেব্যং সদা তচ্চরণারবিন্দং পেয়ং
মুহুস্তৎকরুণামৃতং হি ॥১৯॥

কিং বর্ণ্যতে তব গুরো সুবিচিত্রলীলা দেব !
প্রমুগ্ধমতিনাত্র ময়াধমেন ?
ক্ব ত্বং নরামরমতেরবিচিন্তনীয়ঃ
ক্বায়ং সুদুস্তরভবাম্বুধিমগ্নচিত্তঃ ॥২০॥

প্রভাত দাদার সরল, উদার শিশুসুলভ ভাবের অভিব্যক্তি মনোমুগ্ধকর ছিল। তিনি কৃত্রিম শিষ্টাচারের ধার ধারিতেন না, খাতির রাখিয়া কাহারও সাথে কথা বলিতেন না। কিন্তু বাহিরের এইরূপ কঠিন আবরণের অভ্যন্তরে তাঁহার প্রাণটী ছিল নবনীর মত কোমল, পুষ্পের মত সুন্দর, চন্দনের মত সুগন্ধযুক্ত ও পবিত্র। তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ঠাকুরকেও নাকি সময়ে সময়ে কটূক্তি করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। শুনা যায় একবার তিনি ঠাকুরকে একখানা মূল্যবান শাল কিনিয়া দিয়াছিলেন ; কিছু পরেই ঠাকুর ঐ শালখানা এক ব্যক্তিকে দিয়া দেন। প্রভাত দাদা একথা জানিতে পারিয়া তাঁহার চির অভ্যস্ত কঠোর ভাষায় নাকি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "জন্মে ত' টাকা রোজগার করিয়া দেখ নাই। পরের দেওয়া জিনিষ বিলাইয়া দিতে তোমার লাগিবে কেন ?" আসলে প্রভাত দাদা কিন্তু প্রাণে

প্রাণে তাঁহার ঠাকুরের এই কার্য্যে গৌরব ও আনন্দই অনুভব করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া কেবল ঈষৎ হাসিয়াছিলেন।

একবার ঠাকুর ঢাকায় অবসর প্রাপ্ত পুলিসের ডেপুটী সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন, প্রভাতদাদা ঠাকুরের পাদপদ্ম দর্শন কামনায় সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন, "প্রভাত বাবু এবার আমায় গালি দিলেন না!" একথা শ্রবণমাত্র প্রভাত বাবুর দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য সরিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার শ্বশুর প্রসন্ন কুমার আচার্য্য মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষালাভ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, মৈমনসিং-এ যখন তিনি শিক্ষকতার কাজ করিতেন তখন সুবক্তা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সেই স্থানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে প্রসন্ন বাবু একদিন চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কুলগুরু জ্ঞানহীন, আচার ভ্রষ্ট, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না, এই ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য কি? চূড়ামণি মহাশয় তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, সময় হইলে গুরুদেব আপনা হইতেই তাঁহার আছে আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট পূরণ করিবেন। ইহাতে তাঁহার পিপাসা মিটিল না। তিনি শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। একদিন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, "আমার কাছে নাই। আছে এক উচ্চতর মহাপুরুষের কাছে, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার কাছে যাইয়া

যথাসময়ে আপনাকে দীক্ষিত করিবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।”

তারপর বহুবৎসর অতীত হইল। তিনি শ্রীহট্ট জেলায় পৃথ্বীম পাশা নামক স্থানে এক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকিয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতেছিলেন। একদিন তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একটী বালক তাঁহাকে জানাইল যে, এক ব্যক্তি দরজায় তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন দরজায় এক অপরিচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আপনাকে দীক্ষা দিতে আসিয়াছি।” শুনিয়া তিনি বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চূড়ামণি মহাশয় ও জটিয়া বাবা (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে পড়িল এবং ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হইবেন ভাবিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইতে ছিল না, চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া বাসায় গেলেন এবং সেদিনই সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শেষে পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন সেই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যতীত আর কেহই নহেন। এইরূপে অযাচিত ভাবে আসিয়া অযাচিত কৃপা করিয়া ঠাকুর অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে ঠাকুর আবার কয়েকদিনের জন্য তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। ঐ বাড়ীর পশ্চিমের বাড়ীর ডাক্তার শ্রীদুর্গামোহন দাস বলিয়াছেন যে, তাঁহার বড় ছেলেটী কলেরা রোগে মৃতকল্প হইয়া পড়িলে তিনি অনন্যোপায় হইয়া ঠাকুরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া

রহিলেন। রাত্রিশেষে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নে দেখিলেন যে, ঠাকুর খড়ম পায়ে তাঁহার নিজবাড়ীর নিমগাছের পার্শ্ব দিয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঠাকুর বাড়ীতে দৌড়াইয়া গিয়া ঠাকুরকে ঠিক তদবস্থায়ই দেখিতে পাইলেন। দুর্গামোহন বাবু ঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া ছেলের অবস্থা জানাইয়া অতিশয় কাতরতার সহিত ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

করুণাময় ঠাকুর তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং এই আশ্বাস দিলেন যে উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া রোগ-শয্যায় বসিলেন এবং ছেলেটীর গায়ে হাত রাখিয়া বলিলেন, "দুর্ব্বল হইয়াছ, একটু দুধ খাও।" ঠাকুরের আদেশে দুগ্ধদাহন করিয়া আনা হইল। ঠাকুর নিজ হস্তে তাহাকে দুগ্ধ পান করাইলেন। রোগীর অবসন্নতা কাটিয়া গেল এবং সে ক্রমে সুস্থ হইয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

ডিঙ্গামাণিক গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রাহাপাড়া গ্রামে চন্দ্রমোহন শীল কবিরাজ নামে এক সাধু বৈষ্ণব সংসারের ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়া নিজগৃহে বাস করিতেন। ভাগ্যক্রমে যখন যাহা আসিয়া পড়িত তৎদ্বারাই তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কালক্রমে তাঁহার ঘরখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি সেই ভিটাতেই রৌদ্রবৃষ্টিতে নির্ব্বিকার চিত্তে বাস করিতেন। ঠাকুর তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কৈবল্যধামের বর্ত্তমান মোহন্ত মহারাজ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার পথে একটি বানর ঠাকুরের

পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন—"এও একজন মহাপুরুষ।"

এই সময়ে ডিঙ্গামাণিক গ্রাম হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে ছয়গাঁয়ে ঠাকুরের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকাকালে তিনি অকস্মাৎ উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার নিজ বাড়ীর লোকজন জানিতে পারিয়া নৌকায় তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলেন। কিছুদিন রোগ ভোগের পর তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। পরে জানা গিয়াছিল যে এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এক কলেরা রোগীকে শুশ্রূষা করিয়া নিরাময় করিয়াছিলেন।

ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা বিভূতির সংবাদ দেশে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে বহুলোক আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। সকলেই ঠাকুরকে নিজ নিজ বাড়ীতে পদার্পণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যাইয়া বাস করেন। অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে বহুলোক কলিকাতায় যাইয়া ১৮।১ নং ডিক্সন্ লেনে ৺মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় ঠাকুরের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া ধন্য হন।

ডিঙ্গামাণিক গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী 'স্বর্ণখোলা' গ্রামের কালিদাস কুরি কলিকাতায় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার ভাই হরিদাস প্রভৃতি তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। পীড়া ক্রমে কঠিন আকার ধারণ করিলে কালিদাস তাহার ভাইকে বলিল, "শুনিলাম ঠাকুর কলিকাতায় আছেন। তাঁহাকে আপনারা যাইয়া লইয়া আসুন।" তাহারা ঠাকুরের নিকট গিয়া তাহার বাসনা ব্যক্ত করিলে তিনি

বলিলেন, "বিকালে যাইব।" কিন্তু তিনি গেলেন না। পরদিন হরিদাস প্রভৃতি ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ কালিদাসের ব্যগ্রতা জানাইল। এবারও তিনি বলিলেন, "সময় মত যাইয়া দেখিব।" ইহাতে কালিদাস অতি মাত্রায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, "হায় আমার অদৃষ্ট, ঠাকুরের দেখা বুঝি আর পাইলাম না।" মৃত্যুর দিন সকালে কালিদাস হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোরা সরিয়া যা, আমার দয়াল ঠাকুর আসিয়াছেন।" এ কথা বলিতে বলিতে সে করোযোড়ে ঠাকুরকে নমস্কার করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যু হইল। ঐ সময় কিন্তু ঠাকুরকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

পরদিন হরিদাস ঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া কালিদাসের মৃত্যু-সংবাদ জানাইলে ঠাকুর বলিলেন, "আমি গতকাল প্রাতেই তাহাকে দেখা দিয়াছিলাম।" সকলে বুঝিল কালিদাস মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যে বলিয়াছিল "ঠাকুর আসিয়াছেন" উহা তাহার প্রলাপ বাক্য ছিল না। ঠাকুর প্রকৃতই সূক্ষ্মদেহে দেখা দিয়া কালিদাসের শেষ মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ৺কাশীধামে এক বৃদ্ধা অনন্যচিত্তে একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে ঠাকুরেরই চিন্তা করিতেন। তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে ৺গঙ্গায় লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তাঁহার ঠাকুর আসিবেন, তিনিই তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। ছেলেরা কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া একখানা পাল্কীতে বৃদ্ধাকে ৺গঙ্গায় লইয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় ঠাকুর

সেই পথে উপস্থিত হইলেন। অমনি বৃদ্ধা পুত্রদের বলিলেন "ঐ দেখ আমার ঠাকুর আসিয়াছেন।" পাশ ফিরিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিবামাত্রই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক শক্তি ও অপার করুণার কাহিনী ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তিনি জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে কৃপা করিতে লাগিলেন। কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী আসামে বাস করিত। তথাকার ভক্তদের ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি আসাম প্রদেশে তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়াছিলেন।

তিনসুকিয়ায় 'ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং' নামে হরেক রকম জিনিষের একটী প্রসিদ্ধ কারবার ছিল। ইহার অন্যতম মালিক শ্রী শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী যোগমায়া দেবী ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা পূর্ব্বেই লোকমুখে শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কতদিনে ঠাকুরের দর্শন পাইবেন, ব্যাকুল হইয়া তিনি সর্ব্বদা সেই চিন্তাই করিতেন। গাড়ী হইতে নামিয়া দয়াময় ঠাকুর প্রথমেই তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন।

পাহাড়তলী শ্রীশ্রীকৈবল্যধামের প্রথম মোহন্ত মহারাজ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেডুতে ঐ সময় কেরাণীর কাজ করিতেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি কলিকাতায় ডিক্সন লেনে মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল এই মহাপুরুষের দ্বারাই তাঁহার অভীষ্ট পূরণ হইবে।

তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত ভগবৎ প্রেম ও শান্তির পথ তিনিই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত "নাম" শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার অন্তরে যেন মধুর নাম সংকীর্ত্তন হইতেছে। অচিরেই হরিদাদা সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি যথাসম্ভব নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যথাসময়ে তাঁহাকে ডাকিয়া লইবেন। ইহার কিছুকাল পরে পাহাড়তলীতে শ্রীশ্রীকৈবল্য-ধাম স্থাপিত হইলে ঠাকুর হরিদাদাকে আনাইয়া শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের পূজার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। তিনি তানপুরার সাহায্যে সুললিত কণ্ঠে ভজন গান করিতেন। তিনি শিবপ্রতিম, প্রিয়দর্শন ও সুরসিকও ছিলেন।

হরিদাদা তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ,—কয়েক হাজার টাকা শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথের সেবার জন্য স্থায়ী ভাণ্ডারে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। হরিদাদার সহধর্ম্মিনী অতিশয় পুণ্যবতী, পতিপ্রাণা, ঠাকুরের একান্ত অনুগতা ও ভক্তি পরায়ণা ছিলেন। একদিন তিনি ঠাকুরের উৎসবের আয়োজন করিলেন। স্বহস্তে পূজার আয়োজন, ভোগ রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজেই পূজা আরতি করিলেন এবং ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করিয়া নিজে প্রসাদ পাইলেন। ঐ দিবস রাত্রিতেই তিনি দেহরক্ষা করিলেন। হরিদাদার একটী মাত্র কন্যা, সেও একদিন অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া হরিদাদাকে সংসারের শেষবন্ধনটুকু হইতেও মুক্ত করিয়া দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ডিব্রুগড়ের

নিকটবর্ত্তী লেংরাই চা-বাগানে ডাক্তারের কাজ করিতেন। ঠাকুর কতিপয় ভক্ত সহ তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাওয়ায় যতীন্দ্রবাবুর বড়ই আনন্দ হইল। ঠাকুরকে লইয়াই তিনি বেশী ব্যস্ত হইলেন। সঙ্গীয় ভক্তদের প্রতি তাঁহার অনুরূপ লক্ষ্য নাই দেখিয়া ঠাকুর বিরক্তি অনুভব করিলেন। কিছু না বলিয়া একখানা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। সকলেই অবাক—হঠাৎ ঠাকুরের কী হইল! যতীন্দ্রবাবু ভয় পাইয়া অনুমান করিলেন হয়ত সঙ্গীদের প্রতি তাঁহার যত্নের ত্রুটী হইয়াছে বলিয়াই ঠাকুর বিরক্ত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যথাসাধ্য জল-যোগের ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণকে আপ্যায়িত করিলেন। ঠাকুর তখন উঠিয়া বসিলেন এবং হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।

লেংরাই চা বাগানের খানিকটা দূরে 'বড় ডুবী' চা বাগান ছিল। এই চা বাগানের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসায় একবার ঠাকুর গেলেন। অনেক ভক্তও সেখানে ছিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও তাঁহাদের মধ্যে একজন। হঠাৎ ঠাকুর তাঁহাকে লেংরাইতে যতীন্দ্রবাবুর বাসায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু ভক্তদের কাহারও কাহারও অনুরোধে যোগেন্দ্রবাবু আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখনও যোগেন্দ্রবাবুকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন "তুমি এখনও লেংরাই যাও নাই? সেখানে যে বড় বিপদ।" যোগেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ লেংরাই রওনা হইলেন। বাসায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, গৃহশিক্ষক হরেন্দ্র-কুমার সোম হঠাৎ "ব্ল্যাকওয়াটার ফিভারে" আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায়।

তিনি অমনি তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। লোকাভাবে যতীন্দ্রবাবু বাস্তবিক অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রবাবু তখন বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর কেন তাঁহাকে শীঘ্র লেংরাই যাইতে বলিয়াছিলেন।

তৎকালে ঐ অঞ্চলে "বাবা সুন্দরনাথ" নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিত। তিনি একদিন ঠাকুরের দর্শন কামনায় মারঘেরিটায় উপস্থিত হইলেন। কতিপয় শিষ্যও তাঁহার সঙ্গে ছিল। 'বাবা সুন্দরনাথ' ঠাকুরের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ঠাকুরও নিঃশব্দে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে 'বাবা সুন্দরনাথ' চলিয়া গেলেন। সঙ্গীয় ভক্তগণ তাঁহাকে বলিলেন "আপনারা তো কেহ কাহাকে কিছু বলিলেন না ?" 'বাবা সুন্দরনাথ' বলিলেন, "মনে মনেই আমাদের আলাপ হইয়াছিল।" তিনি আরও বলিলেন এতদিন তিনি ঠাকুরের অপেক্ষাই করিতেছিলেন। ঠাকুরের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তিনি মুক্ত হইলেন। এদিকে ঠাকুরও বলিয়াছিলেন, 'বাবা সুন্দরনাথ' এক মহাপুরুষ—তাঁহার দর্শন পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন।

লেতুর তৎকালীন পশুচিকিৎসক শ্রীনন্দলাল দত্ত ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একবার ঠাকুর নন্দলাল বাবুর বাসায় আছেন, তথায় উপস্থিত ভক্তগণ শুনিতে পাইলেন যে, নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে যেন একটা বিকট শব্দ উত্থিত হইতেছে। এইরূপ বিকট শব্দ নাকি পূর্ব্বেও মাসে মাসে শুনা যাইত। কিন্তু উহা কোথা হইতে

আসিত কেহ জানিত না। ঐ দিন সেই শব্দ আরও বিকট আকার ধারণ করে ও ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হয়। সকলে চমৎকৃত হইয়া ঐ শব্দের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময় ঠাকুর বলিলেন, "নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে এক ভক্ত আছে, এখনই সে এখানে আসিবে। তাহাকে যেন আসিতে দেওয়া হয়।" কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাস্তবিকই বিরাট আকারের এক পুরুষ ঐরূপ শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে। যেমন বিকট তাহার শব্দ, তেমনই বিকট তাহার আকৃতি ও সাজ-সজ্জা। ক্রমে সে রেলের রাস্তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহ অতি দীর্ঘ, গায়ের রং কাল, চক্ষু রক্তবর্ণ, কাণে হাড়, গলায় হাড়ের মালা ও পরিধানে নেংটি। সেই বিকট পুরুষ বলিল, তাহার নাম চৈতন—সে রামের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। রাম ডাকিলেই তাঁহার কাছে যাইবে।

উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চৈতন ঠাকুরের কাছে যাইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "আজ হইতে চৈতন মুক্ত।" আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সে চলিয়া গেল। তদবধি আর কেহ তাহাকে দেখে নাই বা সেই বিকট শব্দও শুনে নাই। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "চৈতন সাধক মহাপুরুষ, আজ তাহার মুক্তি হইল।"

ডিঙ্গামাণিক গ্রামের প্যারীমোহন দে আসাম পাথলিপাম চা বাগিচার ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে ঠাকুর একবার তাঁহার বাসায় গিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলে ঠাকুর ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন এবং বলিলেন এ কন্যার বিবাহ হইলে তিনি ত' সুখী

হইবেনই না, পরন্তু তাঁহার কন্যার জীবনহানি হইতে পারে। ডাক্তার বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্যে আস্থা রাখিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত কন্যাটীর বিবাহ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান অলঙ্ঘ্যনীয়। ডাক্তারবাবু তাঁহার আত্মীয় পরিজনের ঐকান্তিক অনুরোধে অবশেষে কন্যার বিবাহে মত দেন। তাঁহার আত্মীয়রাই সম্বন্ধ জুটাইয়া আনিল, এবং এক শুভদিনে সুশ্রী, বিদ্বান ও সঙ্গতি সম্পন্ন সৎপাত্রে তিনি কন্যাদান করিলেন। কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরেই সুস্থ সবল দেহ কন্যাটী অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও অচিরেই ইহলীলা সংবরণ করিল।

আসাম প্রদেশে শ্রীশ্রীঠাকুর বহুলোককে নাম দিয়া কৃতার্থ করিয়া আসেন। তাঁহার মধুর আলাপে ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই এইরূপ মুগ্ধ ও পরিতুষ্ট হইত যে, তাহারা মনে করিত ঠাকুর যেন তাহাদের একান্ত আপন জন,—একাধারে জন্মজন্মান্তরের পিতা, মাতা, বন্ধু—শুধু তাহাদের ধর্ম্মজগতের গুরু নহেন। এইভাবে তিনি আসাম প্রদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে ধর্ম্মজগতের এক নূতন সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালে আসাম হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত প্রতি রেলওয়ে স্টেশনে, কি চা বাগানে, কি সরকারী অফিসে সর্ব্বত্রই ঠাকুরের ভক্ত দেখা যাইত।

নোয়াখালীতে সুরেশচন্দ্র ঘোষ নামে শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় অচৈতন্য মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছেন, আত্মীয়-স্বজন এমনকি চিকিৎসকগণও তাঁহার জীবনের আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় তিনি দেখিলেন যে ঠাকুর তাঁহার শিয়রে

বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতেছেন, "ভয় নাই, শীঘ্রই ভাল হইবেন," সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।

একবার কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থান কালে কতিপয় বারাঙ্গনা তাঁহার দর্শন ও পদধূলি প্রাপ্তির বাসনায় তথায় উপস্থিত হয়। কিন্তু পতিতা বলিয়া গৃহস্বামী তাহাদিগকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে তাহারা বড়ই মর্ম্মাহত হইল এবং অত্যন্ত আকুলভাবে দ্বার ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু গৃহ-স্বামী অচল, অটল। সেই সময় ঐস্থানে ঠাকুরের ভক্ত অবনীকান্ত মুখার্জ্জি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ বারাঙ্গনাগণের ঐকান্তিক ব্যগ্রতা দেখিয়া গৃহস্বামীকে দ্বার ছাড়িতে অনুরোধ করিলেন। গৃহস্বামী ঠাকুরের নিকট যাইয়া সেই রমনীদের কথা জানাইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি অন্ধ আমি তো চোখে দেখিনা—ছোট বড়, পতিত অপতিত, সাধু অসাধু কিছুই দেখিনা। তারা যখন আসিতে চায় তখন আসিতে দিতে আপত্তি কি?" এবার গৃহস্বামীর টনক নড়িল। অবনীবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সেই রমনীকয়টিকে ঠাকুরের নিকট আসিতে দেওয়া হইল। গৃহস্বামীর ভ্রান্তি তখনও দূর হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিতে বলিলেন। তাহারা তাহাই করিল। তাহাদের কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে দিবার জন্য যে ফুল আনিয়াছিল। দূর হইতে তাহা ঠাকুরের নামে ফেলিয়া দিল। ঠাকুর ঐ ফুল তুলিয়া তাহাদের মাথায় দিলেন এবং মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ডিঙ্গামাণিকের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পণ্ডিতসারের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার শ্রীযোগেশচন্দ্র নাগ মহাশয় ঠাকুরের পরম ভক্ত। তিনি একবার কলিকাতায় যাইয়া ঠাকুরের দর্শনলাভের জন্য বহু প্রয়াস করিয়াও সফলকাম না হইয়া কী অপরাধে তিনি সেই সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইলেন, ভাবিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন।

ইহার পর একদিন তিনি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে একটী বাড়ীর নিকট দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় অতি অল্প বয়স্ক একটি বালক উপরের তলা হইতে ডাকিয়া যোগেশবাবুকে বলিল, "ঠাকুর দেখবে ? ঠাকুর দেখবে ? এস, উপরে এস," যোগেশবাবু একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া সরাসরি উপরের তলায় উঠিয়া গেলেন। বালক তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট লইয়া গেল। যোগেশবাবু প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের দর্শনলাভ ও কথামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুরই যে বালকের মুখ দিয়া যোগেশবাবুকে ডাকিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। নচেৎ কত লোকই ত' ঐ পথ দিয়া গমনাগমন করিতেছিল বালক ত' আর কাহাকেও ঠাকুর দেখার জন্য এমনভাবে ডাকে নাই!

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করার যাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অলৌলিক ঘটনার ইয়ত্তা নাই। তিনি স্বয়ং একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা মহাজন, যোগৈশ্বর্য্যগুলি তাঁহাদের পরিচর্য্যার প্রতীক্ষায় অনবরতই সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মহাজনেরা সেদিকে দৃক্পাত করেন না। কখনও কখনও কোন বিশেষ বিশেষ কারণে ঐ সকল যোগবিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। বেদবাণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অনেকগুলি

ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকলের আর বেশী উল্লেখ না করিয়া বেদবাণীর সঙ্কলনকারী ইন্দুবাবুর ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তিন চারটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া ভক্তগণের বিশ্বাস দৃঢ়তর করার চেষ্টা করিব।

তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই জানেন যে, তিনি অপরের রোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিতেন। কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ দণ্ড খণ্ড হয় না। সুতরাং ঐশ্বর্য্য বলে কোন ব্যাধি নিরাময় করিলে সে রোগঋণ জমা হইয়া থাকে। একদিন না একদিন তাহা সুদে আসলে পরিশোধ করিতে হয়। এইজন্যই কৃপাবশে কাহারও রোগমুক্তির জন্য অগ্রসর হইলে তিনি উহা নিজ শরীরে ভোগ করিয়া রোগঋণ একেবারে চুকাইয়া ফেলিতেন। সময় সময় এইরূপে যাচিয়া আনা কোন ব্যাধি নিঃশেষে চুকিয়া না গিয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। ইন্দুবাবুর নিজ ভাষায় নিম্নে দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

"একদিন আমার ছাপ্পান্ন-সি বিডন স্ট্রীটের বাসায় বৈঠকখানা ঘরে প্রাতঃকালে আমি ও ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের কবিরাজ ৺জানকীনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছিলাম। আমরা এক আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলাম। উভয়ে দেখিলাম যে, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ধীরে ধীরে কতকগুলি গুটি উঠিয়া ঠাকুরের দুই হাত ও বুক ছাইয়া ফেলিল। কবিরাজ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এইগুলি বসন্তের গুটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিকিৎসক বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল। আমাকে কয়েকটী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন

যে শীঘ্রই ঠাকুরের জন্য ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া যাইতেই ঠাকুর মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, 'উনি ঠিকই বলিয়াছেন ; এগুলি বসন্তেরই গুটি কিন্তু উনি অনর্থক ভীত হইয়াছিলেন। ঔষধের প্রয়োগ হইবে না এবং ইহা হইতে কাহারও কোন অনিষ্টেরও আশঙ্কা নাই।' এই কথা বলিয়া ঠাকুর আঙ্গুল দিয়া গুটিগুলি আস্তে আস্তে টিপিতে লাগিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঘণ্টাখানেক পরে ঐগুলি নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। আমি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে ঠাকুর স্বীকার করিলেন যে বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এক মরণাপন্ন বসন্তের রোগীকে নিরাময় করিয়াছিলেন এবং সেই রোগ এখনও মাসে মাসে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতেন না। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতেই দেখিয়াছি যে অনেক সময় তিনি বাতের আক্রমণে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেন। সাধারণতঃ পায়েই এই আক্রমণ হইত, হাঁটু ফুলিয়া উঠিত এবং কখনও কখনও যন্ত্রণা এত মারাত্মক হইয়া উঠিত যে ঠাকুর ছট্‌ফট্‌ করিয়া বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেন। ফ্লানেলে পা জড়াইয়া রাখা সেক্‌, মালিশ ইত্যাদি যথারীতি চলিত, কিন্তু একবার হইলে সহজে এ রোগ ছাড়িতে চাহিত না। পরে ঘটনাক্রমে এই ব্যাধির ইতিহাস জানিতে পারিয়াছিলাম। একদিন ঢাকার ৺বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের বাসায় আমার শ্বশুর শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ৺মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত ঠাকুর দর্শনে গিয়াছিলাম। তখনও ঠাকুর এই বাতে ভুগিতেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে তিনি একবার এই বাতের চিকিৎসা করিয়া দেখিবেন। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন—

"কোন দৈব কারণে মাসে মাসে এই বাতের আক্রমণ হয়। চিকিৎসায় উপকার হইবে না।" শ্বশুর মহাশয় ঠাকুরকে কথাটি আরও একটু খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর প্রথমে নীরবেই রহিলেন। কিন্তু শেষে শ্বশুর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া বলিবেন। এক সময়ে ঠাকুর বাঁশবেড়ের নিকটে কোন একস্থানে ছিলেন। এক ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী ও দশবৎসর বয়স্ক এক পুত্র লইয়া সেখানে বাস করিতেন। এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে ঠাকুরকে নিজ গৃহে রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে হঠাৎ তাঁহার সেই একমাত্র সন্তানটি বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। শরীরের বামার্দ্ধ সম্পূর্ণ অবশ হইয়া যায়। ডাক্তার কবিরাজেরা কোন ভরসাই দিতে পারিলেন না। শুধু কর্ত্তব্য হিসাবে চিকিৎসা করিয়া যাইতে লাগিলেন, ফল কিছুই হইল না। তখন সেই ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রী নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া পড়িলেন। পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে ঠাকুর ইচ্ছা করিলেই একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঠাকুর ইহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। একদিন রাত্রিতে নিকটস্থ গঙ্গার এক চরে কাশবনের মধ্যে আসন করিয়া বসিলেন। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটী আরোগ্য হইয়া গেল এবং তাহার শরীরস্থ বাত আসিয়া ঠাকুরের দেহ আশ্রয় করিল। ঠাকুর একেবারে নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। সামান্য একটু নড়াচড়া করিবার শক্তিও তাঁহার রহিল না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর ঠাকুর দেখিলেন যে তাঁহার গুরু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোন কথা না বলিয়া তিনি ঠাকুরের পিছনে চলিয়া আসিলেন এবং হঠাৎ এক লাথি মারিয়া তাঁহাকে প্রায় চৌদ্দ পনের

হাত দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতেই ঠাকুরের আড়ষ্ট হাত, পা ছাড়িয়া গেল। গুরু ঠাকুরকে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন। কিন্তু ঠাকুর স্বাভাবিক ভাবে হাঁটিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলেন না। তাঁহাকে হামা দিয়া আসিতে হইল। ইহা দেখিয়া গুরু বলিলেন—'একটু দোষ থাকিয়াই গেল, দেহ যতদিন আছে ততদিন মাসে মাসে এই বাতের আক্রমণে ভুগিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া গুরু অন্তর্হিত হইলেন এবং ঠাকুরও কষ্টেসৃষ্টে সে ভদ্রলোকের বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।"

ঠাকুরের নিজদেহে অপরের রোগ ভোগের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু উপরোক্ত দুইটী ঘটনার ন্যায় তাঁহার পুনঃ পুনঃ ঐ আহরণ করা রোগ ভোগের কথা আর শুনিতে পাই নাই।

উপরোক্ত বাতের অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে কষ্ট পাইতে আমিও নিজে বহুবার দেখিয়াছি। কিন্তু দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঐ রোগে ভুগিতে কখনও দেখি নাই। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি যে সময় সময় নানাপ্রকার ব্যাধিতে ভুগিতেন—এই সকল ব্যাধি ঠাকুর অন্যের দেহ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজে ভোগ করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনা যায়। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত অবং আমার বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন বন্ধু যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ঐরূপ দুই তিনটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বেদবাণী সঙ্কলনকারী ইন্দুবাবু ও প্রভাতবাবু যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা ইন্দুবাবুর নিজস্ব ভাষায় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।"

"আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রভাতবাবু তখন বৌবাজার অঞ্চলে থাকিতেন। একদিন বৈকালে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া দেখি যে, তিনি এবং আমাদের অপর একজন বন্ধু অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিতেই বন্ধুবর বলিলেন—" এখনই বাড়ী ফিরিয়া যাও, আর এক মিনিটও এখানে অপেক্ষা করিও না। "আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অপর বন্ধুটির দিকে তাকাইলাম এবং তিনি আমাকে জানাইলেন যে প্রভাতবাবুর এক কন্যা, এক পুত্র এবং এক ভাগিনেয়ের বসন্ত হইয়াছে, মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। সেই জন্যই তিনি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। আমি জাঁকিয়া বসিলাম এবং তামাক আনিতে বলিলাম। বন্ধুবর আরও দুই একবার আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু যখন বুঝিলেন যে আমি কিছুতেই যাইব না, তখন চিকিৎসার বিষয়ে আমার পরামর্শ চাহিলেন। বসন্ত রোগে বাইওকেমিক চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ হয় ইহা আমি বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি এবং আমি নিজেও এই চিকিৎসা কিছু কিছু জানিতাম, সুতরাং বাইওকেমিক চিকিৎসা করাইবার পরামর্শই আমি তাহাকে দিলাম। আমরা এই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি এমন সময় হঠাৎ আমরা তিনজনেই দেখিলাম যে শ্রীশ্রীঠাকুর ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। নগ্ন পা, গায়ে একখানা চাদর, অবনত মুখে ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

এইখানে সে বাসাটীর একটী বিবরণ না দিলে কথাটি পরিস্ফুট হইবে না। রাস্তার উপর সদর দরজা, সেখান হইতে সোজা একটি চাতাল ভিতরের বারান্দার একপ্রান্তে গিয়া মিলিয়াছে। সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই বাঁ হাতে বৈঠকখানা ঘর এবং

চাতালটির ডান দিকে উঠান। আব্রু রক্ষার জন্য রাস্তার দিকের উঠানটি একটি টিনের বেড়া দিয়া ঘেরা। চাতালটির বাঁ দিকে বৈঠকখানা সংলগ্ন আর একখানি ঘর কিন্তু তাহা অন্য ভাভাটিয়ার এবং তার প্রবেশ পথও চাতালের উল্টাদিকে। ভিতরের বারান্দার কোলে দুইখানি ঘর, ইহার একখানিতেই বন্ধুপত্নী রোগীদের লইয়া ছিলেন। আমরা দেখিলাম যে ঠাকুর সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া চাতাল ধরিয়া সোজা চলিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানার বাহিরে আসিলাম। কিন্তু ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না, অনুমান করিলাম যে তিনি ভিতরের বারান্দায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেইজন্যই দেখিতে পাইতেছি না। বারান্দায় গিয়াও ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না এবং বন্ধুপত্নীর ঘরের দরজায় আসিয়া দেখিলাম যে তিনি একখানা আসন হাতে লইয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাদের দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঠাকুর কোথায় গেলেন। প্রভাতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে ঠাকুর ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া তিনি তাকের উপর হইতে আসনখানা আনিবার জন্য উঠিয়াছিলেন, ফিরিয়া দেখেন যে ঠাকুর নাই। ইহাও বলিলেন যে দরজার বরাবর উল্টাদিকের দেওয়ালে যে আয়না ঝোলান ছিল তাহাতেই প্রথম তিনি ঠাকুরের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান। আমরা তখন এদিক ওদিক খোঁজ করিয়া দেখিলাম কিন্তু ঠাকুরের কোন সন্ধান মিলিল না।

আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলাম এবং ঠাকুরের এই আকস্মিক আবির্ভাবের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। বসন্ত রোগাক্রান্ত আমার বন্ধুর সেই ভাগিনেয়ও ঠাকুরকে দরজার

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং একই সময়ে যে পাঁচজন লোকের দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। আর আমাদের দেখার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। সুতরাং এই দেখাটাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। ঠাকুর সে সময় হরিদ্বারে ছিলেন, পরের দিনই সেইখানে পত্র লেখা হইল। 'উত্তরে জানিলাম যে উল্লিখিত দিনে ও সময়ে ঠাকুর ছিলেম এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকটেই বসিয়া ছিলেন।

ইতিমধ্যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। বন্ধুপত্নী আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে একসঙ্গে তিনজনের বসন্ত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক আকুতির সহিত ঠাকুরকে স্মরণ করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে বসন্তের গুটিগুলি দুই তিন দিনের মধ্যেই মিলাইয়া গেল। পাকিলও না, বেদনাদি অন্য কোন উপসর্গও আসিল না। চিকিৎসকেরাও ইহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরে ঠাকুরকে আমি এই ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে বাস্তবিকই দেখিয়াছিলাম কিনা, এত সহজে এমন মারাত্মক পীড়া কি করিয়া সারিল, ইত্যাদি কোন কথাই বাদ দেই নাই। ঠাকুর সেই একই উত্তর করিয়াছিলেন। "এই রকম ত হয়ই।"

"ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে একদিন তাঁহার ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে হঠাৎ এক খবর পাইয়া তিনি তাঁহার দুই ভ্রাতার উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময়ে টেলিফোনে স্যার নীলরতন

তাহাকে জানান যে একজন রোগী আসিয়াছে এবং তাহাকে ডাক্তারদার একবার শীঘ্র যাইয়া পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ডাক্তারদা স্থির করিলেন যে স্যার নীলরতনের বাড়ীতে রোগীটিকে দেখিয়া পরে নিজের বাড়ীতে ফিরিবেন। স্যার নীলরতনের বাড়ীর দিকে রওনা হইয়া বৌবাজার ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মোড়ের নিকটে পৌঁছিতেই তিনি দেখিলেন যে ঠাকুর একদিকের ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। ডাক্তারদা তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। নিকটেই মতিবাবুর ডিক্সনলেনের বাসা। ডাক্তারদা ড্রাইভারকে সেখানে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। ডাক্তারদা মনে মনে স্থির করিলেন যে ঠাকুরকে মতিবাবুর বাসায় রাখিয়া রোগী দেখিতে চলিয়া যাইবেন এবং পরে আবার ঠাকুরের নিকট চলিয়া আসিবেন। গাড়ী চলিতে লাগিল, তুই একটী কথার পর হঠাৎ ঠাকুর ডাক্তারদাকে বলিলেন। "তুর্য্যোধনেরা একশ ভাই ছিল, লোক কেহই ভাল ছিল না। তথাপি নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়া করিত না।" ঠাকুরের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদার ভাইদের সহিত একটা বোঝাপড়া করার সঙ্কল্পটাও একেবারেই শিথিল হইয়া গেল।

একটু পরেই তাঁহারা যাইয়া মতিবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরকে পাইয়া মতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ঠাকুরকে দোতালার একখানি ঘরে আনিয়া বসাইলেন। একটু পরেই ডাক্তারদা স্যার নীলরতনের বাড়ীতে সেই রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন এবং মতিবাবু ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু ফলমূলাদি কিনিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে বাজারের

দিকে রওনা হইলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে ডাক্তারদা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে মতিবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিতান্ত ব্যগ্রভাবে উপরে নীচে ঠাকুরকে খোঁজাখুঁজি করিতেছেন। ডাক্তারদার প্রশ্নের উত্তরে মতি-বাবু বলিলেন, "বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপরের ঘরে যাইয়া দেখি ঠাকুর নাই। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে তিনিও কিছু বলিতে পারিলেন না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে ঠাকুর আমার বাড়ীতে নাই। কী হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" —নাই নাই-ই, সে যাত্রায় আর ঠাকুরের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ইহার কিছুদিন পরে এই ব্যাপারটা লইয়া ডাক্তারদার ৺সত্যেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সত্যেন্দ্র বাবু তখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন। ডাক্তারদার কথা শুনিয়া সত্যেন্দ্রবাবু বলিলেন যে নিশ্চয়ই তাঁহার তারিখের ভুল হইয়াছে। কারণ উক্ত তারিখে ঠাকুর সিমলাতে সত্যেন্দ্রবাবুর বাসায় উপস্থিত ছিলেন। তদুত্তরে ডাক্তারদা বলিলেন যে তারিখটা তাঁহার সঠিক মনে আছে। তিনি যে কোন ভুল করিয়াছেন, ইহা তাঁহার মনে হয় না। তথাপি নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য সত্যেন্দ্রবাবুকে লইয়া মতিবাবুর দোকানে গেলেন। মতিবাবুর যখন যাহা খরচ সমস্তই তারিখ সহ তাঁহার জমাখরচের খাতায় লেখা থাকিত। সেদিন ঠাকুরের জন্য তিনি যে ফলমূল কিনিয়া আনিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই তাঁহার খাতায় উঠিয়াছে এবং খাতা দেখিলেই তারিখটিও বাহির হইয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যেই সত্যেন্দ্রবাবুকে লইয়া ডাক্তারদা মতিবাবুর দোকানে আসিলেন। খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেই নিঃসন্দেহে বুঝিতে

পাওয়া গেল যে ঠাকুর সিমলায় সত্যেন্দ্রবাবুর বাসায় এবং কলিকাতার রাস্তায় ও মতিবাবুর বাসায় একই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।”

এই প্রকারের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমার বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতার ইন্‌কামট্যাক্সের অবসর প্রাপ্ত কমিশনার) কলিকাতার উপকণ্ঠে টালীগঞ্জ অঞ্চলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এক বৎসর রামনবমী উৎসব উপলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ভদ্রলোক একবার রামনবমী উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছিলেন। অতুলবাবু পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উৎসব দিবসে তাঁহার বাড়ী উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তৎপর উৎসবের দিন প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁহার বাড়ীতে নিয়া যান। কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীঠাকুর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত দিন ঐ ভাবেই কাটাইয়া সন্ধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। বলাবাহুল্য গৃহকর্ত্তা ও সমবেত ভক্ত ও আশ্রিতগণ সমস্ত দিন ঠাকুরের দর্শনে বঞ্চিত হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু ঐ বাড়ীতে গমন করেন এবং গৃহকর্ত্তার অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত দিন কেন ঐ ভাবে ছিলেন জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, “সব জায়গায়ই ত দেখিতে হয়।”

ইহার তিনদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপর একজন আশ্রিত শ্রীযুক্ত

দীনেশচরণ বসু তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বসু নিকট হইতে এক-খানা পত্র পাইয়া তাহা মনীন্দ্রবাবুকে দেখাইলেন। ঐ পত্রে তাঁহার পিতা তাঁহাদেয় নিজ গ্রাম (ঢাকা জিলার বাহেরক) হইতে জানাইয়াছেন যে বিগত রামনবমী উৎসব বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব দিবস বেলা আনুমানিক এগারটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর অপ্রত্যা-শিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তিন চার ঘণ্টা কাল সেখানে অবস্থান করেন। অপরাহ্নে তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতার জন্য বহর স্টেশন হইতে ষ্টীমারে তুলিয়া দেন। ঐ পত্রে দীনেশবাবুর পিতা তাঁহাকে শ্রীঠাকুরের পৌঁছসংবাদ জানাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেন।

এই পত্র পাওয়ার সময়ও শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রবাবু ও দীনেশবাবু উক্তপত্রে লিখিত বিবরণ সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গমন করিলেন এবং উহার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বের উত্তরই পুনরায় উচ্চারণ করেন এবং অধিকন্তু বলেন সেখানেও দেখিতে গিয়াছিলেন। অথচ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উক্ত তারিখে ঐ সমস্ত সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুর টালীগঞ্জের অতুলবাবুর বাড়ীতে চাদর মুড়ি দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি অর্চ্চনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আমি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। তৎপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে প্রয়াসী হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রদাদার হিমাদ্রি পত্রিকায় লিখিত বিবরণ তাঁহার নিকট হইতে পাইয়া সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামাণিক গ্রামে অবস্থিত বাড়ীতে ও

কয়েকবার যাইয়া ঐ বাড়ীর লোকদের নিকট হইতে যে সমস্ত বিষয় সঠিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যেখানে বিন্দুমাত্র ও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে, ঐগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিয়াছি। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত আমার বিশিষ্ট বন্ধুগণ হইতে যথাসম্ভব সত্যনিরূপণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রায় সমস্ত জীবনই যথাসম্ভব প্রচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়াই অতিবাহিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা আরম্ভ করিতেও বহুবার ইতঃস্তত করিয়াছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে তাঁহার জীবনী আলোচনা করার কিংবা লেখার জন্য আমি নানা-কারণেই একেবারে অযোগ্য—ইহা মনেপ্রাণে সকল সময়েই অনুভব করি। কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি অর্চ্চনা করিতে করিতে মনে হইল যে হয়ত পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহার জীবনী অবগত হওয়ার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন, বিশেষতঃ অনেকেই তাঁহার সম্পর্কে যথাসম্ভব সকল বিষয় জানিতে অত্যন্ত উৎসুক, ইহা আমার অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষভাবে জানি। এই পর্য্যন্ত কেহই মৌখিক বা লিখিত ভাবে কালক্রমানুসারে ঠাকুরের জীবনী আমার নিকট বিবৃত করিতে পারেন নাই এবং কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াও আমার মনে হয় না। কারণ তাঁহার জীবনের বহু বৎসরই পাহাড়ে, পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে ও বহু দূরবর্ত্তী তীর্থ স্থানাদিতে অতিবাহিত হইয়াছে। দেশের লোকের সঙ্গে ঐ সময়ে দেখা হওয়ার কোন সুযোগ ছিলনা এবং তিনি নিজে খুব ক্বচিৎ ঐ সকল সম্পর্কে কোন বর্ণনা দিয়াছেন। অতএব আমার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার অনুভূতি সত্ত্বেও কর্ত্তব্যের অনু-

রোধে ন্যায়-অন্যায় ও ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নানাস্থান হইতে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ঘটনাবলি সংগ্রহ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি অর্চ্চনা প্রসঙ্গে এই পুস্তকে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যাহা প্রথম অংশে বিবৃত করিয়াছি, তাহা ছাড়া অনেক কথাই যে সকল সহৃদয় সুহৃদবর্গের মৌখিক বা লিখিত বিবরণ হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলের নিকট আমার আন্তরিক কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বিশেষতঃ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনীর অনেক অংশের জন্যই আমি পরম শ্রদ্ধাস্পদ দাদা শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আশা করি তাঁহারা সকলেই নিজগুণে আমার সর্ব্ব প্রকারের ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। যাহাতে পাঠকবর্গ শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অন্তত কতেক পরিমাণে সঠিক বিবরণ জানিতে পারেন, তজ্জন্য ধৃষ্টতা হইলেও আমি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন বন্ধুগণের ঐ প্রকাশের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি। এই জন্য তাঁহাদের নিকট চির ঋণী রহিলাম।

বেদবাণী

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভক্তগণের পত্রের উত্তরে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সহস্রাধিক পত্র সংগ্রহ করিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ে প্রধান ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, ঐ সকল পত্র হইতে মানব মাত্রেরই গ্রহণীয় উপদেশাবলী সন্নিবেশিত করিয়া 'বেদবাণী' আখ্যায় তিনখানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রগুলির বর্ণশুদ্ধি কিংবা সেমিকোলেন পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তন করিতে সাহস করেন নাই। এই সম্পর্কে তিনি বেদবাণীর প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন— "শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র লেখাও এক অভিনব ব্যাপার ছিল। ইহা দেখিবার সৌভাগ্য আমার অনেকবারই হইয়াছে এবং সকল সময়ই লক্ষ্য করিয়াছি যে তিনি পোষ্টকার্ড কিংবা চিঠির কাগজ হাতে লইয়া এক ধারায় লিখিয়া গিয়াছেন। লেখা শেষ হইলে ফিরিয়া পড়িতেও কখনও দেখি নাই। আমার সর্ব্বদাই মনে হইয়াছে যে, চিঠিখানা যেন আপনিই লেখা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতখানি নিমিত্ত মাত্র। মন কিংবা বুদ্ধির কোন ক্রিয়া যেন ইহাতে নাই।...আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্রাবলীর সামান্য পরিবর্ত্তন করিতেও সাহসা হই নাই।" শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র লেখা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ একইরূপ।

'বেদবাণী'কে আমি ভগবৎবাণী বলিয়াই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। শ্রীশ্রীঠাকুবের প্রকট লীলা সম্বরণের পর আমার বিশ্বাস, তাঁহারই

প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইন্দুবাবু এই সঙ্কলনের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশাবলী এমনই গভীরার্থ ব্যঞ্জক ছিল যে, আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারীদের পক্ষে তাহা বহুবার শুনিয়াও মনে রাখা বা অন্যের নিকট প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। সুতরাং এইভাবে 'বেদবাণী' সঙ্কলিত না হইলে, মানবের ঐহিক ও পারত্রিক সুখ, শান্তি ও মুক্তির প্রকৃষ্টতম, সহজতম ও প্রত্যক্ষতম উপদেশাবলী জগতে পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ হইত না। শ্রীশ্রীঠাকুর সমস্ত শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া যে অমৃতোপম উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বহুবার শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। অথচ প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির হয়ত নানা প্রকারের শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, নানা মুনির নানা মতে দ্বন্দ্বের ধাঁধাঁয় পড়িয়া অকূল সাগরে নিয়ত ভাসিয়া বেড়ানোই সার হইত, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব হইত না হয়ত বহু পাঠাভ্যাস দ্বারা প্রকৃত সত্য হারাইয়া কেবল কাব্যরচনার অধিকারী হইয়া সত্য-প্রাপ্তির পথ হইতে তিনি দূরে সরিয়া পড়িতেন।

আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও সত্যের অনুরোধে আমি ইহা প্রকাশ করিতে বাধ্য—আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে কলিযুগের শেষে নানা দেশের নানা জাতীয় লোক প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা ভুলিয়া বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠান আদিকেই ধর্ম্মজ্ঞানে যে অশান্তিকর ও ভ্রমাত্মক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে জগতের লোককে মুক্ত করিয়া সকল জীবের পক্ষেই যাহা একমাত্র শ্রেয়, সেই বাণী প্রচারের জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সকল ধর্ম্মের সার যে একই সত্য তাহা উপলব্ধি করিতে বারংবার

উপদেশ দিয়াছেন। নিজ নিজ ধর্ম্মে পূর্ণবিশ্বাসী থাকিয়াও বিভিন্ন ধর্ম্মাবিলম্বী লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিলে ধর্ম্মবিরোধের ভাব মন হইতে সম্পুর্ণ অপসারিত হয়। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্মে সমন্বয়ের মূলমন্ত্র, যাহা গ্রহণ করিয়া সকল দেশের সর্ব্বজাতির লোক মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং ক্রমশঃ অবিচ্ছিন্ন বিমল আনন্দলাভের অধিকারী হয় সেই মন্ত্রেই তিনি প্রচার করিয়াছেন, 'বেদবাণী'র আটশত আটখানা পত্রের মধ্যে এক-খানা পত্রও এমন নাই, যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের বা জাতির লোক কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। পরন্তু, যদি ঐ উপদেশানু-যায়ী সহজ পন্থার অনুশীলনে কেহ ব্রতী হন তাহা হইলে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস কিছুদিন অভ্যাসের পরই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐ উপদেশাবলীতে কি গূঢ় সত্য নিহিত আছে।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা আমার মনে পড়িল। এক বৎসর নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত মাইজদীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল স্থানের ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বাৎসরিক জন্মোৎসবের পূর্ব্বে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকের সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সার্ব্বজনীন উপদেশাবলী আলোচনার সময় আমি প্রত্যেক খণ্ড 'বেদবাণী' হইতে বাছাবাছি না করিয়া দুই তিনখানা পত্র আস্তে আস্তে পড়িয়া শুনাইয়া এবং তৎসম্পর্কে সামান্য আলোচনা করিয়া বসিয়া পড়িলে, নোয়াখালা জিলার তৎকালীন পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিঃ এম, এল্, হক দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি তাঁহার গুরুদেব সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার গুরুদেব ত কেবল তাঁহাদের কয়েকজনের গুরুদেব

নহেন, তিনি সকলেরই গুরুদেব হইতে পারেন।" ঐ সভায় নোয়া-খালী জিলার তৎকালীন মুসলমান জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বহু শত লোকের সমক্ষে তাঁহার পক্ষে ঐ ভাবে বক্তৃতা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না, যদি তিনি প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব না করিতেন যে ঠাকুর সকল ধর্ম্মের সার সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোককেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। এমন কি সকল জীবের মধ্যেই আত্মা বা প্রাণশক্তি একই, যদিও বিভিন্ন আবরণে আবৃত হওয়ায় প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও নাম প্রচার হইয়া থাকে এবং প্রকৃতিও বিভিন্ন হয় বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাহাকেও অশ্রদ্ধা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। তাঁহার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ আদি নানা সম্প্রদায়ের ভক্তই আছেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং অনেক সময়ই বলিতেন, "যার যেই ভাব, সে-ই সর্ব্বোত্তম।" এই সমস্ত নানা কারণেই তিনি সকল ধর্ম্মের লোককেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। যিনি একবার সশ্রদ্ধ ভাব লইয়া গিয়া অতি অল্প সময়ের জন্যও তাঁহার সান্নিধ্যের সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব লইয়া আসিয়াছেন বহুক্ষেত্রে ইহাই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহার বাৎসরিক জন্মোৎসবে ও তাঁহার সম্পর্কীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানে পাকিস্থান সরকার সকল সময় আমাদিগকে আশাতীত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ত কথাই নাই, যাঁহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী নহেন

বলিয়া লোকে প্রচার করে, তিনি তাঁহাদিগকেও কখনও নিন্দাসূচক কোন আখ্যা দিতেন না। একদিন আমাদের ঠাকুর ঘরে অনেক লোকের সমক্ষে একজন ভদ্রলোক বলিয়া ফেলিলেন, যে অমুক লোক একেবারেই নাস্তিক। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, "নাস্তিক তো ভালই।"

তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রায় ২৫ বৎসর তাঁহাকেই আমার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র সম্বল মনে করিয়া তাঁহার কথা যথাসাধ্য মনোযোগের সহিত শুনিয়া ও বহুবার তাঁহারই শ্রীহস্ত লিখিত 'বেদবাণী' পাঠ করিয়া আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিরোধ ও মতানৈক্য লইয়া বিবাদ বিসংবাদ সম্পূর্ণই ভ্রান্তিমূলক। মানব মাত্রই বিভিন্ন প্রকৃতি বা স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহা প্রত্যেকেরই পূর্ব্ব জন্মার্জিত কর্ম্মফলের সমষ্টিমাত্র। ঐ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের শক্তি কাহারও নাই। ভবিতব্য, ভাগ্য, প্রারব্ধ অথবা প্রাক্তনই ইহার একমাত্র নিয়ন্তা। অতএব কোন মানুষকে তাহার প্রকৃতিগত আচরণের জন্য দোষ দেওয়া বৃথা। আমরা যখন বহু চেষ্টা করিয়াও নিজেদের প্রকৃতির দুর্ব্বলতা জানিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারি না, তদবস্থায় অন্যের উপর দোষারোপ করা সঙ্গত হয় কি? ঠাকুর আমাদের নিজ নিজ দোষগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন বা পবিত্র করার চেষ্টা করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। অপরের দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের পবিত্র সত্বাকে যেন মলিন না করি, ইহাই তাঁহার পুনঃ পুনঃ উপদেশ ছিল।

'বেদবাণী' বারংবার পাঠ করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, উহা অভিনিবিষ্ট চিত্তে যত বেশী বার পড়া যায়, ততই তাহা হইতে

বেশী আলোক পাওয়া যায় এবং রসাস্বাদন অনেক বেশী হয়। ইহা এমনই জিনিষ যে অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় পড়িয়া গেলে আমাদের ন্যায় নিম্নাধিকারিগণ প্রায় কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না। বরং সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ও রসশূন্য মনে করিয়া তাহা পাঠের অযোগ্য বলিয়া মনে হওয়াও-তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

'বেদবাণী'র পাঠক বর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষমতা ও অধিকারানুযায়ী তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, সত্য যদিও একই তত্রাচ তাহা অধিকারী ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। সত্যকেই একমাত্র আশ্রয় করিলে, আর কোন প্রকারের দ্বন্দ্বের ভাব মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হওয়ায় নিরপেক্ষতা অবলম্বনে পরম আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিতে পারা যায়—ইহাই তাঁহার উপদেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ আশ্রয় করিয়া এবং 'বেদবাণী' পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া এ যাবৎ সত্যের আবছায়া কতটুকু পাইয়াছি তাহা জানি না। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে ও তদনুযায়ী আচরণ করিতে কত যুগ পরে তিনি আমাকে শক্তি দিবেন, তাহা তিনিই জানেন, কিন্তু ইহা খুবই উপলব্ধি করি যে, ঐ পথে এখনও আমি প্রায় কিছুই অগ্রসর হইতে পারি নাই। তত্রাচ, আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইলেও যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে 'বেদবাণী' পাঠের ও উপলব্ধির সুবিধা হইবে মনে করিয়া আমি এ যাবৎ যাহা বুঝিতে পারিয়াছি তাহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও মুখে বা তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত পত্রে ঐহিক

সুখ, সমৃদ্ধি প্রাপ্তির বা ভোগের কোন উপদেশ দেন নাই। কিন্তু তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে, প্রারব্ধানুযায়ী যে সাংসারিক সুখ শান্তি সাময়িক ভাবে আসিবে তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেও নির্দ্দেশ দেন নাই। তিনি সাংসারিক উপস্থিত কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাও ভগবৎ সেবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, দেশবাসী সকলের সঙ্গেই প্রেমপ্রতিভ হইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করিয়া 'মর্কট বৈরাগ্যের'র ভাবে বনে যাওয়া কি তীর্থ পর্য্যটন করা তিনি কখনও সমর্থন করেন নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি সকলের প্রতি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তি বশতঃ আমরা যেন ভগবানকে ভুলিয়া না যাই।

নাম

শ্রীশ্রীঠাকুরের মৌখিক উপদেশ ও পত্রাবলী একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই সত্য তিনি বারংবার প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই আমার ধারণা। তাহা অতি সহজ কিন্তু অভ্যাস করিয়া কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত দুরূহ। এই মায়াময় সংসারের সুখ-দুঃখ, শান্তি অশান্তি, ভাল-মন্দ, আপন-পর, শত্রু-মিত্র, ইত্যাদি নানা দ্বন্দ্ব বুদ্ধির অফুরন্ত তরঙ্গায়িত অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধারের একমাত্র সম্বল "নাম"—ইহাই তিনি বহুবার বুঝাইয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, আমার প্রকৃতিগত বহু দুর্ব্বলতা তাঁহার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐসকল সংশোধন করিতে কখনও বলেন নাই, যদিও আমি নানা স্থানে নানা সময়ে তাঁহার সহিত একাই বাস করিয়াছি। তিনি অহৈতুকী কৃপা-সিন্ধুরূপে আমাকে দীক্ষা দেওয়ার পরবর্ত্তী পূজার বন্ধে তাঁহার সঙ্গে প্রায় একমাস নানা স্থানে ঘোরার পর আমি তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "সেবার তো দয়া করিয়া আমাকে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তো কিছুই বলিলেন না।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না। যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা করিলেই সমস্তই পাইবেন। আর কিছুর দরকার হইবে না। জানেন তো বটগাছের বীজ কত ছোট, কিন্তু তাহা পরিণামে কত বড় হইয়া যায়।" আমি বলিয়াছিলাম, "আমি তো কিছুই করিতে পারি না।" ঠাকুর বলিলেন, "কিছু করিতে হইবে না, একটু উন্মুখ হইয়া থাকিলেই হইবে। আমি তো আছিই।" অন্য কোনও ভক্তকেও "নাম" করা ছাড়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত কোন দোষ সংশোধনের জন্য কোন উপদেশ দিতে তাঁহাকে শুনি নাই, যদিও আমাদের মধ্যে দৃষ্টতঃ নানা প্রস্তুতি ও স্বভাব বিশিষ্ট তাঁহার বহু ভক্ত বিদ্যমান আছেন। অতএব তিনি নামের উপরই অর্থাৎ ভগবৎ উন্মুখতার প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দিয়াছেন। সেই নাম জপ উচ্চৈঃস্বরেই হোক আর মনে মনেই হোক যিনি যত বেশী করিবেন, ততই অবিচ্ছিন্ন আনন্দের পথে তিনি অগ্রসর হইবেন।

ঠাকুর বলিয়াছেন, নাম করিতে স্থান নাই, অস্থান নাই, শুচি নাই, অশুচি নাই, সময় নাই, অসময় নাই। সকল অবস্থাতেই নাম

করা যাইতে পারে। এমন কি হেলায় বা শ্রদ্ধায় যে ভাবেই নাম করা হউক না কেন, তাহার সুফল হইবেই। যেমন ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অমৃত গ্রহণ করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। চলিতে, ফিরিতে, আহারের সময়, শয়নের সময়, কি যে কোন সময়ে যত বেশী নাম করা যায়, ততই তাহার শক্তি আহরণ করা যাইবে, বলিয়া ঠাকুর বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

'নাম' এবং 'নামী' একই, অসংখ্য নাম ও নামের বিভূতি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। তাহার যে কোন একটিকে সর্ব্বশক্তিমান মনে করিয়া অনন্যভাবে শরণ, মনন ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহা ঠাকুর অনেকবার বলিয়াছেন।

নামের অনন্যশরণে ধৈর্য্যই একমাত্র সম্বল। সুতরাং সকল সময় কামনা বাসনাদির বেগ ধৈর্য্য সহকারে রোধ করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই ধৈর্য্য ধারণও সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের কৃপা সাপেক্ষ। আমাদের চেষ্টায় কি পুরুষকারে ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব। কেবল তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া ফলাফলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে থাকিলে ও ভগবৎ উন্মুখ হইলে, তিনিই ধৈর্য্যধারণের শক্তি প্রদান করেন। এই প্রকার অনন্যশরণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন আনন্দের স্ফুরণ আপনা হইতেই হইতে থাকে। এইভাবে কামনা বাসনা শূণ্য হইয়া দেহত্যাগ করিলে, তিনি দেহীকে সত্যধামে সত্যলোকে লইয়া যান এবং চিরতরে পরমানন্দ সাগরে ডুবাইয়া তাঁহারই পরিকর করিয়া রাখেন। আর পুনঃ গতাগতিময়, অনিত্য, অস্থায়ী সংসারে আসিতে হয় না। সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ, শান্তি অশান্তি ইত্যাদি দ্বন্দ্ব বিভাগ হইতে দেহী মুক্ত

হয়। আনন্দময়ের অংশীভূত হইয়া অবিচ্ছিন্ন আনন্দই উপভোগ করে। নামে আশ্রয় লইলে এই সংসারেও অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না।

নাম কি এবং নাম কি ভাবে করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভক্তগণের পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েকখানা সহজবোধ্য পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ে বাকী পত্রগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করিব।

প্রারব্ধ যোগ

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ভক্তগণকে বহু পত্রেই লিখিয়াছেন এবং মুখেও বলিয়াছেন—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং। অর্থাৎ ভাগ্যানুযায়ীই লোক সুখ, দুঃখ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহার ব্যতিক্রম করা কাহারও বিন্দুমাত্রও সাধ্যায়ত্ত নহে। দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ আদি জীব মাত্রই প্রারব্ধের দাস বা অধীন, এই প্রারব্ধ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল হেতু সৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবিতব্য বা ভগবানই ইহার একমাত্র নিয়ন্তা। আমরা কর্ত্তা হইয়া ভাগ্যভোগ কাটাইবার জন্য নানাবিধ-রূপে যত চেষ্টাই করি না কেন, তদ্বারা পরবর্ত্তী জন্মের প্রারব্ধ ভোগই বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভাগ্যের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না। ভাগ্যরথে চলিয়া অর্থাৎ ভাগ্যে যাহাই ফলোদয় হউক না কেন, তাহাতে বিচলিত না হইয়া অকাতরে ঐ ভোগ দণ্ড গ্রহণ করিলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলের শোধ হইয়া যায় অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর তজ্জন্য কোন অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। এই প্রকারে ঋণ শোধ ব্যতীত কেহই অবিচ্ছিন্ন

আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা হইতেছে এবং হইবেই ; এ ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে জীবমাত্রই নানা ভাবনা, চিন্তা, জল্পনা, কল্পনা আদি হইতে রক্ষা পাইয়া অনেকটা শান্তিতে থাকিতে পারে। এই জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাও বলিয়াছেন যে, এমন কি শ্রীভগবানও এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি অনুষ্ঠান করিয়াও ইহার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা সাময়িক ঐহিক শান্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরিণামে প্রারব্ধ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চয়।

যদি ভবিতব্যের বা ভাগ্যের এইরূপ অসীম অপরিবর্ত্তনশীল শক্তির বিষয় জীব সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করে তাহা হইলে অনেক দুঃসহ মনোবেদনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতেও অহৈতুকী ভাবে লোক উৎপীড়িত হয়, এমনকি মিথ্যা অপবাদেও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। তখন স্বতঃই রাগ দ্বেষ আদি হীনভাবে আক্রান্ত হইয়া লোক দিশাহারা হইয়া ছট্‌ফট্ করে এবং নিজেও তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। যদি ঐ সময় সেই লোক মনে প্রাণে অনুভব করে যে তাহার প্রতি ঐরূপ অন্যায় আচরণ তাহার-ই ভাগ্য লব্ধ এবং ইহার দ্বারা তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের দরুণ সে যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল তাহার শোধ হইয়া গেল, তাহা হইলে উপরোক্ত দুষ্কৃতিকারীর উপর কোন রাগ বা দ্বেষের ভাব আসিতে পারে না। ভগবানই তাহার মুক্তির পথ দণ্ডভোগ দ্বারা পরিষ্কার করার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন মনে করিয়া শান্তিলাভ করে।

ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা না থাকিলে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীব কেবল অপরের প্রতি দোষারোপে মনকে বিষাক্ত করিয়া নানা জল্পনা কল্পনায় মানসিক নানা দুঃখই ভোগ করে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও প্রতিকার না পাইয়া কেবল দুঃখ ও অশান্তির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রারব্ধ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোর দেওয়ায় এবং নামের অসীম শক্তি বলিয়াও অনেক সময় নির্দ্দেশ করায়, আমি একদিন তাঁহাকে প্রারব্ধের অলঙ্ঘনীয় ভোগের বিষয় আলোচনার কালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"প্রারব্ধ ভোগ কি নামেও কাটে না?" ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"নামে সবই কাটে।" 'বেদবাণী'র কয়েকখানা পত্রেও নামে গ্রহবৈগুণ্যও কাটে বলিয়া পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রারব্ধ ঋণ শোধ করিতে হইলে, অবিশ্রান্ত নামের আশ্রয়ে থাকার চেষ্টাই আমাদের একমাত্র সম্বল। অন্য চেষ্টা একেবারে বৃথা। ঠাকুর কোন ভক্তের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"ভগবান কাহারও অদৃষ্টের ভোগ নষ্ট করিতে পারেন না। এক নামেই পারে।" (বেদবাণী—২য় খণ্ড—৬৫নং পত্র)

অতএব যখন ভাগ্য ভোগ দণ্ড এড়াইবার জন্য নামের আশ্রয় ব্যতীত আর কোন উপায়ই নাই, ভাগ্যে যখন যাহাই আসুক তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া অবিশ্রান্ত নাম জপের চেষ্টা করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহাতে অসহনীয় রোগ শোকের যাতনাও অনেকটা প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রারব্ধ ভোগ ও তাহার শান্তি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকখানি পত্রাংশও পরে উদ্ধৃত করা যাইবে।

পতিব্রতা ধৰ্ম্ম

শ্রীশ্রীঠাকুর বহুপত্রে এবং মৌখিক উপদেশেও অনেক সময় পতিব্রতা ধৰ্ম্ম বা সত্যব্রত কি সাবিত্রীব্রত সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি অনন্য মনে, একনিষ্ঠভাবে ভগবৎ চিন্তা, ধ্যান ও উন্মুখতাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগ্যানুযায়ী মানব যখন যে অবস্থায়ই পতিত হোক না কেন সকল সময়, সকল অবস্থায় ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখার ভাবকেই 'পতিব্রতা ধৰ্ম্ম' বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগ্য বিপর্য্যয়ে মানব নানা দুরবস্থায় পতিত হইলে অনেক সময় ভগবানকে ভুলিয়া যায়। এমন কি ভগবানের অস্তিত্বেও অবিশ্বাস করে। আবার কখনও কখনও নানা ভোগ ঐশ্বর্য্যের আওতায় পড়িয়া অহংকারের দাস হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়। এই উভয় অবস্থাই জীবের শান্তির ও মুক্তির পথে বাধা হয়। এই জন্যই এইপ্রকার কোন অবস্থায়ই অস্থির বা চঞ্চল না হইয়া ভগবদ ভক্তির আশ্রয়ে সকল সময়ে স্থির ভাবাপন্ন হইয়া থাকাই পরম ধৰ্ম্ম বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে বারংবার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে তাঁহার কয়েকটি পত্রাংশ পরে লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ বিষয়ে অন্যান্য পত্রগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইবে।

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং

১। "সংসারের প্রাক্তন ব্যাপারের বেগ সহ্য ভিন্ন উতালা হইলে চলে না। অদৃষ্টচক্রে বিপদস্থও করে আবার নিরাপদও হয়।

কালেই সকল ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া ভগবানের শরণ লইয়া পড়িয়া থাকাই উচিৎ।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড, ৩১২নং)

২। "ভাগ্যবশে সমস্তই হইয়া থাকে। যাহার যে ভাগ্যফল যাহা প্রাপ্য আছে কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না। ভগবানের ভাগও নাই তাঁহার কোন ফলও নাই, ভগবানের লইয়া থাকিতে পারিলে সৌভাগ্য লাভ করিয়া, সকল দায় ঋণ হইতে মুক্তি পাইয়া অখণ্ডভাবে নির্লিপ্তে নিরাকারের বসবাস পাইয়া থাকে। এই কর্ম্মই ধৈর্য্য ধারণ করা। সত্যনারায়ণের চরণে অর্থাৎ আশ্রিত জনকে কালে কি যমে স্পর্শ করিতে পারে না। যেহেতু কালের বশে থাকে না। অতএব সম্প্রতিক ধৈর্য্যের আশ্রয়ই ধর্ম্ম, হুজুগে মাতিয়া কোন কর্ম্মই ফল প্রসব করিতে পারে না।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। যতোঽধর্ম্মস্ততঃ ক্ষয়ঃ। ভাগ্যই ফলদাতা সৌভাগ্যই ভবেত্রাতা।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
অভিমন্যুং রণে হন্যুর্নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

অতএব ভাগ্যই বলবান। অক্ষয় হইয়া থাকে।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৫৬নং)

১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—১, ২, ১০, ১২, ২০, ২১, ২২, ৩২, ৫৩, ৪০, ৬১, ৭১, ৯৫, ১০৫, ১১৭, ১২০, ১২৯, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৫১, ১৬৩, ১৬৫, ১৮৪, ১৯১, ২১১, ২১৬, ২২৪, ২৫৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৪ ৩৫৮, ৩৮৯।

৩। "প্রাক্তনের হাত ছাড়াইয়া নিতে কিছুরই শক্তি নাই। এই প্রাক্তনেই সুখ দুঃখ, লাভ লোকসান, ভাল মন্দের প্রতিপোষণ

করেন। ভাগ্যে যাহা যখন ঘটিবে তখন তাহার জন্য উতলা হইতে নাই……যখন প্রারব্ধ ভোগের দণ্ড মুক্তির কোন উপায় নাই-ই তখন এ চিন্তা ভুলই। নামে পড়িয়া থাকিবেন। (যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরে আপনি শ্রীহরি॥) নাম বৈ আর কিছুই থাকিতে দেখা যায় না। নামই থাকিবে, নামের সঙ্গে থাকিয়া নামের সেবা পরিচর্য্যা করাই ধর্ম্ম। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৮৩নং)

৪। "লোক সকল স্ব স্ব ভাগ্যবশে দেশ, স্থান, ধনী, মানী, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দৌলত সম্ভোগ করিয়া থাকে। তাহাতেই লোক সুখী দুঃখী হইয়া থাকে। এই ভাগ্য ভোগ পরিহারের জন্যই ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব সর্ব্বদাই ধৈর্য্য ধরিয়া চেষ্টা করুন, ভাগ্য হইতেই সকল মীমাংসা পাইবেন।…ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে সেইজন্য কোন চিন্তা ভাবনা না করিয়া সত্যদেবের অনুশীলন চিন্তা করুন। তিনিই একটা বিহিত করিবেন। ইহা ছাড়া কিছুই নাই। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৪০নং)

২য় খণ্ডে—৪, ৬, ১২, ১৩, ২০-২২, ৩১, ৩৪, ৫১, ৫২, ৫৪, ৭২, ৭৮, ৯৪, ৯৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৭, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০ ১৯৫, ২০০, ২০৭, সময় গতিকে বন্ধু বান্ধব ও অসমতা হইয়া থাকে। তাহা সকলই উদয় অস্তশীল—১৬৫।

৫। "দুঃখ কষ্ট গ্রহবৈগুণ্যে হয়। ভাগ্যে যাহা আছে ভোগ করিতেই হয়। ভাগ্যে যাহা নাই তাহা কোথা হইতে আসিবে? কাহারও ইচ্ছায় কোন কিছুই হয় না। চেষ্টা তো করিতেছেন, চেষ্টা করিতে করিতে যেটুকু ভাগ্যে আছে সেইটুকু আসিবে।

(বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৪৪ নং)

৩য় খণ্ড—১, ১৫, ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪৪, ৫৫, ৭৩, ৭৬, ১২৮, ১২৮, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৮২, ১৮৪।

ভাগ্য অনুসারে কর্ম্মভোগ—ভোগ দানে শান্তি। অদৃষ্টচক্রের ভোগমুক্তির উপায়—

১। "ভোগের তাড়না সহ্য করাই ধর্ম্ম। সহ্য করিতে করিতে আরোগ্য হইয়া থাকে।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২১৪ নং),

২। "প্রারব্ধ ভোগদান করাই জগতের ব্রহ্মযজ্ঞ, প্রারব্ধ ভুঞ্জমানানি গীতাধ্যান পরায়ণা। শরীরেই প্রাক্তন শাসন ঘটিয়া থাকে। শরীরীর কিন্তু প্রাক্তন ভোগের দণ্ড হয় না। যাই হউক, (যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ) বেদবাক্য। সহ্য করাই পরম ধর্ম্ম এবং পুরুষার্থ, অধির হওয়াই কাপুরুষতা। সংসার মায়াচ্ছন্ন ভ্রমমূলক। ভ্রান্তিবশত সৎ অসৎ চর্চ্চায় বিমুগ্ধ হয়, স্বরূপলাভ ব্যতীত পরা শান্তি ঘটেনা। সুখে দুঃখে সমান করিয়া লওয়াই স্বরূপ ধর্ম্ম। সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" শ্রুতিবাক্য। কেবল সংসারের তাড়না অদৃষ্টচক্রে যাহা যখন ঘটে ধৈর্য্য ধরিয়া যাইবেন। ধৈর্য্য ব্যতীত আর কি মানব দেহের শক্তি আছে [?]

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৭৭নং)

১ম খণ্ড—৪৯, ৫১, ৯৮, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৬, ১৭২, ২০৬, ২১৯, ২৩৩, ২৭২, ২৯৩, ৩০০, ৩০৩, ৩১৮, ৩৭৪, ৩৯১, ৩৯৪।

৩। "ভাগ্য ফলদাতা, ভাগ্যকে মানিয়া চলিতে চলিতে সকল দায়মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। ভাগ্যের বেশী

প্রয়োজনে বন্ধ হইয়া অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথকে আটকাইয়া রাখে। অতএব ভাগ্যের রথে চলিলে ভগীরথ উপাধি হইয়া সগর বংশ উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে পারে।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৪৫নং)

৪। "সংসারের যে কোন সুখ দুঃখ সকলি ইন্দ্রজালের ঘেরা, অনিত্য আগমপায়ী, বন্ধনই হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে এই সকল সুখ দুঃখময় বুদ্ধির বিষয় হইতে মুক্তি হইতে পারেন তাহারই প্রতি সর্ব্বদা মননিবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন। সর্ব্বদা শ্বাসপ্রশ্বাস যত ধীরে ধীরে চালাইয়া জপের অভ্যাস করিতে পারেন, তাহাই চেষ্টা করিবেন। সংসারে যখন যাহা হইবে ভোগ নিতে নিতে, সহ্য করিতে করিতে ভোগ ক্ষয় পাইবে, সংসার মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।"

(বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৯৪ নং)

২য় খণ্ড—১, ২৪, ২৭, ৩৭, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৬৯, ৮৪, ৮৬, ৯৮, ১০০ ১০৬, ১০৭, ১১৭, ১৫২, ১৫৬, ১৫৯, ১৭৬, ১৮২, ২০৩, ২১১।

৫। "যে কোনরূপ বিপদই হউক না কেন নাম করিলে সমস্ত শান্তি হইয়া যাইবে এবং নিজেও শান্তি পাইবে।"

(বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৭নং)

প্রাক্তনসূত্রে যাহা যাহা করেন তাহাই আনন্দের সহিত ভোগ করিতে হয়। ইহাই ভগবানে ভোগদান করা হয়। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার নামে পড়িয়া থাকিলে মঙ্গলই হয়। ভাগ্যবশতঃই আয় ব্যয় হইয়া থাকে। রাগ দ্বেষ হিংসার নিকট থাকিতে হয় না।"

(বেদবাণী, ৩য়, খণ্ড, ১৫৭নং)

৩য় খণ্ড—৯, ১০, ১৫, ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৫৩,

৫৯, ৬০, ৬৭, ৭২, ৮৫, ৮৭, ৯৮, ১০৯, ১১২, ১১৭, ১১৮, ১৪১, ১৫৫, ১৬১, ১৬৫, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ১৮৬, ১৯০।

নাম কি ? নামই সত্য, এই বই আর কিছুই নাই। সর্ব্বদা নামে নির্ভর করিয়া থাকিবে। নামই সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি করিবেন। নাম বই আর কিছুই শান্তি দিতে পারে না।

১। "কেবল নাম করিবে। নামেই সকল অবস্থা স্থির করিয়া নিবে। চিন্তা করিবেন না।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৭৮নং)।

১ম খণ্ড—১০৬, ১১১, ১৭৪, ১৭৫, ২৪০, ২৪৩, ২৪৭, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮৭, ২৯০, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৯, ৩০২, ৩০৫, ৩০৮, ৩১০, ৩২১, ৩২৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪, ।

২। "ভগবানের নামই সত্য, নামই শান্তি, নামই আনন্দ, নামের আশ্রয় লইলে অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না, কোথাও তীর্থে যাইতে হয় না। বেদপুরাণগত সুখ দুঃখও থাকে না। সর্ব্বদা আনন্দ প্রকাশ করিয়া অহেতু ভক্তি নামের রুচি প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ত্তাভিমানীর কর্ম্মাদির দ্বারা যাহা কিছু সুখ দুঃখাদি লাভ হয় তাহা সকলি অস্থায়ী, ভগবৎ পদ দিতে পারে না। অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন, মনের শান্তি অশান্তির দিকে লোভ রাখিবেন না, নামেই আপনাকে এই সুখ দুঃখ সংসার সাগরের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করিবেন।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ২নং)।

৩। "ভগবানের নাম আর তার রূপ একই বস্তু জানিয়া কেবল নাম নিয়া পড়িয়া থাকিবেন। ভগবান উদ্ধার করিয়া নিবেন।... সর্ব্বদা নাম করিবেন, নামেতেই সকলি আছে জানিবেন। কর্ত্তৃত্ব দ্বারা যাহা কিছু সুখ দুঃখ হয় তাহা নিত্য নয়, কেবল পরিবর্ত্তনশীল, ঐ

সকল সুখের দুঃখের জন্য প্রলোভিত না হইয়া সর্ব্বদা নাম সুধার প্রলোভন রাখিতে চেষ্টা করিবেন। নামই সত্য, দেহ যতদিন থাকিবে ততদিনই প্রাক্তনের আধিপত্য; তারপর ভগবানের নিকট প্রারব্ধের কোন ক্ষমতা থাকে না।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৭নং)।

৪। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ"। নাম চিন্তামনি, নামের মধ্যেই সমস্ত আছে। সেবা শব্দটিই সর্ব্বদা নামের নিকট থাকা, নামের বাধক যাহা তাহার বেগ সহ্য করিতে অভ্যাস করা, একেই নাম করা বলে, এই প্রকার নামের যত্ন করিতে করিতে নামকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৭৫নং)।

৫। "কালচক্রেই সমস্ত ঘটিয়া থাকে...নাম বই জগতে আর কিছুই ত্রাণের উপায় নাই। নামই সত্য, অতএব সর্ব্বদা নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া হৃদয়ে নামের মন্দির মধ্যে সর্ব্বদা সেবা করিবেন। নামের সেবা করিতে করিতে প্রেমের শক্তি ফুটিয়া উঠিবে।"

(বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১২৩নং)।

২য় খণ্ড—৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৪, ১৭-১৯, ১৩, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৮২, ১৯২, ২২১।

৬। "সর্ব্বদা ধৈর্য্য সহকারে নাম করিবেন। নাম করিতে করিতেই আপনার মনে শান্তি আসিবে। এক নাম ব্যতীত মনে শান্তি পাইবার আর কোন উপায় নাই।...সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিবেন এবং নাম করিবেন, তবেই আপনার মঙ্গল আসিবে।" (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১২নং)।

৭। "অভিন্নচেতা নামোনামিণঃ। নামই ব্রজবাসী, বৃন্দাবনবাসী মথুরাবাসী। ব্রজবাসীর নিকট সর্ব্বদা ভগবান থাকেন। নামই ব্রজেন্দ্রনন্দন। নামের শক্তি গদাধর, নামের ভাব অদ্বৈত, নামের রূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। নামই ভক্তি, নামই চৈতন্য।

৩য় খণ্ড—৮, ১১, ১৩, ৩৩, ৫২, ৫৩, ৬১, ৬২, ৬৬, ৭১, ৭৭, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১১৫, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩০, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৮৫, ১৮৯।

নাম কিভাবে করিতে হয়

প্রথম খণ্ড—ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি সতত বনমালী—৬৬ ও ৯৫।

১। "নাম সংকীর্তন যে চেঁচাইয়া করিলেই হয়, তাহা নহে। মনে মনে করিলেও নাম হয়। নাম বৈ আর কিছুই জগতে ত্রাণের উপায় নাই। এই বুদ্ধিকেই নাম সংকীর্ত্তন বলে, নামের অধীন থাকার নামই সংকীর্ত্তন।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৬৪নং)

২। "সত্য (অর্থাৎ ধীর) কে সর্ব্বদা অভ্যাস করিয়া নাম করিতে হয়। হর্ত্তারস্থাভাবে নাম করিলে হাপাইয়া পড়িতেও হয়, নাম সাধ্য হয় না, রুচিও ধরে না। (ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি) ভগবান বলিয়াছেন। সর্ব্বদাই নাম করিবেন, অনন্যচিন্তাই নাম।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৯১নং)

২য় খণ্ড—১৮৫, ১৮৬, ১৯৪।

৩য় খণ্ড—৮।

নাম কখন পাইবে

১। "যিনি নাম পাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাকে এই নাম লইয়া নামের সেবা করিয়া দক্ষযজ্ঞ ত্যাগ হইয়া যখন নামের অধিন অভিমান ভুক্ত হইবে তখন নাম পাইবে।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি ॥

নাম সত্য। (গোপাল গোবিন্দ) এই নামের সেবক হইলে শ্রীযুক্ত হয়। (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৫নং)।

৩য় খণ্ড—৩৩, ১০৪, ১০৫।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভবিতব্য

১। "জন্ম মৃত্যু বিবাহ সকলি ভবিতব্য ঘটনা করিয়া থাকে, যস্মিন দেশে যদ্ ভাবে যদ্ দণ্ডে যৎ সময়ে যাহার যাহা হইবে, তাহা তাহা ঘটিবে, কেহই ব্যতিক্রম করিতে পারে না। সত্যনারায়ণের অধীন হইয়া থাকিতে পারিলে তাহার দাসকে কালে স্পর্শ করিতে পারে না। সত্যই তাহার পালক হইয়া থাকে জানিবে।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৪৬নং)।

১ম খণ্ড—৫৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫২।

২। ভবিতব্য প্রজাপতি নিবন্ধন—যেখানে যাহার যে ভাবে সংঘটন ঘটে সেই ভাবকেই প্রারব্ধ বলে। শাস্ত্র দেখিলে সকলি মানিতে হয়, না দেখিলে আলাদা কথা। ভবিতব্য যেখানে হইবে জন্ম মৃত্যু বিবাহ তাহা হইবেই। ইহার খণ্ডনকারী এই ত্রিজগতে কেহই নাই।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৪২নং)।

২য় খণ্ড—১৫, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১৫৭, ১৫৮, ১৮০, ১৯৬, ২০১, ২০৪।

৩য় খণ্ড—১৪, ৬৭, ১১১, ১১৪, ১৪৫, ১৮১।

শোকে সান্ত্বনা

১। "যদি নিজের হয় তবে অন্য কেহই নিতে পারে না। যদি নিজের না হয় তবে কি করিয়া রাখিবে? পরের বস্তুর প্রতি কর্ত্তৃত্ব রাখায় ফল কি?" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩০১নং)।

১ম খণ্ড—১২২, ২২৪, ২৫৪।

২। "যাহা যখন হইবে বিধির লিখন তাহা ঘটিবে, তাহাতে জীবের ধৈর্য্য ধরাই কর্ম্ম। যার যখন সময় হয় তাহার রোধ করার কাহারো (জীবের) কোন শক্তি নাই। সকলই কালের কবলে ক্ষয় হইতেছে। দেবদানবাদি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, মানব, বৃক্ষ, তরুলতা, যত প্রাণীগণ সকলি প্রাণের অধিন, যখন সময় উপস্থিত হয় তখনি কাল হয়, কেহই অকালে গতাগতি করিতে পারে না। এই সকল জানিয়া ধীর প্রকৃতি মোহিত হয় না। অতএব···শোক সন্তাপ পরিহারের জন্য ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করুন। বিশেষতঃ যার জন্য অনুতাপ করিতেছেন তাকে ত পাইতেছেন না, পাওয়াও যাইবে না। ···কর্ম্মস্থলের ভাগ্যফলও সময়েই ফলিয়া থাকে, তাহার জন্য চিন্তা ভাবনা না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকুন। সত্যকে ভুলিবেন না। সত্যই ধর্ম্ম। ইহা বৈ এ সংসারের ভাগ্যফল মুক্তি দিবার আর কেহই নাই। সকলেই ভাগ্যফল ভোগ করিয়া কেহ শান্তি পায়, কেহ

অশান্তিতে থাকে, ইহাই মরভূমের কালের চারণ। অতএব আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির হইবার চেষ্টা করুন। মনেতে বিচার করিয়া দেখিবেন ধৈর্য্য ছাড়া আর কিছুই আপন নাই। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৬৭নং)।

৩য় খণ্ড—২৩, ৭৫, ১২৭।

পতিব্রতা ধর্ম্ম

১। "চিন্তায়, কার্য্যে, শ্বাসপ্রশ্বাসে স্থিরভাব অবলম্বন করিয়া পতিব্রতা বা ভগবন্নিষ্ঠ হইলে শুচি হয়।" (বেদবানী, ১ম খণ্ড, ১৫নং)।

২। "পতিব্রতা ধর্ম্ম—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যোপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তাণাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

এই যে ভাব ইহা ছাড়া আর কিছুই চায় না, জানে না, অন্য কিছুর দরকার নাই। মহা ঐশ্বর্য্য প্রলোভনের আবাহনকেও তুচ্ছ করে। তাহাকেই পতিব্রতা ধর্ম্ম বলে। গুরু ধ্যানং তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ইত্যাদি। গুরু ব্রহ্মা গুরুঃ বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব গুরুগতিঃ, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ইত্যাদিতে পতিব্রতা জাগাইয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ অদ্বৈত ভাব হৃদয়ে রাখা।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৫৭নং)।

৩। "ভবিতব্য উদয়ে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। পতিব্রতা ধর্ম্ম পরমানন্দময় নিত্যধামে স্থিতি করে। অভাব হইতে স্বভাবে

পরিণত করে। সুখ এবং দুঃখ এইগুলি ইন্দ্রিয় মাত্রাস্পর্শ জ্ঞানমাত্র, চক্রবৎ পরিক্রমশালী। পতিসেবা করিতে করিতে সতী হইয়া সত্ত্বত্ব লাভ করে। ঐশ্বর্য্যাদি সমস্ত বৈভব ছাড়াইয়া মাধুর্য্যরসে আপ্লুত করে। (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৮৩নং)।

১ম খণ্ড—১৪, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৬০, ১১৮, ১৩৫, ১৫২, ১৫৫, ২৬০ ২৬২, ২৭১, ২৭৩, ৩১৪, ৩২৯, ৩৩১, ৩৫৯, ৩৭১, ৩৭৬।

২য় খণ্ড—৮২।

৩য় খণ্ড—৪৩, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৭৪, ৭৭, ৯৬, ১০৯, ১৩১, ১৬৪, ১৭৯।

অকর্ত্তা বুদ্ধিই নিত্য মুক্তি লাভের উপায়

১। "কৃষ্ণের পুত্রাদি যদুবংশকে তাহাদের প্রকৃতির ভোগের নিমিত্ত নিষেধ বিধান কৃষ্ণ হইতে হয় নাই। তাদের প্রবৃত্তির উৎসুকের কর্ম্ম সর্ব্বথাই করিয়াছিল। যথাসময়ে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ যদুবংশীয়গণ নিশ্চয় কৃষ্ণই কর্ত্তা জানিত, এইজন্য তাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল না। ইহাই সাধন, আত্মাই দেহের কর্ত্তা, প্রারব্ধ ভোগই দেহের কর্ম্ম, এই জ্ঞানে অভিমানী হইয়া অতি দুরাচারীও নিত্য মুক্তি লাভ করিতে পারে। কর্ত্তৃত্বভাবে অহংবুদ্ধি দ্বারা নিজ ক্ষমতা চারণ দ্বারা যে সমস্ত সৎ অসৎ কর্ম্ম সমাধা করে, তাহার দ্বারা কর্ত্ত্বাভিমানী হইয়া কর্ম্মপাশে বন্দী হয়, কর্ম্মমুক্ত হয় না। অতএব এটি করিব, ওটি করিব না, করিয়া যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহা সফল হয় না। প্রারব্ধে যে আছে তাহার ভোগ সেই ইন্দ্রিয়জনকে দিয়া, লক্ষ্য সহিষ্ণুতার দিকে রাখিয়া গুরুর উপর

ন্যাস্ত করিয়া নিয়ত প্রাণের নিকট থাকিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। যখন যে ভোগের বেগ সহ্য না হয় তাহা করিলেও দোষ থাকে না।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৫২ নং)।

২। "সংসার (সত্য উদ্ধার)। সত্যসঙ্গ করিতে করিতে সংসার হইয়া যায়, আর বৃথা আশা প্রতিযোগ থাকে না। কর্ত্তাভিমানিত্ব রসে মুগ্ধ হইয়া ইদং মিদং চিন্তায় রত হয়। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানকেই ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ভগবৎ শক্তির স্মৃতি লোপ করিয়া দেয়। প্রতিক্ষণেই কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন থাকে না দেখিয়াও ভ্রান্তি হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করে না। কেবল ভ্রান্ত বস্তুর স্মরণ ও তল্লোভে বিমুগ্ধ হইয়া তারই চেষ্টা করে, কিছুতেই স্বভাব (স্বধর্ম্ম) কে ধরিতে কি তাকে আশ্রয় নিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই মায়ার মহা উৎকট মোহশক্তি।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৬৭ নং)

১ম খণ্ড—৫৫, ৬২, ৬৭, ৭২, ৮৮, ৯৬, ৯৮, ১৩১, ১৩৭, ১৪১, ১৪৮, ১৯৬, ৩০৪, ৩১৫, ৩১৯, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৫৮।

২য় খণ্ড—১৮৯, ২১৮।

৩। "সংসারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আপনার সংসার চালাইবার কর্ত্তা ভগবান। তিনিই আপনার সকল অভাব দূর করিয়া আপনার তৃপ্তি করিবেন। বিশেষতঃ আপনার প্রারব্ধ বিষয়ে কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

ভগবান আপনার মঙ্গলই করিবেন, যেহেতু তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিবেন।... ছেলেদের চিন্তাও আপনার করবার কিছুই নাই, কারণ ছেলেদের তো এক একটা ভাগ্য আছে। তাহাদের সমস্ত শক্তিই ভগবৎ কৃপায়

পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহাদের জন্যও কোন চিন্তা করিবেন না। ভগবানই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং করিবেন, আপনী তাহাদের কিছুই করিবার শক্তি [রাখেন না]। অতএব ঐ সকল অনিত্য অমূলক চিন্তা না করিয়া আপনি যথাশক্তি স্থির ও ধৈর্য্য সর্ব্বতোভাবে করিতে চেষ্টা করিবেন, অন্য কোন চিন্তা করিবেন না। সেই সকল চিন্তা ভগবান করিতেছেন।...এই সংসার ভ্রান্তমূলক, উদয় অস্ত বিভাব মাত্র। এইজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।" (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১১০)

৩য় খণ্ড—১৬, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৮৬, ১০২, ১৩৩, ১৩৬।

ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতার দ্বারা অভিমানের সত্ত্বাকে মার্জ্জনা করিতে হয়। জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না—কেবল ধৈর্য্য সম্পদের আয় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।

১। "প্রারব্ধ ভোগের জন্য কোনরূপে চঞ্চল কি ভয় করিতে নাই। ভাগ্যে যাহা যাহা ভালমন্দের যোগ হয় তাহা ভোগ করিতে করিতে নিশ্চয় ভক্তি অবশিষ্ট ভোগমুক্ত করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে বর্দ্ধন করিয়া পরম শান্তি অবিচ্ছেদ রসের তরঙ্গায়িত করিয়া লয়। অতএব সর্ব্বদা যখন যেমনই অবস্থার উদয় হউক না কেন সহিষ্ণুতার দ্বারা সর্ব্বদা সহ্য করিয়া লইবেন। সর্ব্বদাই ভগবৎ সেবার জন্য দৃঢ় আলিঙ্গন শক্তির বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবেন।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৫ নং)।

২। "নলরাজা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবে। তাঁহারা কতই না সহ্য করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মাগণ সহিষ্ণুতা দ্বারা সকল বিপদ ভোগ করিয়া পরিশেষে পুনরায় সম্পদ

ভোগ করিয়াছেন। গত বিষয় চিন্তা করিতে নাই। ধর্ম্মের পর আর কিছুই সম্পদ নাই। স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি ধন জন সকলি দুঃখের আকর। ইহাদের ভাবিতে গেলে সুখ কিছুই নাই, ভ্রান্তি বশতঃ সুখবোধ হয়। তাহাও ক্ষণস্থায়ী দুঃখই বেশী। অনিত্যকর বিষয় জন্য দুঃখ করা সকলি ভুল। কোন চিন্তা করিবেন না। কেবল গুরুর উপর সমস্তভার দিয়া খাঁটি হইয়া স্থিরভাবে গুরুবাক্য পালনে যত্নশীল হইবে।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৭৮নং)।

৩। "অদৃষ্টচক্রগত ভোগ জীবেরই স্বভাব সিদ্ধ। এই ভোগ দ্বারা দণ্ড হইয়া থাকে। ইহার জন্য দুর্ব্বল হৃদয়ে প্রার্থনার প্রয়োজনেই ভগবৎ ভক্তির পদচ্যুত হইয়া যায়। মায়ামৃগে জড়িত সীতা রাবণের কবলে আটক হইয়া রাবণের হিত উপদেশ দ্বারা তুষ্টি সাধনে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্বভাবজাত রজঃ প্রকৃতি তাহার তত্ত্ব বুঝিয়াছিল না বলিয়াই অধৈর্য্যদ্বারা সীতার ধর্ম্মচ্যুতিতে চেষ্টিত ছিল। তৎপর আর সীতা তাহাকে কোন উপদেশ না দিয়া ধৈর্য্য নিয়াই প্রারব্ধ (অদৃষ্ট ভোগদানে কৃত সঙ্কল্প হইয়া রাবণের সমস্ত দৌরাত্মই অকাতরে বহন করিয়াছিল। ভগবান শক্তিতে সেই সকল আবরণ মুক্ত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল। অতএব ধৈর্য্যই পরম ধর্ম্ম। অদৃষ্ট ভোগ কল্পিত কল্পক্ষয়েই মুক্ত হইয়া যাইবে। অতএব অদৃষ্ট ভোগই কর্ম্ম, প্রার্থনার কিছুই নাই।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৬৮ নং)

৪। "সকল বেগই ধৈর্য্যদ্বারা সম্বরণ করিতে হয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসায় কেবল বন্ধনই বাড়ে।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৭৫ নং)।

১ম খণ্ড—৫, ২৪, ৫০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৯৭, ১০৮, ১৪৭, ১৪৮,

১৫৯, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২২১, ২২৫, ২৩৪, ২৪৪, ২৫৪, ২৬৭, ২৭৪, ২৮০, ২৮৫, ৩১১, ৩৫০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৭, ৩৭৯।

সহ্য করিতে করিতে আরোগ্য হইয়া থাকে—২১৪, ২১৯।

৫। "যেখানে পথহারা হয় সেখানে ধৈর্য্যই ধর্ম্ম জানিবেন।··· তাহা হইলেই পথ বিপথ কি, নির্ণয় হইবে। অহংকর্ত্তা হইয়া পথ ঠিক পাইতে পারে না। যদি পাইত তবে কেন সীমাবদ্ধ [অবস্থা] জীবের ঘটে ?" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ২০৮নং)।

২য় খণ্ড—১১১, ২১৭।

৭। "অদৃষ্ট ফলের দরুণ হর্ষ বিষাদে না জড়াইয়া এই জড়তা মুক্তের জন্য সর্ব্বদা ধৈর্য্য ধরিয়া যাইতে হয়। এজগতে যাহা কিছু ঘটে সকল ভাগ্যেই হইয়া থাকে। তাহার জন্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে নাই। সর্ব্বদাই নাম করিবেন। চিন্তা ভাবনা করিয়া কিছুইতো করিতে পারেন না।···ভগবানই চালানের কর্ত্তা, জীবের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই।" (বেদবাণী ৩য় খণ্ড, ১০২ নং)

৮। "আপনি বাজে চিন্তার আবর্ত্তন হইতে ধৈর্য্য ধরিয়া সত্যনারায়ণের নাম সর্ব্বদা করিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে স্থির চিন্তা আসিয়া আপনাকে পরম শান্তি দিবেন। ভগবান একমাত্র ধৈর্য্য হইতেই প্রকাশ হন। ধৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই ভগবান, দ্বন্দ্বে স্থির থাকাই আনন্দ। অধৈর্য্য হইলে লাভ দ্বারা যে সকল সুখ পাওয়া যায় তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র, উদয় এবং অস্তশীল বলিয়া জানিবেন। প্রারব্ধ (ভাগ্যই) সেই সমস্ত বিষয় ভেদজ্ঞানের আবরণে টানিয়া নিয়া যায়, এতএব সর্ব্বদা প্রারব্ধ বেগ সহিষ্ণুতার দ্বারা পবিত্র করিয়া পবিত্র হইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার মনের, বুদ্ধির

শরীরের বেগ সহ্য করিতে করিতে মন, বুদ্ধি, শরীর ভেদ (দ্বৈত) ভাবের তরঙ্গ হইতে মুক্তি হইয়া পরিমাণ [?] শক্তি জাগিয়া পরিবে সংশয় নাই। এই সংসার মায়ামুগ্ধ হওয়ায় কিংকর্ত্তব্যহারা হইয়া ভ্রান্তি বিষয় অমূলক চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, হিতাহিত জ্ঞান বৰ্জ্জিত হইয়া কাৰ্য্য কলাপে নানান উপসর্গ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এই ধৈর্য্য হইতে অভ্যাস করা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।" (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১০৭ নং)

৩য় খণ্ড—২০, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১৯, ১২৬, ১৩৪, ১৫৯, ১৮৮। দেখবে শুনবে কইবে না—অভ্যাস-যোগ—১৭৮।

সকলভার দিয়া প্রারব্ধ চৰ্য্যায় ব্রতী থাকিলে, গুরুই সকল বিষম সম্পদ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।

(৬ নং পত্র, ১ম খণ্ড)

১। "সর্ব্বদা স্বকৃত কর্ম্মানুসরণে যত্নবান থাকিয়া নিত্য তৃপ্তিকর ভগবৎ সেবার শক্তি আহরণের প্রতিক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ সকল ভার ভগবানে দিয়া ভাগ্যানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রের আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া ধীর ধৈর্য্যশক্তির দ্বারা পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়। পথের সহায় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান নির্লিপ্ত শক্তি বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহার সাহায্যে এ ভব সংসারের আবরণ কাটাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৬ নং)

২। "প্রারব্ধবশে আটক পড়িয়া যাহা করিতে বাধ্য হইবে তাহাতেই মধ্যস্থ থাকিতে চেষ্টা রাখিয়া গুরুর আদেশ কর্ম্ম পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবেন। এই প্রকার করিতে করিতে ভগবানের

শক্তি পূর্ণরূপে অধিষ্ঠান হইয়া নিত্যসেবার অধিকারীভাবে দেহবৈগুণ্য পরিহারে সমর্থ হইতে পারিবেন। ভগবান সিদ্ধ অসিদ্ধ, ভাল-মন্দ বিচারের অতীত, অতএব সর্ব্বদা গুরুপদ আশ্রয়ে সাধ্যানুসারে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিত্যব্রতী থাকিবেন। অচিরেই ভগবান উদ্ধার পদ খোলাসা করিয়া লইবেন।" বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৪২ নং)

৩। "মায়াময় সংসারের তাড়না যত সহিষ্ণুতার দ্বারা সহ্য করিতে পারে ততই মঙ্গলময় নিত্য পথ ভগবৎ কৃপার স্থান অধিকারী হইতে পারে। সংসারের যাহা কিছু করা যায় সকলি অনিত্য, তাহার পরিহার করাই ভগবৎ ভজন। চিন্তা ভাবনা না করিয়া সকল বিষয়েই স্থৈর্য্য দ্বারা ভোগ দিয়া যাইবেন। সকল ভার গুরুতে অর্পণ করিয়া যথাসাধ্য তাহার পথ ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবেন।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৮৩ নং)।

১ম খণ্ড—৭, ৪৪, ৬৯, ৭১, ৭৬, ৭৯, ৯২, ৯৬, ৯৯, ১০৩, ১১৬, ১১৯, ১২২, ১৫৯, ১৬২, ১৮৫, ১৮৯, ২০৫।

৪। "সকল ভার ভগবানকে দিয়া পরিপূর্ণ শান্তিতে এ জগতের উপস্থিত কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিতে থাক, ভগবান সকল বিষয়ের অভাব হরণ করিয়া পরম শান্তিতে…রাখিবেন, সর্ব্বদাই মঙ্গল করিবেন।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১৯৯)।

তৃতীয় খণ্ড—১৮, ২০, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৭২, ৭৬, ৯৮, ১১২, ১২২, ১৪১, ১৪৭।

সত্যং পরম ধীমহি—

১। "সত্যধর্ম্ম পরিচর্য্যাই পরমানন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।"
(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৩নং)।

২। "গুরুর কৃপাই সত্য। সর্ব্বদা সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্য অনুশীলনে থাকিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম। মায়ের পুত্র হইয়া থাকিতে অভিমানী হইবে। মাতাই সকল অভাব দূর করিয়া সংসারে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন, সংশয় নাই। (বলং বলং ধর্ম্ম বলং) পূর্ণানন্দ-ময়ী মাতার কটাক্ষ পাইতে তাহারই অনুগত থাকিতে হয়।"
(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৭৬ নং)।

১ম খণ্ড – ৬২, ১৫৭, ১৫৮, ১৮০, ১৯৪, ১৯৯, ২৫৫, ২৫৬, ৩৫৮।

৩। "সত্যং পরম ধীমহি, সত্যই পরম পদার্থ জানিবেন।
(বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৪৪ নং)

৪। "সত্যনারায়ণকে ভুলিবেন না। তাঁহার কৃপায় এই মরভূম হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগ্যানুসারে জীব দেহ, গেহ, সমাজ পাইয়া থাকে। কর্ম্মেরই অধিকার, জীবের ফলের অধিকার নাই। ফলদাতা সত্য জানিবেন।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৪৯ নং)

৬। "পূর্ব্বপুরুষগণ, হরিশ্চন্দ্র, নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি তাঁদের চরিত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে সত্য ছাড়া আপন কিছুই নাই। অতএব সত্যই ধর্ম্ম, আশ্রয়ই কর্ম্ম, ভাগ্যবশেই জীবের গতাগতি হইয়া থাকে। মন হইতে ভাগ্যফল প্রসব হইয়া থাকে, অতএব মনের সমস্ত বেগ সহ্য করিতে করিতে ভাগ্যফল ভোগদান করিয়া অপরিবর্ত্তনশীল আনন্দধাম প্রতিষ্ঠার অধিকার হইয়া থাকে। সকল অবস্থা(য়) ই

সত্যকে স্নেহ যত্ন করিবেন, সত্য হইতেই শান্তি পাইবেন। ভাগ্যফলে জীবগণের ভালমন্দ বিভাগ হইয়া থাকে।"

(বেদবাণী ২য় খণ্ড, ১৬৬ নং)

২য় খণ্ড—৩০, ৩৩, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৭-৬১, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৮১, ৮২, ৯৪, ৯৬, ১০৫, ১১০, ১৪১, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬০, ১৭৯, ১৯৮, ২২০, ২২২।

৭। "সত্য অপেক্ষা জগতে কি আছে ? সত্য অনুশীলনে পরমানন্দময় নিত্য সেবার শক্তি পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়া থাকে, অহৈতুকী প্রেমে ভাসাইয়া ফেলে। রসাল আনন্দ সত্যমন্দিরে অক্ষুন্ন থাকে। (সত্যং পরম ধীমহি)···(যুগল ভজন করে যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা), মহাজন বাক্য।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।"

(বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৪৫ নং)।

৮। "আপনী সর্ব্বতোভাবে সত্যের অধীন থাকিতে সতত চেষ্টা (অভ্যাস) করুন। তাঁহান আশ্রিত (দাসের) ধ্বংস হয় না। লোকের সকল অবস্থায়ই ভাগ্যের দ্বারা কালচক্রে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির বিকার যে গুণগণের তারতম্য সংঘটন ভোগ করিয়া থাকে। তাহাতে বিচলিত না হইয়া কর্ত্তাভিমান ভুলিয়া সত্যের দাস হইতে চেষ্টা করাকেই নাম, মন্ত্র, জপ, পূজা, অনুষ্ঠান করা বলে। অতএব সত্যের নামে পরিয়া থাকুন, তিনিই সকল দুস্তর সাগর হইতে পার করিয়া শান্তির কোলে স্থাপন করিবেন। যাহার যে পাওনা দেনা উভয় কর্ষণ থাকিলে নিত্যস্বরূপ সত্যরস উপভোগ করিতে পারে না। এই জন্যই নাম নিয়া পরিয়া থাকার ব্যবস্থা জ্ঞানীগণ করিয়াছেন।···

সত্যের নামে পরিয়া থাকুন তাঁহার কৃপার ভিখারী হইয়া থাকুন, তিনি সকল বিষয়ই মীমাংসা করিবেন—(বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৪৭ নং)

৩য় খণ্ড—৭, ২৫, ৭৮, ১৫৮, ১৭৩, ১৭৬, ১৮৭।

জীব কেন বাসনাজালে আবদ্ধ হয়—জীবের দুঃখের কারণ – অনিত্য পদার্থের জন্য কেন মুগ্ধ হয়—বন্ধন মুক্তির উপায়। ভুয় ভুয় জন্ম মৃত্যু কেন হয়।

১। "সংসার মায়ামুগ্ধ ভ্রান্তিমূলক, ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ এই সকলই গুনাবতারের প্রবঞ্চনা মাত্র। ক্ষণকাল অস্থায়ী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া জীব নিত্যসুখময় নিত্যানন্দ চৈতন্যহারা হইয়া সংসার গারদে ঘুরিয়া বেড়ায়। বঞ্চনার প্রলোভনে পড়িয়া সৎ অসৎ বিচারে অক্ষম হইয়া যাহা তাহা করিয়া মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে চিরকাল ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ভাষাকেই পণ্ডিতগণ নরক সন্তার বলিয়া থাকেন। এই নরক মুক্তির জন্য গুরু আশ্রিত হইয়া তদাশ্রমে চিরপোষিত হয়। এই গুরু কৃপায় সর্ব্বশক্তি ভক্তির আবরণে অনায়াসে শান্তির বাসভূমি লাভ করিয়া নিত্য স্বরূপ লাভ করিয়া নিত্য সেবার দাস হয়। (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৭ নং)।

১ম খণ্ড—১৭, ৩০, ৪৬, ১১৩, ১১৪, ১৩২, ১৬৯, ১৯২, ২৯১, ২৯২, ৩০৭, ৩২৪, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩।

২। "যাহা সহজেই ত্যাগ করা যায় কিংবা যাহা উদয় হইয়াই অস্তমিত হয় সেগুলিকে ছাড়িয়া আত্মস্থ বা স্থিরপ্রজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। অভাব আপনা হইতেই দূরে সরিয়া যায়; তাহাকে দূর করিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না। ধর্ম্মবৃক্ষের গায় অনেক পরগাছা জন্মে। আমরা ধর্ম্মের নামে নানাবিধ বৃথাচরণ করিয়া থাকি যাহার দ্বারা

আমাদের ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি না হইয়া বরং অশেষ দুর্গতিই হইয়া থাকে। গুরুবাক্য সত্য, যাহা সত্য তাহাই গুরুর উপদেশ মানিয়া চলিলে অপসিদ্ধান্ত ও মিথ্যা জিনিষগুলি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় এবং শুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম প্রদীপ্ত ভাস্করের মত প্রকাশিত হয়। গুরু দিব্য চক্ষু দান করিলে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক হইয়া থাকে। 'চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ১১ নং)।

২য় খণ্ড—৩, ৫, ১৪, ১৮, ৪২, ৬০, ৭৪, ১১৯, ১৬৩, ১৬৯, ২১৯।

প্রথম জন্মগ্রহণ—১৪৪, ১৪৮, ১৮১,

৩য় খণ্ড—৩, ১৯, ৮৩, ৯২, ১৬২, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০,

সংসার

১। "সংসার শব্দই ভ্রান্তিজনক বাক্য, সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে জড়সড়। শান্তি খুজিয়া ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া দুস্কর। অগ্রে বিষ পরে অমৃত ইহাই সাত্বিক সুখ, নচেৎ অগ্রে সুখ পরে দুঃখ হই। রাজসিক সুখ। কাজেই নিত্য সুখ লাভ করিতে হইলে অগ্রে সুখের স্পৃহা ছাড়িয়া দিতে হয়। সত্যকে ধরিয়া থাকিলে পরিণামে আনন্দ ফল ফুল রসে মুগ্ধা হইতে পারে। (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৫৮ নং)।

১ম খণ্ড—১৮, ৯২।

২। "কালচক্রে যে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রবাহ হইতেছে, তাহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া অখণ্ড, অব্যয় সত্যকে উদ্ধার করিয়া ত্রিকুল পবিত্র (করিতে হয়), এই অবস্থাকেই সংসার বলে, অর্থাৎ সত্যকে

সার করা। সত্যনারায়ণ অর্থাৎ সত্যের আশ্রয়। সত্যং পরং ধীমহি জানিবেন।

লোক সকল স্বঃ স্বঃ ভাগ্যানুসারেই দেহাদি লাভ করিয়া ভোগ আয়তনী শক্তির দ্বারা বিবৃত হইয়া পরে, তাহার কর্ত্তাভিমানে মনের দ্বারা শান্তি অশান্তি ভোগের দ্বারা বন্ধন হইয়া থাকে। এই জন্যই ভোগ মুক্তির জন্যই সত্যের সেবক হইতে হয়।"

(বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৮৭নং)।

ভগবান যাহা করেন তাহাতে অমঙ্গল হয় না। যখন যাহার ভাগ্যে যাহা হয় তাহা মঙ্গলই হইয়া থাকে।

১। "ভগবান মঙ্গলময়। সময় চক্রে নানান উপসর্গ জুটিয়া থাকে। আবার সময়ে সকলি চলিয়া যায়। এইজন্য কালচক্রের আগম নিগমকে তিতিক্ষা করিতে হয়।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২১২নং)।

১ম খণ্ড—১৬২, ভগবান মঙ্গলময় তিনি সকলই মঙ্গল করেন—১৭০, ২০৯। ভগবানের অধিনস্থ লোকের কোন অভাব হয় না—২২৪।

২। "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং"। অদৃষ্টকে বাদ দিয়া চলিতে নাই। যাহা যাহা ভোগের প্রাপ্ত হইবে তাহাতেই সন্তোষ থাকিতে হয়। ভগবান যাহা বিধান করেন মঙ্গলের কারণ, যেহেতু ভগবান মঙ্গলময়। তাঁহান সঙ্গে তাঁহান সেবাই চরম বলিয়া ধারণা করিলে কোন অভাব ঘটে না। (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৮০ নং)।

২য় খণ্ড—১৫৩, ১৮৩, ১৮৭, ২০২, ২০৯।

৩য় খণ্ড—৩৪, ৮১, ৮৪, ১২০, ১৫১।

কাহারো কোন দোষ নাই, সকলই প্রারব্ধ মাত্র

১। ভগবৎ সেবা সর্ব্বদা করিতে করিতে নিত্য শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সকল ইচ্ছার বেগ সহ্য করিতে করিতে সকল অভাব যাইয়া পূর্ণ স্বভাবে পরিণত হয়। পরের দোষ দেখিতে নাই, আপন দোষগুলির অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদা দোষগুলিকে পবিত্র করিতে হয়। পরের স্বার্থজ্ঞান মলিনের কারণ হইয়া থাকে। যাহা কিছু আবির্ভূত হয় সকলি প্রারব্ধ বৃত্তি মাত্র, কাহারো কোন দোষ নাই। যাহার নিকট যে যে ঋণ পরিশোধ করার যে ভাবে ব্যবস্থা প্রাক্তনে উপস্থিত করে সেই সেই ভাবেই তাহা গ্রহণ হইয়া থাকে।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৪৩নং)

৩। "সংসারে মান অভিমান ছাড়িয়া সকলের সহিত বন্ধুত্ব, আপ্যায়তা সরলতাভাব রক্ষা করাই পরম হিতকারী। সহিষ্ণুতা শক্তির দ্বারা সকলেরই সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া নিরপেক্ষ, নির্জ্জন, চিন্তা ভাবনা রহিত হইয়া থাকিতে থাকিতে জগতের ঋণ মুক্ত হইয়া পরম শান্তিতে চিরকাল থাকিতে পারা যায়। কাহারো দোষ যদি কোন-রূপে বুদ্ধির গোচর হয় তবে সেই দোষকে নিজের ভাগ্যলব্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া লইতে হয়। যেমন আপন দন্তের দ্বারা আপন জিভ কাটিলে কষ্ট হয়, অথচ কাহারো দোষ দেওয়া যায় না সেইরূপে এই সকল উপস্থিত মিত্র অমিত্র দোষাদি বহন করিয়া লইয়া পরম শান্তি পাইয়া থাকে।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২১৩নং)।

১ম খণ্ড—১০৯, ১১০, ১৭১, ১৯৫, ২০৪, ২৩২, ২৩৭, ২৩৯, ২৪৬, ২৫০, ২৬৩, পরনিন্দা, পরদ্রোহী দানবী স্বভাব ২৮২।

২য় খণ্ড ২০, ৭৭, ১৫৫, ১৯৭, ২১৫।

৪। না লইবে কারো দোষ, না করিবে কারে রোষ।
আপনী হইবে সাবধান,,

কাহারো ভাবে অভাবে আপনী না থাকিয়া আপনার প্রাক্তনীয় সকল পরিষ্কার করিয়া যাইতে থাকুন। ভগবান মঙ্গলই করিবেন। ভাল মন্দের জীবের বিচার করিবার শক্তি রাখেন নাই।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মানি [ইত্যাদি] গীতার ভাষ্য জানিবেন। যখন জানিবেন যে আমি কর্ত্তা নই তখনই পক্ষ বিপক্ষ সমান বুঝিবেন, যে পর্যন্ত এই ভাবের উদয় না হইবে সে পর্যন্ত কাহারো কোন দোষ-গুণের অধীন না হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য উপস্থিত কর্ম যাহা অপনার গোচর প্রারব্ধে করিয়া দেন অনন্য ভাবে তাহাই করিতে থাকুন। ভগবান আপনার সকল অভাব দুর করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই। যে যখন কর্ত্তার পরিচয় পাইবেন সে তখনই চিত্তে সবল সরল শান্তিময় প্রকাশ পাইবেন। স্বধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন, সংশয় মাত্র নাই। (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৬৮ নং)।

৩য় খণ্ড ১০৬, ১৫৬, ১৭৭। পরনিন্দা পরের দেহে ভগবানকে দোষারোপ ৫১ নং।

সংসার উদ্ধারই ভগবানের সেবা

১। "সংসারের বিবরে প্রবেশ করিলে সর্বদাই ধৈর্যবান ধারণ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রে কেবল অহংকারাদি বিবর্ত্তন রসে বর্দ্ধন হইয়া পড়ে। নানান উপদ্রব সহ্য করিতে চেষ্টা করাই ধর্ম। জপ তপস্যাদি কিছুই করিতে হয় না। স্ত্রী পুত্রাদি ভরণ পোষণে যত্নশীল হইয়া অনাসক্তভাবে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্ত্রী পুত্রাদির মধ্যেও ভগবান সম্যকরূপে বিরাজমান, কেবল বর্ত্তমানে মর্কট বৈরাগ্য

লালসায় পন্থহারা হইয়া বিপথ গতিতে সুখ দুঃখকর সমুদ্রপারবর্ত্তী রাবণের পুরী অশোক বনে বন্দী হয়। কোন কিছুরই প্রতি দৃকপাত না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণে তৃপ্তিদানে তৃপ্তিলাভে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৩৪ নং)।

১ম খণ্ড ১০১, ১১২, ১৬০। ৩য় খণ্ড ৭০।

স্থির হইবার চেষ্টা করিতে করিতে নিত্য চরিত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া আত্মার বিদিত হইতে পারে।

১। "স্থির হইবার চেষ্টা করিতে সকল অবস্থারই অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে নিত্য চরিত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া আত্মার বিদিত হইতে পারে।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড, ২৩নং)।

২। "সর্ব্বদা নাম করিবে, নামেই সকল অভাব দূর করে, মনকে স্থির করিয়া দেয়। (বেদবাণী ১ম খণ্ড, ৮৫ নং)।

১ম খণ্ড—৪২, ৬৬, ৬৮, ১০০, ২১৫, ৭২, ৯৪।

৩য় খণ্ড—ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মেতে বিচরণ করা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় স্থির হইয়া থাকা। ১৩২।

দেহ ও দেহি

১। "যে পর্যন্ত দেহ থাকে সেই পর্য্যন্ত কষ্ট নিবারণের জন্যই চেষ্টা করা জীবের ধর্ম। প্রত্যেক শরীরের মধ্যে ভগবান সুখময় বিরাজ করেন, ভ্রান্তিবশতঃই কর্ত্তৃত্বাভিমানী সূত্রে নানা রকম দেখিতে পায়। অতএব যাহাতে অন্তকাল পর্য্যন্ত কষ্ট না পায় তাহারই চেষ্টা যথাসাধ্য করিতে হয়।" বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৫৯ নং)।

২। "শরীর সুস্থ না থাকিলে চিন্তা শক্তির অভাব হয়। মনের স্থির করিতেও অশক্ত ঘটে। শক্তির অভাব হয়। নিয়ম লঙ্ঘনই পাপ, সর্ব্বদা ভগবানের নিকট থাকাই শান্তি।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৪৫ নং)।

১ম খণ্ড—২৮, ১৭৭, ২৭৭, ২৯৮, ৩৭১। ২য় খণ্ড—১৭, ৭৩, ১৭৪।

৩। "লোক সকল স্ব স্ব প্রকৃতির তারতম্য দ্বারা দেহ, গেহ, জাতি, মান, বিদ্যাবুদ্ধি, দেশ ঐশ্বর্য লাভ করিয়া এই পূর্ব্বপার ব্যাস কাশীতে পরিয়া সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দেহী সীমাবদ্ধ নয়। তিনি সকল প্রকৃতির দেহে থাকিয়াও দেহেতে মিশে না, আলগ্ থাকেন। অহংকারের দ্বারায় দেহ অভিমানী হইয়া দেহেরই তারতম্য অনুভূতি করিয়া, শোক, তাপ, দুঃখ, কষ্ট অনুভূতি করিয়া সত্যরূপ যে দেহী, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অদাহ্যাদি বিশুদ্ধ প্রকৃতি জানুতে পারে না। দেহীর সাহায্য ভিন্ন যে একচুলও ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়া পায় না তাহা জানিতে পারে না বলিয়া সম্বন্ধ দেহেরই আধিপত্য স্বীকার করিয়া কর্ত্তা ভোগ করেন।" (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৬৩ নং)।

৩য় খণ্ড—৪, ৫৪, ৭৪, ৭৫, ৯১, ৯৫, ১২৭।

ভগবান সর্ব্বব্যাপ্ত

১ম খণ্ড—৪৭, ৯০, ১০৪, ১৪৯, ১৫৫, ১৬২, ১৬৮।

২য় খণ্ড—৪৩, ৪৭, ১৫১। ৩য় খণ্ড—৮১।

মন ও প্রাণ

১। মনকে ঠিক করিতে হইলে এক অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ চেষ্টায় হয়। ইহা অপেক্ষা গুরুর ভরসায় নিজের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য

ছাড়িয়া থাকিতে হয়। এই দুই সম্বন্ধই ফল দেয়, গুরু সর্ব্বদা রক্ষা করেন সন্দেহ নাই। (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৮০ নং)।

২। "নাম সত্য, নাম এবং ভগবান অভেদ জানিবেন। ভগবানের সেবার অভাবেই মন এবং বুদ্ধির উপাধী হয়। অতএব সর্ব্বদা নাম করিবেন। মনের লয় আপনীই হইবে।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৭২ নং)।

১ম খণ্ড—৬৪, ৬৮, ৮৫, ৮৯, ৯২, ৩০৯, ৩৪০, ৩৫৭, ৩৬৪, ২১৫।

৩। "মনঃ করোতি পাপানি, মনোলিপ্যতে পাতকৈঃ। মনের যে সকল জল্পনাদি উপসর্গ উৎপন্ন যখনই হইবে, তখনই ধৈর্য্যের সহচর হইয়া মনোবৃত্তি খর্ব্ব করিবে। ইহাই সকল সাধন এবং সত্যের সেবা ও নাম করা জানিবেন। অভ্যাস হইতেই মন বিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন ঘুমাইলে মন থাকে না, দেহাদিও কিছুই থাকে না, তখন সত্য ত থাকে। তাহাকেই প্রাণ [?] বলে জানিবেন। ধৈর্য্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করার নামই সত্যব্রত জানিবেন। প্রকৃতির গুণের তারতম্য সকলই বিকৃতি লাভ করে। তাতে দ্বন্দ্ব মোহ উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ২১৭নং)

২য় খণ্ড—৭০, ১২০, ১৪৪, ১৬৬, ১৯০, ২০৫, ২১৩, ২১৯।
৩য় খণ্ড- মনের তৃপ্তি বন্ধন, প্রাণের তৃপ্তি নির্ব্বন্ধন জানিবেন—৯০, ৯৬, ১৮১, ১৮৫।

ধর্ম্ম

১। "সর্ব্ব অবস্থায়ই অচিন্ত্যরূপ প্রাণের স্মরণ নিয়া থাকিলে সর্ব্ব সঙ্কটকর সংসার হইতে মুক্তি পায়। প্রকৃতি গুণের বশবর্ত্তী হইলে গতাগতি ঘুচে না। অতএব সর্ব্ব রকম সাধন কর্ম্মে না লোভ রাখিয়া শুদ্ধ গুরুর বাক্য পালনে যত্নশীল হইতে চেষ্টা করিবে,

পরিশিষ্ট শান্তিই ভোগ হইবে। অন্য চিন্তা করিবে না, উপস্থিত বাসনার বেগ সহ্য করাই ধর্ম্ম। বাসনার অনুশীলন করিতে নাই, মাত্র গুরুর আদেশ পালনই করিবে।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৫৪ নং)।

১ম খণ্ড—অচিন্ত্য সত্ত্বার আশ্রয়ই পরম ধর্ম্ম ১৪০, ১৫০, ২৫৫, ২৫৬, ৩২৮।

৩য় খণ্ড– ৯২, ১২২, ১২৮, নিজ নিজ অধিকারের দাবী না করিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকাই ধর্ম্ম—১৭৫। সনাতন ধর্ম্ম হিন্দু চর্চ্চা কি ? ১৭৯।

ভগবান

৩। "চিন্তা করিবে না। ভগবান কালচক্রের তাড়না হইতে রক্ষা করিতে বর্ত্তমান আছেন। প্রাক্তনে সকলি করিয়া থাকে। বিপদ সম্পদ সকলি প্রাক্তনের কর্ম্ম, ভগবান ব্যতীত ইহার হাত হইতে ত্রাণের অন্য কাহারও শক্তি নাই। সময় ফিরিয়া পড়িলে সকলি সূর্য উদয়ের ভাবে বিঘ্ন কাটিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেয়।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২১০ নং)

১ম খণ্ড—১০৭, ১১১, ১২৭, ১৩১, ১৪০, ১৫০, ১৫৪, ১৪২, ২২৪, ২৩৫, ৩২১, ৩২৪, ৩৩১, ৩৬২, ৩৮১, ৩৩২, ৩৭৯, ৩৬০, ৩৭৮।

২। "(ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বদা) এই ভাগ্যযুক্ত হইতে সত্যের কোলে সাবিত্রীর ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র হইয়া থাকে। একেই সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যা বলে।

এই ত্রিসন্ধ্যাই ব্রাহ্মণ উপাধিলাভ সত্যব্রত সাধন সাধ্য প্রাপ্ত হয় জানিবেন। শান্তিপদ সত্যময়ের নিকটেই থাকে। ভগবান ঐশ্চর্যপূর্ণ। তিনিই সত্যময় অর্থাৎ অখণ্ডভাবে থাকেন ; তিনিই সাবিত্রী, অন্নপূর্ণা পূর্ণশসী উপাধি লোকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত।"

(বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৩৮নং)।

৩। "এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম সার জানিবেন। বেদবিধির আচরণে ভগবৎ প্রীতির বাধক হইয়া থাকে। স্বভাবের সহচরই ভগবানের মায়া হইয়া থাকে।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৬৭নং)।

২য় খণ্ড---১, ৩৫, ৫, ৭, ৩৯, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ১৪৫, ১৩২, ১৫১, ১৮৫।

৪। "ভগবানের কৃপার লক্ষ্যে সর্ব্বদা থাকুন। অন্ধকারে চলিতে হইলে একটা আলো নিয়া চলাই কর্ত্তব্য। (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৯৩নং)।

৩য় খণ্ড—১৮, ৮৫, ৩৯, ১২৮, ১২৪।

সেবা

১। সংসারোদ্ধারই ভগবানের সেবা, অন্যান্য ভাবের দ্বারাই সেবাকার্য্য সাধিত হয়। এই সেবায় বেদবিধি লাগে না, মনের তৃপ্তিজনক উপাচারে সম্পাদন হয়। এই প্রকার ঐকান্তিক ভাবে নির্ভরাদি স্নেহ উপচারে সংমার্জ্জন করিতে করিতে অকৃত্রিম ভাবের উদয় হয়। পরে শ্রদ্ধা, পরে ভক্তি, পরে বিশুদ্ধভক্তি, পরে প্রেমের উদয় হয়, তারপরে বিশুদ্ধ প্রেম হয়। তারপরে সেবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শকে অনুভব করে। সেবাচারীর কোন বিশেষ জ্ঞান থাকে না, স্বভাবের তরঙ্গ খেলিয়া প্রেমের লহর উল্লাস স্ফুটিয়া চলে, এই প্রেম তরঙ্গের অবধি নাই। ইহাই ভগবৎ ভক্ত, মুক্তি সর্ব্বদা তার সেবার সাহায্য করিয়া সেবা সহিষ্ণুতা সম্পাদন করে। সর্ব্বদা সেবা করিয়া চলিতে থাক, গুরু সকল শক্তি সঞ্চারে সদানন্দ প্রকাশ করিবেন চিন্তা নাই, উদ্ধার তিনিই করিবেন।"

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১০১ নং)।

২। "ভগবৎ ভক্তি গাছের ফল নয় যে তাহাকে কুড়াইয়া লইবে।

সর্ব্বদাই গুরুর বাক্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। মায়ার তরঙ্গ হইতে মুক্ত করিয়া স্বক্ষেত্রে স্থাপনা করিবে।"

(বেদবাণী প্রথম খণ্ড ৩২৭নং)।

৩। "ভগবানের কর্ম্ম করিতে কোন চেষ্টা করিবার দরকার হয় না। তাঁহাকে পাওয়াই দরকার এই ভাব হৃদয়ে জন্মিলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বেদবিধিতে পায় না। (বেদবাণী প্রথম খণ্ড ১৪২নং)।

১ম খণ্ড—১১২, ২৫৮, ৩০৯, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬১, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৮৭।

৪। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ।" নাম চিন্তামনি, নামের মধ্যেই সমস্ত আছে। সেবা শব্দটিই সর্ব্বদা নামের নিকট থাকা, নামের বাধক যাহা তাহার বেগ সহ্য করিতে অভ্যাস করা, একেই নাম করা বলে। এই প্রকার নামের যত্ন করিতে করিতে নামকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ৭৫নং)।

২য় খণ্ড—৮২। ৩য় খণ্ড---৯৩।

পুরুষকার

১। প্রারব্ধ ভোগের অন্ত ভিন্ন সংসারের কর্ম্ম ত্যাগ হইতে পারে না। ভবিতব্য না থাকিলে পুরুষকারের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। [যখন] সময় হইবে তখন সকলি মিলিবে।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ২৯৫নং)।

১ম খণ্ড---৬৩, ১০২।

২। "পুরুষকার দ্বারা যাহা যাহার শক্তি আছে সে তাহার উপরে কিছুই করিতে পারে না। শরণাগত জনেরা অসীম শক্তি পাইয়া থাকে, যেমন প্রহ্লাদ শরণাগত হইয়া অসুরের তাড়না হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ ভোগদ্বারা অসীম পদ অমরত্ব লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু দৈত্যেরা পুরুষকার অর্থাৎ নিজ চেষ্টা দ্বারা শরণাগতের কিছুই হানি করিতে পারিল না, নিজেরাই সেই শক্তিহীন হইয়া নানান ভাবে ক্ষয় হইয়া গেল। অতএব পুরুষকার কেবল বন্ধনেরই প্রলোভন আপাততঃ সুখ পরিণামে দুঃখ। (বেদবাণী ৩য় খণ্ড ১৫৩ নং)।

৩য় খণ্ড—১৫৪।

শুভ অশুভ কর্ম্মই কৃষ্ণ ভক্তির বাধক হয়।

১। "লৌকিক প্রাকার সংসারের বন্ধন বৃদ্ধি করে। গুরুভক্তিই সুদুর্লভ সকল বন্ধন ক্ষয় করে। অভাব স্বভাব ভাল মন্দ প্রভৃতি সংসারের বন্ধন। (শুভাশুভ কর্ম্ম যত কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম, এও জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥) এইটি মহাজনের বাক্য।"

বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৯৩নং।

১ম খণ্ড – ৩৭, ২৬০, ৩৬২ নং

শূন্যচিন্তা—

৯। "সংসারের তরঙ্গে লক্ষ্য রাখিয়াই জীব বদ্ধ হয় তাহাতেই লোকসান অনুভূতি হইয়া থাকে, ইহাতেই সুখ দুঃখকর শান্তি অশান্তির তরঙ্গ চলিয়া থাকে। অতএব ঐ দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শূণ্যভাবে অর্থাৎ আকাশের দিকে চিন্তাকে ধরিবাব জন্য চেষ্টা করিতে করিতে পরম শান্তির উদয় হয়। ভালমন্দ যাহা হয় সেই সকল অতিথির ন্যায় মনে ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে হয়।

বেদবাণী ১ম খণ্ড, ৩নং।

১ম খণ্ড—১৯, ৫৬,

২। "সংসার" তরঙ্গ নানান্। এই তরঙ্গ হইতে নির্ম্মল

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অতরঙ্গে থাকিলেই যে অবস্থা হইবে তাহাই কৈবল্যধাম জানিতে হয়। ইহাই "জ্ঞান", "শূন্য ভাবিত ভাবাত্মা পুণ্য পাপৈর্বিমুচ্যতে", এই শ্লোকটি সতত হৃদয়ে জাগরণ করাই ভগবানের কীর্ত্তন। আপন শরীরকে বিন্দু জোতির্ম্ময় কিরণ বিশিষ্ট ভাবনা করিয়া শূণ্যাতে মন অর্থাৎ কোন অবলম্বনে না রাখিয়া থাকার নামই প্রণব, সংসার তারন শক্তি, যাহাকে ব্রহ্মবীজ বলে। ইহারই উদয় উন্মুখ গায়ত্রী, ইহাই বেদমাতা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশ গুণাদি সাধ্য শক্তি। এই গায়ত্রীই শূণ্যভাবে থাকার অবস্থা, অতএব সতত এই গায়ত্রী জপ করিবেন।

বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ১৩৭নং।

২য় খণ্ড—১৩৪, ২০৬,

৩। "কোন বিষয়ে পুরুষের [?] অধীর হইতে নাই। জগতে এক পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় জগতে যাহা কিছু দেখা যায় এবং ব্যবহার করা যায় মমতা হেতু কর্ত্তৃত্ব অভিমান প্রাপ্ত হইয়া মোহিত হয়। ইহাতে পরমাত্মার শরণ থাকে না। অতএব দিবা নিশি এ সংসারে প্রারব্ধবশতঃ যাহা যাহা মন্দ হয় সকলের মধ্যেই আলগ্ যেমন আকাশ সকল বস্তুতেই মিশিয়া থাকে ......তস্য হেতু আকাশের কোন অভাব হয় না, তেমনী আলগ্ হইয়া থাকিতে থাকিতে পরমাত্মার স্থান দর্শন হয়, শান্তির আকরে পড়িয়া যায়, অভাব থাকে না।" বেদবাণী, ৩য় খণ্ড ৪২নং।

কোন প্রার্থনা করিতে নাই।

১। "জগতে কিছুই প্রয়োজন ঘটাইতে চেষ্টা করিতে নাই। কোন প্রার্থনা করিতে নাই। সকলি ভগবান প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর করিয়া রাখিতেছেন, এমতাবস্থায় প্রয়োজন যাহা

যাহার উপস্থিত হয় তিনিই তাহা করিয়া লন, কোন অভাব রাখেন না, এই ভগবানের স্বভাব। অতএব তাঁহার শরণে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকাই প্রয়োজন করিতে হয়। বেদবাণী ১ম খণ্ড, ১৪৯ নং।

৩। "প্রার্থনাই জগৎ বন্ধন করে, এই জন্যই পৃথ্বি উপাধি লোকে সৃজন করে। "ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্। মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলম গুরোঃ কৃপা ॥" তারাতারি পাকাইতে গেলে.........সমস্যা হয়। "ধৈরজই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, স্বধর্ম্মই মিলন করিতে পারে। পরধর্ম্মে বেগ ত্যাগ, নিবারণ অপেক্ষা সহ্য করাই শ্রেয়ঃ।" বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ৬৪নং।

৩য় খণ্ড—১১৬, ১৭১, ১৮৮

১। "যত আড়ম্বর কমান যায় ততই শান্তির উদ্‌যাপনা হইতে থাকে। ভগবান নির্জ্জন, নিভৃত অনাবৃতেই উদয় থাকেন, আবরণ মায়া। বেদবাণী, ১ম খণ্ড ৭৭নং

অনুভূতি—

১। "ভগবানের রাজ্যে সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তির তরঙ্গ নাই। অনুভূতি যাহা লোকে সাধনাদি সূত্রে লাভ করে তাহা কেবল গুণের বণ্টন অবস্থা, তরঙ্গ মাত্র। সত্ত্ব গুণের আধিক্যে সুখ অনুভূতি রজগুণের আধিক্যে চঞ্চল নানান চেষ্টা কর্ম্ম করার ইচ্ছা তমগুণের আধিক্যে নানান অভাব বিষাদ প্রমাদ নানান অশান্তির উৎকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা নির্ধৃত গুরুবাক্যে আস্থা করিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে গুণ সকল আপন বশবর্ত্তিতে আসিয়া পরমপদ ভক্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। ভগবানের নিকটেও

অভাবাদি গুণ হইতে যাহা হয় তাহা ভগবানকে নিয়াই খেলা করে। (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৩০ নং।

২। "হৃদয়ের অনুভূতি যাহা সকল সুখ বোধ হয় তাহাও ভ্রান্তি। অনন্ত কর্ম্মের দ্বারাই ভগবৎ পরাভক্তি লাভ করে, অনুভূতির মধ্যে নাই।" (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৩৮)।

গতস্য শোচনা নাস্তি—

১ম খণ্ড—১৫৬।

চিন্তা করা ভ্রান্তি—

১। "সংসারে চিন্তা না করিয়া উপস্থিত যাহা যখন কর্ম্ম হয় তাহা যথাসাধ্য আয় অনুসারে কুলন করিতে ব্যবস্থা করিয়া যথা সময় যাহা পারা যায় স্থির চিত্তে গুরুর কার্য্য করিবে। যখন মন চঞ্চল থাকে তখন না করিয়া স্থির সময়ে ক্রিয়া করিতে হয়। ইহাই ইষ্ট সাধন হয়। মন ইষ্টের উদ্দেশে রাখাই পবিত্র। চিন্তা করিয়া কোন ফল ভোগ করিবার লোক ত কাহাকেও দেখা যায় না। ভগবৎ চিন্তা যাহা যখন পারা যায় তাহাই ভাল।

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ১৯৭নং)।

২। চিন্তা করিবে না। ভগবান কালচক্রের তাড়না হইতে রক্ষা করিতে বর্তমান আছেন। প্রাক্তনে সকলি করিয়া থাকে। বিপদ সম্পদ সকলি প্রাক্তনের কর্ম্ম। ভগবান ব্যতীত ইহার হাত হইতে ত্রাণের জন্য কাহারও শক্তি নাই। সময় ফিরিয়া পড়িলে সকলি সূর্য্য উদয়ের ভাবে বিঘ্ন কাটিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া দেয়।

(বেদবাণী ১ম খণ্ড ২১০)।

১ম খণ্ড—১৮৩, ১৯৮, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১২, ২৬৭।

গুরু

১। "কর্মক্ষেত্রের উপস্থিত কর্ম্ম সকল, প্রারব্ধে যাহা দেয় তাহাতে বিরক্ত সন্তোষ না হইয়া, কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। পিছনে গুরু সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া উদ্ধার করিয়া লইবেন। জীব অবস্থায় জীবের কোন কর্ম্ম ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। যাহা ইচ্ছার মতন কর্ম্ম করিয়া ফল ভোগ করিতে দেখা যায় তাহাও প্রারব্ধের প্রদত্তই হইয়া থাকে। যদি তাহা না হইবে তবে কোন কোন কর্ম্ম ইচ্ছা করিয়া করিতে গিয়া শক্তি পাই না কেন? যখন যে অবস্থায় গুরু রাখেই সেই অবস্থায়ই তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে হয়। কোন চিন্তা নাই, গুরু সকল অভাব হইতে নিষ্কণ্টকে উদ্ধার সাধন করিবেন এই গুরুর স্বভাব। (বেদবাণী ১ম খণ্ড ১২১)।

২। "সর্ব্বদাই গুরুর নিকটে থাকিতে লালসা রাখিয়া তাহারই নিকটে তাহারই বাঞ্ছিত অবস্থায়, তাহারই কোলে ছোট ছেলেটির মত সর্ব্বদা বসিয়া আছে এরূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার রক্ষিত জনের ভয়-কি? (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৮৬ নং)।

৩। "সকল ভারই গুরু বহন করিতেছেন, করিবেন, তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। যাহা পারেন করিবেন, না পারেন না করিবেন। সর্ব্বদা তাহার পদে অনন্য মতি রাখিবার চেষ্টা করিবেন।

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৯১নং)

১ম খণ্ড—৭৮, ৮৪, ১৭৭, ১৮৯, ৩১৩।

৪। (গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে) এই বর্ণ দুইটিই ত্রিলোকের ভয় অপসারণ করে। [গুরুরিত্যক্ষরং যস্যজিহ্বাগ্রে নিত্য বর্ত্ততে, তস্য কিং বিদ্যতে মোহশ্চর্য্যেবেদস্য কিং বৃথা]" অতএব

গুরুচর্য্যাতে ভুলিবেন না।।.........সর্ব্বদা স্বীয় কার্য্যে শৈথল্য করিতে নাই।" (বেদবাণী, ২য় খণ্ড, ২২৯নং)।

২য় খণ্ড—৮২, ২১৫।

৫। "জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলে? যিনি গুরু বই আর কিছুই মনেতে উদয় করিতে পারে না, তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় এবং শরণাগত বলে। সকল ভার গুরুকে দিয়া কেবল গুরুর প্রতি যাতে মন থাকে—তাহাই চেষ্টা করিতে হয়। ঐহিক সংসারের সুখ দুঃখ যাহা প্রারব্ধ কর্ম্মে উপস্থিত হয় তাহা সথাসাধ্য করিয়া যাইবে। মন, বুদ্ধি, বাসনা সকল গুরুপ্রাপ্তি ইচ্ছায় রাখিয়া দিবে। কোন বিষয়েই অধীর হইতে নাই। সর্ব্বদা কেবল গুরুর দিকে লক্ষ্য রাখিবেন, গুরু আপনার মঙ্গল করিবেন।" (বেদবাণী, ৩য় খণ্ড, ১৩৫নং)।

৬। "গুরুকৃপা হইতে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়, এবং ভগবানকে লাভ করা যায়। তিনি সমস্ত স্থানেই আছেন। "অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।"

৭। "আপনী অপনাকে হতভাগ্য বোধ করেন কেন। গুরুর আশ্রয় পেলে আর কি আপন বল্‌তে কিছু থাকে? গুরুরই সকল হয়। যে পর্য্যন্ত গুরুর আশ্রয় না পায় সেই পর্য্যন্তই ভাগ্যাভাগ্য বিচার থাকে।

চিন্তাশূন্য ইচ্ছাশূন্য, অনুভূতিশূন্যকেই ভগবদ্ভক্তি বলে। অতএব শূন্য ভাবকে পিছনে মগজ [?] মাথা হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত নামিয়াছে, তাহাতে মন রাখিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গুরুধ্যান হয়। তদ্দারা প্রাণের তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।"

(বেদবাণী, ৩য় খণ্ড ১৫০নং)।

৩য় খণ্ড—সকল গুরুর যদি আমারই আমি না হয় তবে আমার কি হইবে ? সকলি ভ্রান্তি।

—১৫২ নং। ৪১, ১৪৯, ১৭৯।

দেহত্যাগ—

১। "দেহ শব্দের অর্থ=যাহা দ্বারা দাহন অর্থাৎ তাপ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাকেই দেহ বলিয়া বেদে প্রকাশ ' বাসনাই লাভে হর্ষ সুখ, অলাভে দুঃখ জন্মায়, যে পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্বাভিমান মানসের নিকট থাকে সে পর্য্যন্ত এই দেহ ত্যাগ করিলে কিছুই ত্যাগ হয় না, মুক্তিও পায় না। এই দেহে থাকিয়া যদি মরার দেহের মত বাসনা শূন্য সহিষ্ণুতা হয় তবেই দেহত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদা পতিব্রতা ধর্ম্ম অকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে যোগ দিতে যত্নবান থাকিতে হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ অভ্যাসে বাসনা সখের হইয়া অকর্ত্তৃত্বভাবে দেহত্যাগ করে ইহাই দেহমুক্ত। নচেৎ কর্তার বাসনা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে কি হইবে, তাহা ত সঙ্গে থাকেই। বাসনাশূন্য হইলেই স্বরূপ ভগবানের চৈতন্য আনন্দ আবরণে ঘেড়িয়া সমীপে আশ্রয় হয়। ইহাই স্বভাব এবং ইহাকেই স্বধর্ম্ম (পতিব্রত) শক্তি বলে।"

(বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৩৭১)।

১ম খণ্ড—১৫১। ৩য় খণ্ড—২১, ৪৩, ৬৩, ৯১নং।

নিরপেক্ষ থাকাই পরম পথ।—

১। "সংসার মায়াময়। বাজে চিন্তা করিয়া সময় কাটায়, তাহাই বন্ধন। নিরপেক্ষতার সহচর হইলে শোক দুঃখ প্রারব্ধের দণ্ডাদি ও ভোগের যন্ত্রনা হইতে নিষ্কৃতি পায়।" (বেদবাণী, ১ম খণ্ড, ৭৩নং)

১ম খণ্ড—২৮৯।

পিতৃভক্তি—

১। "কর্ত্তৃত্ব অভিমানে কেবল কর্ম্মভোগ ভাগই করে ঋণ বৃদ্ধি করায়, ঋণ মুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই জন্মমৃত্যু উপভোগ করে ……সুখ দুঃখ ভাগ্য অনুসারে ঘটে।

পিতৃভক্তি ভিন্ন এই ভাগ্য ভোগ ত্যাগ হয় না জানিবেন। মনের বেগ ধৈর্য্য ধরিয়া পিতৃসেবা করিতে হয়। পিতার আশীর্ব্বাদে পুত্রের শান্তি হইয়া থাকে। (বেদবাণী ২য় খণ্ড, ১০১ নং)।

২য় খণ্ড—১৩২ নং। ৩য় খণ্ড—৬ নং।

বিবিধ—

প্রথম খণ্ড

১। "ত্যাগং সত্যম শৌচ দয়া পরস্পর উদয় হইতেই হয়। ক্ষেম স্থৈর্য্য আরোগ্য ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা ত্যাগকে আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতে হয়"—৪নং।

২। "বোঝা এবং না বোঝা দুই এক এবং কারণ উভয়ই ভ্রান্ত। এই দুইয়ের অভাবই শান্তি।" (৮নং)

৩। "কর্ম্মফল কখন-ও নষ্ট হয় না। মায়ার চক্রে যে যেভাবেই বুঝুক সে ভাবেই-প্রত্যক্ষতা লাভ করিবে।" (৯০ নং)।

৪। "ভগবৎ সেবার শক্তিকে ক্ষেম বলে।" (২৬৯ নং)।

৫। "স্ত্রী জাতীর স্বভাব পতিব্রতা, পতি সেবা, পতি অনুগতা আশ্রয়। অকর্তা হইয়া সর্ব্বদা পতিতৃপ্তির আশ্রয় নিবে। এই ত পরম ধর্ম্ম, ইহা হইতে যে কি ধর্ম্ম জগতে আছে তাহা আমার জানা নাই। প্রাণের দাস হইয়া থাকিলে গুণময় হইতে নিষ্কৃতি পায়। গুণ

আহরণ, শরীর আহরণ এবং ইন্দ্রিয়াদি অহংকারেব আহরণ করিয়া জীবভাব মুক্তি পাইতে পারে ;না গুণাদি দ্বারায় ঐহিক বৈভবাদির উন্নতি লাভ করিয়া কল্পয়ান্তের দাস হইতে হয়, মুক্তি পারে না। ব্রহ্মাদি পর্য্যন্তও কর্ম্ম বন্ধন ছাড়াইতে পারে না। (৩১৭ নং)। ...

দ্বিতীয় খণ্ড—

১। "স্বর্গ আর মুক্তি উভয়ই নরক। কারণ স্বর্গে সুখ ভোগ অবসানে পুনরাবর্ত্তে সেই সুখে বঞ্চিত হইয়া দুঃখী হয়।" (১৫৯ নং।)

২। "সংসারে সম্প্রদায়ই বন্ধন"—১৩৮ নং।

৩। "মনের দাস না হইয়া সত্যের অধিনে থাকিতে চেষ্টা রাখুন। সত্যকে পাইলেই······জন্মতিথি পরিমার্জ্জিত হইয়া অজ, নিত্য শাশ্বতকে লাভ করিতে পারিবেন। একেই জন্ম উৎসব বলে।" (২১২ নং)।

তৃতীয় খণ্ড—

১। "উৎ (আলোক) সব (থাকা) দুই সখীগণে উৎসব ঘটনা হইয়া থাকে। দক্ষযজ্ঞের দ্বারা সত্যনারায়ণ দূরবর্ত্তী হইয়া যায়। (২নং)

২। "পাপ পূণ্য দ্বারা শরীরের ভোগ হয় না। ব্যাধি সকল প্রাক্তন লব্ধ,—৪৬, ৬৯ নং।

৩। নানা প্রশ্নের উত্তর—৫৮ নং।

৪। "মায়ের কোলে কোন অস্থায়ী বস্তুর প্রশংসা রাম পায় নাই"—৮৮ নং।

———